ভূমিকা।

"ভক্ত-চরিতমালা" প্রকাশিত হইল। আমরা এই পুস্তকখানিতে ভারতের পূর্ব্বতন ভক্তদিগের মধুময় জীবনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইঁহাদিগের জীবনের আদর্শ বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলেও, ইঁহাদিগের বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ ও অপূর্ব্ব ভগবদ্-ভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত চিরদিনই নরনারীর প্রাণকে এক রসস্বরূপ মঙ্গলময় দেবতার দিকে আকর্ষণ করিবে ও জীবনের সকল ঘটনার মধ্যে চিত্তে ধৈর্য্য, ক্ষমা ও শান্তি রক্ষা করিতে শিক্ষা দান করিবে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার তুকারাম চরিত নামক উপাদেয় পুস্তকের এক অংশে ভগবদ্-ভক্তদিগের জীবন-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অতীতকালের প্রস্তরীভূত জীবকে প্রাণদান করিয়া পৃথিবীতে পুনরানয়নের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, পূর্ব্বকালীন সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগকে অনুকরণ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় তাঁহাদিগের সদ্‌গুণ আমরা যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিব ততই মঙ্গল।"

এই পুস্তকান্তর্গত চরিত্রগুলি সঙ্কলনে আমি চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, ভক্তমাল, অদ্বৈত-প্রকাশ, নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি আদি বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের শ্রীযুক্ত অঘোর-নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়দিগের রচিত পুস্তকাদি হইতেও বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সে-জন্য তাঁহাদিগের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যদি এই পুস্তক পাঠে কাহারও চিত্ত শান্তিময় ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

রাধাপ্রসাদ লেন,
সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১৯১৮।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

"ভক্ত-চরিতমালা" প্রকাশিত হইল। আমি [illegible] পুস্তকখানিতে ভারতের পূর্ব্বতন ভক্তদিগের মধুময় জীবনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইঁহাদিগের জীবনের আদর্শ বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলেও, ইঁহাদিগের বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ ও অপূর্ব্ব ভগবদ্-ভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত চিরদিনই নরনারীর প্রাণকে এক রসস্বরূপ মঙ্গলময় দেবতার দিকে আকর্ষণ করিবে ও জীবনের সকল ঘটনার মধ্যে চিত্তে ধৈর্য্য, ক্ষমা ও শান্তি রক্ষা করিতে শিক্ষা দান করিবে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার তুকারাম চরিত নামক উপাদেয় পুস্তকের এক অংশে ভগবদ্-ভক্তদিগের জীবন-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অতীতকালের প্রস্তরীভূত জীবকে প্রাণদান করিয়া পৃথিবীতে পুনরানয়নের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, পূর্ব্বকালীন সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগকে অনুকরণ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় তাঁহাদিগের সদ্‌গুণ আমরা যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিব ততই মঙ্গল।"

এই পুস্তকান্তর্গত চরিত্রগুলি সঙ্কলনে আমি চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, ভক্তমাল, অদ্বৈত-প্রকাশ, নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি আদি বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের শ্রীযুক্ত অঘোর-নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়দিগের রচিত পুস্তকাদি হইতেও বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সে-জন্য তাঁহাদিগের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যদি এই পুস্তক পাঠে কাহারও চিত্ত শান্তিময় ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

রাধাপ্রসাদ লেন,
সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১৯১৮।

গ্রন্থকার।

সূচী।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম ভাগ।

ভক্ত-চরিতমালা।

প্রথম ভাগ।

অদ্বৈতাচার্য্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় চারিশত বৎসরের অধিক হইল, কুবের তর্কপঞ্চাননামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রামনামক এক পল্লীতে বাস করিতেন। কুবের ধনশালী, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি লাভানাম্নী এক সর্ব্ব-গুণান্বিতা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের কয়েকটি সন্তান হইয়া অল্পকাল-মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কুবের তর্কপঞ্চানন প্রাণসম পুত্রদিগের অকাল-মৃত্যুতে ব্যথিতহৃদয়ে নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন এবং রজত-রেখা-সদৃশা জাহ্নবীর তটে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া পত্নীসহ তথায় বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে লাভাদেবী আবার গর্ভবতী হইলেন। কুবের তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া

নারায়ণের পূজা দিলেন ও ব্রাহ্মণ আতুরদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

কুবের লাউড়ের দিব্যসিংহ রাজার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। লাউড়-গ্রাম পরিত্যাগের কিছুদিন পরে রাজা কুবের তর্কপঞ্চাননকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার ইচ্ছা পালনার্থ কুবের পত্নীসহ তথায় গমন করিলেন। কুবের নবগ্রামে আগমন করিলে, রাজা দিব্যসিংহ লাভাদেবীর গর্ভধারণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "কুবের পূর্ব্ব-শোক বিস্মৃত হও, পুণ্য-ভূমিতে তোমার পত্নী গর্ভধারণ করিয়াছেন, পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছায় এ গর্ভধারণের ফল শুভই হইবে।" এমন সময়ে এক জ্যোতিষী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুবেরকে বলিলেন, "তুমি দেবসম পুত্র লাভ করিবে, সে দীর্ঘজীবী হইবে এবং শাস্ত্রবেত্তা হইয়া চারিদিকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম ঘোষণা করিবে।" ভবিষ্যৎ সন্তানের ঈদৃশ শুভ-লক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া কুবের সানন্দ-চিত্তে গৃহে গমন করিলেন এবং প্রিয়তমা পত্নীকে রাজার শুভকামনা ও গণকের ভবিষ্যদ্বাণী গোচর করিলেন। দেবসম সন্তান তাঁহার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে শুনিয়া লাভাদেবী পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

মহাপুরুষদিগের জন্ম লইয়া লেখকেরা অনেক সময় অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকেন। অদ্বৈতের জীবন-চরিত-লেখক ঈশান নাগর বলেন, "লাভাদেবী গর্ভাবস্থায় একদিন নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলেন, এক দিব্য লাবণ্যযুক্ত হরিহর-মূর্ত্তি তাঁহার ক্রোড়দেশে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গচ্ছটায় চারিদিক আলোকিত হইতেছে এবং তিনি বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন।"

"নিজ হৃৎকমলে দেখে হরিহর মূর্ত্তি।
তাঁর অঙ্গ কান্ত্যে সর্ব্বদিগ হয় স্ফূর্ত্তি॥
হরিসংকীর্ত্তন করে সুমধুর স্বরে।
বাহু তুলি নাচে কাঁদে বাক্য নাহি স্ফুরে॥"

এইরূপে দশমাস চলিয়া গেল। মাঘমাসের সপ্তমী তিথিতে আচার্য্য-পত্নী এক নবকুমার প্রসব করিলেন। গ্রামের নারীগণ কুবের-আচার্য্যের বাড়ীতে গমন করিয়া হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। আজ কুবেরের আর আনন্দের সীমা নাই। দেশের প্রথানুসারে কুবের যথাকালে পুত্রের নামকরণ করিলেন। পুত্রের নাম হইল কমলাক্ষ, কিন্তু আমরা তাঁহার পরিচিত অদ্বৈত নামেই এখানে উল্লেখ করিব। অদ্বৈত পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুবের সন্তানের 'হাতেখড়ি' দিলেন। কথিত আছে, অপূর্ব্ব মেধাগুণে এক মাসের মধ্যেই অদ্বৈতের বর্ণজ্ঞান জন্মিল। কিছুদিন পরে কুবের পুত্রকে রীতিমত শিক্ষা-দানের জন্য পণ্ডিতের শিক্ষাধীন করিলেন। পুত্র তিন বৎসরের মধ্যে কলাপ ব্যাকরণাদি সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

অদ্বৈতের যজ্ঞোপবীত দিবার সময় উপস্থিত হইল। কুবের সন্তানের যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। উপবীত ধারণের পর তাঁহার রূপলাবণ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি তৎপরে সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি-গ্রন্থ-সকল মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

অদ্বৈত এখন বালক। কিন্তু এই বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল। একদিন কালীদেবীর বিশেষ পূজোপলক্ষে কোন স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়। বাদ্যকারেরা বাদ্য বাজাইতে লাগিল, নর্ত্তক ও নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতে লাগিল। এই অনুষ্ঠানে কমলাক্ষও গমন করিলেন, কিন্তু কালীদেবীকে প্রণাম না করিয়া সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। রাজা দিব্যসিংহ কমলাক্ষের ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ কিরূপ ব্যবহার, তুমি কালীদেবীকে প্রণাম করিলে না?" কমলাক্ষ বলিলেন, "পরমেশ্বর যে এক, অতএব তাঁহারই পূজা করা উচিত। মানুষ যে নানা দেব-দেবীর পূজা করে সে তাহাদের ভ্রমমাত্র, আর কিছুই নহে।"

"নানা মতে যেই যায় তার বিড়ম্বনা।
বিজ্ঞজনে এক ইষ্টে করয়ে ভাবনা॥"

পুত্রের কথা শুনিয়া কমলাক্ষের পিতা রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, এবং পুত্রের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "দেব-দেবীর পূজা না করা মহাপাপ, এজন্য তুমি নিষ্ঠার সহিত দেব-দেবীর পূজা করিবে।" পুত্রও পিতার যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "নারায়ণের পূজা করিলে, সকলেরই পূজা করা হয়। যে দেবীর যজ্ঞে প্রাণিবধ করা হয়, সে দেবীর পূজা কখনও যুক্তিসিদ্ধ নহে।"

"তৈছে সর্ব্ব দেব-দেবীর মূল নারায়ণে।
পূজিলে সকল পূজা হয় সমাধানে॥
প্রাণিহিংসা যজ্ঞে যেই হয় উল্লাসিত।
সে দেবীর উপাসনা না হয় উচিত॥"

সমবেত লোকমণ্ডলী বালক কমলাক্ষের পিতার সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক বিচার শ্রবণ করিতেছিল। কিন্তু অবশেষে সকলেই কমলাক্ষের বুদ্ধিমত্তা দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালক অদ্বৈতের যখন দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, তখন তিনি মাতাপিতাকে না জানাইয়া শান্তিপুরে আগমন করেন এবং তথা হইতে তাঁহাদিগকে কোন লোকদ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করেন। এদিকে পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া লাভাদেবী ও কুবের আচার্য্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে অদ্বৈতের চিঠি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। পুত্রকে ছাড়িয়া তাঁহারা আর লাউড়ে বাস করিতে পারিলেন না। ত্বরায় শান্তিপুরে আগমন করিয়া পুত্রের মুখদর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি শান্তিপুরে আসিয়া

ষড়্‌দর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শনশাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, কুবের আচার্য্য পুত্রকে বেদ পাঠ করিতে বলিলেন।

পূর্ণবাটী নামে একখানি গ্রাম ছিল। তথায় বেদান্তবাগীশ নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। অদ্বৈত পিতার অনুমতি লইয়া বেদপাঠার্থ তথায় গমন করিলেন। বেদান্তবাগীশ সুপণ্ডিত, তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিলে লোকের মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইত। অদ্বৈত তথায় যাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। বেদান্তবাগীশ অদ্বৈতের প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তিনি তাঁহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। বেদান্তবাগীশ পাঠারম্ভের পূর্ব্বে ছাত্রের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই আলোচনায় অদ্বৈতের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন, এবং তিনি যে ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ লোক হইবেন, মনে মনে তাহাও বুঝিতে পারিলেন।

এই সময়ে কুবের আচার্য্যের বয়স প্রায় নব্বই বৎসর হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার পরলোক-গমনের সময় উপস্থিত হইল। লাভাদেবীরও বয়স স্বামীর অনুরূপ হইয়াছিল। কুবের তর্কপঞ্চাননের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। দেহান্তের সময় তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার পরলোক-গমনের পর তুমি গয়াধামে গিয়া আমার পিণ্ডদান করিবে।"

অদ্বৈতাচার্য্য তৎপর পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য গয়াধামে গমন করিলেন, এবং গদাধরের পাদপদ্মে স্বর্গগত পিতৃদেবের উদ্ধারার্থ পিণ্ডদান করিলেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন ও নানা তীর্থ ভ্রমণ সাধুপুরুষেরা জীবনের একটা প্রধান কার্য্য বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। অদ্বৈত গয়াধামে গমনানন্তর রেণুমা, সেতুবন্ধ, শিবকাঞ্চী, মথুরা, ধনুতীর্থ প্রভৃতি স্থানসকল দর্শন করিয়া মধ্বাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিলেন। আশ্রমবাসীরা

অদ্বৈতের অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইলে, তিনি ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন; পরে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভূতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মাধবেন্দ্রপুরী তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এই বালকই ভবিষ্যতে ভক্তিপথের পথিক হইয়া নরনারীর উদ্ধারসাধন করিবে।" তৎপর তিনি ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। অদ্বৈত সামান্য বালক নহেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্রমবাসী সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

একদিন অদ্বৈত মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দেশের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া, যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে; কিরূপে জীবের উদ্ধার হইবে, কৃপা করিয়া তাহার উপায় বলিয়া দিন।" পুরী বলিলেন, "তুমি জীবের উদ্ধারের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা কর দেখিতেছি; ভগবৎ-কৃপা না হইলে সাধারণ মানবের মধ্যে এমন শুভবুদ্ধির উদয় হয় না। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ আবির্ভাব ভিন্ন জীবের উদ্ধার সম্ভব নহে। ভগবান এই যুগেই ধরাধামে আপনার স্বরূপ প্রকটিত করিয়া জীবের উদ্ধার সাধন করিবেন; অনন্ত সংহিতা তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।" অনন্ত সংহিতার কথা শ্রবণ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য অদ্বৈতের প্রবল বাসনা হইল। পুরী অদ্বৈতের হস্তে পুস্তকখানি প্রদান করিলেন। এই ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থখানি দেখিয়া অদ্বৈতের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে যেন ভক্তির ঢেউ উথলিয়া উঠিল। মাধবেন্দ্রপুরীর কথাগুলির সত্যতা তিনি বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া হরি-প্রেমের দ্বারা জগৎ তরাইবেন, এ অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অদ্বৈতের প্রাণের মধ্যে সে

সময় কি এক আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল ; তিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া গৌরগুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

যথা অদ্বৈত-প্রকাশে ঃ—

"গৌর মোর প্রাণপতি যাঁহা তাঁরে পাও।
বেদ ধর্ম্ম লজ্যি মুই তাহা চলি যাও ॥"

মধ্বাচার্য্যের আশ্রমে এইরূপে কিছুদিন বাস করিয়া, তিনি দণ্ডকারণ্য, প্রভাস, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া ভক্তি ও প্রেমের লীলাক্ষেত্র মথুরা ও বৃন্দাবন ধাম দর্শন করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, সে সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার প্রাণকে অণুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রোদয়ে সাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমে গদ্‌গদ্‌ চিত্ত হইয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতের গৃহে বাস করেন। দুই ভক্ত মিলিত হইয়া কিছুদিন ভগবৎ-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করেন। যাইবার সময় পুরী গোঁসাই অদ্বৈতকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন।

"আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া।
কৃষ্ণার্থ সংসার কর বিবাহ করিয়া ॥"

অদ্বৈত কেবল ভক্ত নহেন। সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার নাম চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তর্কপঞ্চানন নামে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অদ্বৈতের সুযশ শুনিয়া তাঁহার সহিত বিচারার্থ আগমন করেন। শাস্ত্র লইয়া উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বিচারে অদ্বৈতই জয়ী হইলেন। দিগ্বিজয়ী জ্ঞান-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচারে অদ্বৈতের জয়লাভের সংবাদ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

লাউড়াধিপতি রাজা দিব্যসিংহ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজা শৈব, কিন্তু তিনি অদ্বৈতের ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষান্তে তিনি দশবৎসর অতি নিষ্ঠার সহিত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এক তরুলতাবেষ্টিত নির্জ্জন কাননে হরিনাম-কীর্ত্তনে জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি অদ্বৈতের বাল্যজীবনের কথা সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া যান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত যখন শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন, তখন এক অল্পবয়স্ক বালক তাঁহার নিকট আগমন করেন। ইঁহার নাম হরিদাস। অদ্বৈত এই যবন-বালকের নিষ্ঠা ও ভক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি এই বালককে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করান। তৎপর হরিদাস অদ্বৈতের নিকট দর্শনশাস্ত্রও কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। হরিদাস এই সকল বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মনোনিবেশ করেন। অদ্বৈত তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি প্রতিদিন ভাগবত পাঠ করিতেন ও হরিদাস ভক্তি-পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতেন। হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীর নিকটেই বাস এবং আচার্য্যের বাটীতেই আহার করিতেন। সেজন্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

একদিন শান্তিপুরে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। এ-সময় হরিদাস সে-বাটীতে গমন করেন। অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বজনসমক্ষে যবন হরিদাসের হস্তে অগ্রে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করেন। ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈতের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলে,

অদ্বৈত বলিলেন, "কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনে যে ফল হয়, হরিদাসকে খাওয়াইলে সেই ফল হইল বলিয়া আমি মনে করি।"

অদ্বৈত একদিন গঙ্গা-স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় নারায়ণপুর-নিবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ী নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার দুই রূপসী কন্যা লইয়া স্নান করিতে আসেন। কন্যাদ্বয়ের নাম সীতা ও শ্রীঠাকুরাণী। ভাদুড়ীর সুন্দরী কন্যাদ্বয় অদ্বৈতের সৌম্যমূর্ত্তি ও রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন। নৃসিংহ এমন পাত্রে কন্যাদ্বয়কে সমর্পণ করা সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া অদ্বৈতের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অদ্বৈতও কন্যাদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি আনন্দের সহিত আপনার সম্মতি জানাইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ সকলেই এ-প্রস্তাবে সুখী হইলেন। অদ্বৈত কেবল পণ্ডিত ও ভক্ত নহেন, তিনি ধনী ছিলেন। তাঁহার বাসভবনও সুন্দর ও বৃহৎ ছিল। তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীদ্বয় সংসারে প্রবেশ করিয়া পতির সেবায় ও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সহায় হইয়া পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতাচাৰ্য্য সংসারে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত নিরন্তর ভগবৎ-প্রেমে নিমগ্ন হইয়া থাকিত। তিনি হরিদাসের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন; কিরূপে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হইয়া শুষ্ক-ভাব বিদূরিত করে, লোকের হৃদয় মধুময় করে, সেজন্য তিনি কাতর অন্তরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। একদিন হরিদাস তাঁহার নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "মুসলমানেরা ধর্ম্মের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; তাহারা হিন্দুদিগের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেব-দেবী ভাঙ্গিয়া ফেলে, ভাগবতাদি

ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকল বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলে; ভক্ত সাধুদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করে ও তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। এই দুঃসময়ে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে, দেশের সদ্‌গতির আর উপায় নাই।" অদ্বৈত হরিদাসের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হরিদাস, ভগবান ইহার প্রতিবিধান করিবেন। তুমি চিন্তা করিও না।" অদ্বৈতের মুখ হইতে এই অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া হরিদাস দুই হাত তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়া ভক্তি-বন্যায় নরনারীকে প্লাবিত করিবেন; তাঁহার কামনা পূর্ণ হইবে। সেজন্য তিনি সেই পুণ্যভূমি নবদ্বীপে বাস করিবার জন্য গমন করিলেন। অদ্বৈত তখন নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের জীবনের একটা প্রধান ব্রত ছিল। অদ্বৈতাচার্য্য সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ছাত্রদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি দিবাভাগে শিক্ষা-দানে রত থাকিতেন ও সায়ংকালে হরিদাসের সহিত হরিগুণ-কথনে ও হরিনাম-সংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। অদ্বৈত প্রকাশে :—

"দিনে প্রভু ছাত্র পড়ায় গীতা ভাগবত।
কভু বেদ স্মৃতি পড়ায় ছাত্রের ইচ্ছামত॥
রাত্রে হরিদাস সঙ্গে করিয়া মিলন।
উচ্চৈঃস্বরে করে হরির নাম সংকীর্ত্তন॥"

অদ্বৈতাচার্য্যের পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তির কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অনেক পাঠার্থী তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল। অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি ব্যাকুল হৃদয়ে ভক্তিমন্ত্রে

দীক্ষিত হইয়া নূতনতর জীবন লাভ করিতে লাগিলেন—বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নবদ্বীপে তখন জগন্নাথ মিশ্র নামে এক সুপণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র না হওয়ায় বিষাদিত অন্তরে তিনি আচার্য্যের নিকট আসিয়া আপনার হৃদয়ের বাসনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার বাটীতে যাইবেন বলিয়া সেদিন তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরদিন আচার্য্য স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র ও তদীয় পত্নী অদ্বৈতের আগমনে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী, আচার্য্যের চরণে প্রণিপাত করিলে তিনি বলিলেন, "মা, তুমি পুত্রবতী হও।" আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতি-পত্নী উভয়ে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। কিছুকাল পরে শচীদেবী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই শিশুর নাম বিশ্বরূপ হইয়াছিল। বিশ্বরূপ বাল্যকালে অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। কিন্তু তিনি বাল্যকালেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করিলে, একদিন শচীদেবী স্নানার্থ গঙ্গায় গমন করিয়াছেন, এমন সময় অদ্বৈতাচার্য্যও স্নানার্থ তথায় গমন করেন। শচীদেবী স্নানান্তে তীরে উঠিয়া অদ্বৈতের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শচী তখন গর্ভবতী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মিশ্রপত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা, এই গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবেন।"

"আর ভয় নাহি মাগো এ সত্য বচন।
এই গর্ভে কৃষ্ণ সম হইব নন্দন॥"

বৃদ্ধ অদ্বৈতের বাক্য বিফলে যাইবার নহে, এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শচীদেবী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এই শুভ সংবাদ স্বামীকে জ্ঞাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবার্ত্তা অদ্বৈতের কর্ণগোচর হইলে আনন্দে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল—তাঁহার বিশ্বাস, এই নবজাত শিশু তাঁহার বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ইনি মানবকে মুক্তি-মার্গের দিকে লইয়া যাইবেন। এমন শিশুর জন্ম-সময়ে তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? অদ্বৈত হরিদাসের সঙ্গে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে হুঁঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেন নাচে কেহ নাহি জানে॥"

তৎপর তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন এবং এই শুভ দিনের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিলেন। আজ তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি যেন দিব্য-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, আর কয়েক বৎসর পরে এই শিশুর দ্বারাই বঙ্গদেশে ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিত হইবে।

গৌর যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বিশ্বরূপের বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর মাত্র। বালক বিশ্বরূপ অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। গৌর যখন পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু তখন একদিন বিশ্বরূপের বাড়ীতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া শচীদেবী সন্তানকে ডাকিবার জন্য গৌরকে তথায় প্রেরণ করেন। গৌর চতুষ্পাঠীতে গিয়া বলিলেন, "দাদা, বাড়ীতে এস, মা তোমায় ডাকৃছে।" তখন অদ্বৈত এই অপরূপ রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া অনিমিষ নয়নে কিছুকাল তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দও এই শিশুর দিক হইতে ক্ষণকাল নয়ন ফিরাইতে পারে নাই।

গৌর নবদ্বীপে শিক্ষা লাভ করিয়া, অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি নাম সংকীর্ত্তনে রত হইলেন। এ সময় অনেক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিষ্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া তিনি নাম-কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার যশঃসৌরভে যখন চারিদিক আমোদিত, তখন অদ্বৈতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। ভক্তদিগের আকুল প্রার্থনাতেই দেশে ধর্ম্মের ও মঙ্গলের বায়ু প্রবাহিত হয়। অদ্বৈতাচার্য্য, দেশের শুষ্কতা যাহাতে বিদূরিত হয়—সুশীতল ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেজন্য অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। কখন বা সেজন্য উপবাস থাকিয়া মনের বেদনা আপনার ইষ্ট দেবতার নিকট নিবেদন করিতেন। একদিন তিনি ভাগবতের কোন শ্লোকের অর্থ ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া মনের দুঃখে অনাহারে শয্যায় শয়ন করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, একটি সুন্দর যুবাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি ভাগবতের যে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিতেছ, সেই শ্লোকের অর্থ এই,—এই বলিয়া তিনি সেই শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—'তুমি যাঁর আগমনের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা কর—তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন,—উঠ আর ভয় নাই।'"

স্বপ্ন দর্শন শেষ হইল, অদ্বৈতের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার শ্লোকের অর্থ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আর যে সৌম্যমূর্ত্তি যুবাপুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, তাঁহার আকৃতির সহিত গৌরের আকৃতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। তিনি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আপন শিষ্যদিগকে জ্ঞাপন

করিয়া গৌরকে কৃষ্ণাবতার জানিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত সে সময় শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। গৌরের এই সংকীর্ত্তনের সমাচার তাঁহার নিকট পৌঁছিলে, তিনি সীতাদেবীকে লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। যে আনন্দচ্ছবি দেখিবার জন্য তিনি এতদিন উৎসুক চিত্তে দিনযাপন করিতেছিলেন, আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, শচী-তনয় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কথিত আছে, অদ্বৈতাচার্য্য যখন শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, গৌর যদি যথার্থই ভগবানের প্রতিনিধি হন, তাহাহইলে, তিনি তাঁহার মস্তকোপরি আপনার পদদ্বয় স্থাপন করিবেন। গৌর তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলে, ভক্তবৃন্দ মত্ততার সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে গৌর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসান্তে তিনি নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকবার শান্তিপুরে আগমন করেন। এ-সময় শচীদেবীও শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আগমন করিতেন। অদ্বৈত ও সীতাদেবী ভক্তদিগের সেবার জন্য আহারের বিবিধ আয়োজন করিতেন। বিবিধ ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, পিষ্টক প্রভৃতি দ্বারা ভক্তদিগকে ভোজন করাইতেন। ভক্তদিগের আগমনে তাঁহার ভবন যেন উৎসবময় বলিয়া বোধ হইত।

গৌর যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেন, তখন অদ্বৈতপ্রমুখ বহু-সংখ্যক ভক্ত গৌড় দেশ হইতে প্রতি বৎসর রথোৎসবের সময় তথায় গমন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শনলাভই তাঁহাদের এ-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গৌর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কয়েক মাস কীর্ত্তনে ও হরিকথা-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন।

এখানে অদ্বৈতসম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। একবার

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করেন। তাঁহারা তথায় গমন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, আচার্য্য শিষ্য-দিগকে লইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞান বড় না ভক্তি বড় ?" চৈতন্যের উত্তরে অদ্বৈত বলিলেন, "ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।" শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে সজোরে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যকে বড়ই ভালবাসিতেন, এই প্রহার খাইয়া তিনি কিছুই বলিলেন না ; কিন্তু অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী ছুটিয়া আসিয়া গৌরকে বলিলেন, "কর কি! বুড় মানুষ, আর মারিও না।" অদ্বৈত তৎপরে অতি প্রেমভরে গৌরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, তুমি আমাকে মেরেছ।" অদ্বৈত ও সীতাদেবী গৌরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অদ্বৈত বোধ হয় গৌরের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তদের লীলা বুঝা ভার !

মানুষ অনেক সময় মানুষের মহত্ত্ব, ধর্ম্মবিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অবতারত্ব আরোপ করিয়া থাকে। অদ্বৈতই প্রথমে গৌরকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। একবার নীলাচলে রথোৎসবের সময় অদ্বৈতের বাসবাটীতে সায়ংকালে সকলে সংকীর্ত্তনের জন্য মিলিত হইলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অদ্বৈত গৌরের অবতারত্ব বিষয়ে একটি নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেদিন ভক্তবৃন্দ সেই নব-রচিত সঙ্গীতই মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে উচ্চৈঃস্বরে সে কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। গৌর তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অবতারত্ব বিষয়ে এই সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিজ বাসায় চলিয়া আসিলেন। সংকীর্ত্তন শেষ হইলে, গৌর-শিষ্যেরা তাঁহার নিকট

আগমন করিলে, গৌর অদ্বৈত-রচিত এই সংকীর্ত্তনের প্রতিবাদ করিলেন। শিষ্যেরা কিন্তু এই সংকীর্ত্তনের প্রশংসা করিয়া তাঁহার অবতারত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। এমন সময় শ্রীহট্টবাসী একদল লোক ঐ কীর্ত্তনটি গান করিতে করিতে গৌরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গৌর-শিষ্যেরা বলিলেন, "প্রভো, সূর্য্যের প্রভাব কি অঙ্গুলি দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা যায়?" তদবধি সেই সঙ্গীতের প্রভাব চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। অদ্বৈতচার্য্যই প্রথমে গৌরকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য যখন গৌড়ে বাস করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বদাই গৌরের সমাচার লইতেন। একবার শিবানন্দ সেন যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আগমন করেন তখন অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "তুমি গৌরকে আমার সম্ভাষণ জানাইয়া আমার এই রচনা তাঁহাকে নিবেদন করিবে ঃ—

"আউলকে কহিয় লোক হইল আউল।
আউলকে কহিয়, হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

শিবানন্দ সেন নীলাচলে আগমন করিয়া অদ্বৈত-রচিত এই প্রহেলিকাটি গৌরকে বলিলেন। তিনি তচ্ছ্রবণে কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার তিরোভাব হয়।

গৌরের তিরোভাবের সমাচার যখন অদ্বৈতের শ্রুতিগোচর হয়, তখন তিনি শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। চারিদিক তাঁহার নিকট অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি শোকা-ভিভূত হৃদয়ে একদিন তাঁহার সঙ্গী ও চরিতাখ্যায়ক ঈশান নাগরকে বলিলেন, "ঈশান, গৌর বিহনে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! শীঘ্রই আমি ইহলোক হইতে চলিয়া যাইব। তুমি সর্ব্বদা গৌরগুণ-কীর্ত্তন করিবে এবং

আমার পরলোক-গমনের পর আমার জন্মস্থানে গৌরের নামঘোষণা করিবে।” তাই ঈশান নাগর বলিতেছেন ঃ—

“একদিন প্রভু মোরে কহে সংগোপনে।
গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ আর সহে না পরাণে॥
ঝাট মুঞি জীব লোকের হৈমু অগোচর।
গৌরনাম গৌরগুণ কহ নিরন্তর॥
আর এক কথা কহি শুন সাবধানে।
তুঞি মোর প্রিয় শিষ্য আজন্ম সমানে॥
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে।
গৌরনাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥”

পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য ইহলোক পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার প্রিয় শিষ্য ঈশান নাগরকে যে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ঈশান সে-সকল শিরোধার্য্য করিয়া তাহা পালনে রত হইলেন।

।চৈতন্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপ অতি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখানে সংস্কৃত-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। বড় বড় অধ্যাপকেরা আপনাপন চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগকে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষাদান করিতেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের এই লীলাক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ১৪০৭ শকে ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। ইঁহারা উভয়েই সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র-পাত্রী ছিলেন। চৈতন্য যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন অদ্বৈতাচার্য্যের ও শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নীদ্বয় সীতাদেবী ও মালিনী দেবী আসিয়া শিশুকে অনেক উপঢৌকন দান করেন এবং প্রতিবেশিনী নারীগণ আসিয়া মঙ্গলধ্বনিতে জগন্নাথ মিশ্রের ভবন মুখরিত করিয়া তুলেন। শচীকুমার জন্ম গ্রহণ করিলে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ভক্ত হরিদাসের হস্ত ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং জাহ্নবীতে স্নানার্থ গমন করিয়া এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে পয়সা, চাউল প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বাস করিতেন, এই শিশুদ্বারাই ভবিষ্যতে বৈষ্ণবধর্ম্ম চারিদিকে বিস্তৃত হইবে—ভগবদ্ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক মানব-হৃদয় সিক্ত করিবে।

শচীদেবী তাঁহার নবকুমারের নাম নিমাই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই শিশু দেখিতে এত সুন্দর হইয়াছিল যে, অপরাপর নারীগণ তাঁহাকে গৌর বলিয়া ডাকিতেন। এইজন্য বাল্যাবস্থায় শিশু, নিমাই ও গৌর নামেই অভিহিত হইতেন। তবে সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে নিমাই বলিয়াই ডাকিত। সন্ন্যাসের সময় তিনি চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-লেখকেরা তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। শচীদেবী সন্তানকে খৈ, মুড়কি, বাতাসা প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য খাইতে দিতেন। কিন্তু একদিন তিনি আসিয়া দেখেন, নিমাই খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া মাটি খাইতেছে। মা সন্তানকে খাবার ফেলিয়া মাটি খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, খৈ, মুড়কি ফেলিয়া কাদা খাইতেছ কেন?" নিমাই তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় উত্তর করিলেন, "মা, মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি সকলই মাটির বিকারমাত্র, তবে মাটি খাইতেছি বলিয়া কেন দুঃখ কর!" মা, মাটি খাওয়ায় শরীরের অনিষ্ট হয় যখন বুঝাইয়া দিলেন, তখন নিমাই বলিলেন, "পূর্ব্বে জানিলে আর মাটি খাইতাম না।" 'সকলই মাটির বিকার' ইহা যে তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর একদিন কোন ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি বাল-গোপালের উপাসক ছিলেন। মিশ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণ পাক করিয়া আহার করিতে যাইবেন, এমন সময়ে নিমাই তাঁহার পাত্র হইতে অন্নগ্রাস লইয়া আপন মুখে তুলিয়া দিলেন। আগন্তুক পুনরায় রন্ধন করিয়া আহার করিতে যাইবেন, এমন সময় নিমাই আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তৈর্থিক ব্রাহ্মণের পাত হইতে অন্নগ্রাস তুলিয়া লইয়া আহার করিলেন। দুইবারই মিশ্র ও শচীদেবী পুত্রের ঈদৃশ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। মিশ্র পুত্রের এইরূপ ব্যবহারের জন্য তাহাকে তাড়না করিতে উদ্যত হইলে, অতিথি তাহা হইতে নিরস্ত করেন। তৃতীয় বার মিশ্র, অতিথির রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। কিন্তু এবার অন্ন প্রস্তুত হইলে, কথিত আছে, নিমাই ব্রাহ্মণের নিকট নিজ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া বালগোপালরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

নিমাই বাল্যকালে বড় চঞ্চল ছিলেন। লোকে যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত, তখন নিমাইও গঙ্গায় গিয়া নানা প্রকার উৎপাত করিতেন। জলে ডুবিয়া কাহারো পা ধরিয়া টানিতেন, কাহারো গাত্রে জল ছিটাইয়া দিতেন। নারীরা যখন পূজা আহ্নিক করিত, তখন তাহাদিগের নিকটে

যাইয়া বলিতেন, "ফুল দিয়া, তোমরা আমাকেই পূজা কর।" নিমাই যে পুরুষ ও নারীগণকে এত বিরক্ত করিতেন, তথাপি সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। মিশ্র-সন্তানের মধ্যে এমন এক অপরূপ লাবণ্য ছিল যে, তাঁহাকে লোকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের হাতেখড়ি দিয়া তাঁহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি একবার যাহা শিখিতেন, তাহা তাঁহার স্মৃতি হইতে কখন বিলুপ্ত হইত না। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ-সময় মিশ্র-পরিবারে এক বিষাদের ঘটনা উপস্থিত হইল। নিমাইয়ের বিশ্বরূপ নামে এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই বালক অতি অল্প বয়স হইতেই সংসারের প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করিতেন। এইরূপ বৈরাগ্যপ্রবণ হৃদয় কি সংসারের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল বিস্মৃত হইতে পারে? বিশ্বরূপ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন রজনীতে পিতা-মাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা আর কেহ নিরূপণ করিতে পারিল না। এই নিদারুণ ঘটনায় পিতা-মাতার মন ভাঙ্গিয়া গেল। নিমাই যখন শুনিলেন যে, বিশ্বরূপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই রীতিমত সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংসার-পরিত্যাগের পরে জগন্নাথ মিশ্র ভাবিলেন, লেখাপড়া শিক্ষা করিলেই মানুষের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহা হইতেই সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মিয়া থাকে। বিশ্বরূপে তাহাই হইল। এইরূপ কল্পনা করিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে শিক্ষাদানে বিরত হইলেন। শচীদেবী

নিমাইয়ের শিক্ষা বন্ধ হইল দেখিয়া, স্বামীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেন না।

নিমাই একে চঞ্চলপ্রকৃতির বালক, তাহাতে লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেলে, তিনি সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন এবং অতিরিক্ত চঞ্চলতা প্রকাশের দ্বারা অন্যান্য লোককে অস্থির করিয়া তুলিতেন। একদিন নিমাই আঁস্তাকুড়ে গিয়া দাঁড়াইলেন; শচীদেবী সন্তানকে ঐ অপরিষ্কার মূত্র পুরীষপূর্ণ স্থানে দাঁড়াইতে দেখিয়া, যষ্টিহস্তে তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, নিমাই বলিলেন, "আমাকে লেখাপড়া করিতে দেবে না ত আমি কি করিব;—যদি এখন হইতে আমাকে শিক্ষা দাও তাহা হইলে আমি এখান হইতে সরিব, নতুবা আমি যাইব না।" মাতা সন্তানের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তাঁহার কথা পালন করিতে স্বীকৃতা হইলেন। নিমাই আঁস্তাকুড় হইতে দূরে আসিলে, শচীদেবী তাঁহার অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। মিশ্র সকলই শুনিলেন, এবং তাঁহাকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নবদ্বীপে গঙ্গাদাস নামে একজন প্রধান বৈয়াকরণ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। জগন্নাথ মিশ্র সন্তানকে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ উপস্থিত করিলে, গঙ্গাদাস অতি আদরের সহিত নিমাইকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। নিমাই অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ব্যাকরণ নহে, নিমাই এই অল্প বয়সেই ন্যায়-স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্বরূপের সংসার-পরিত্যাগের পর হইতেই জগন্নাথ মিশ্রের মনে সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিত যে, নিমাইও হয় ত একদিন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এই চিন্তা তাঁহার মনকে এত অধিকার করিয়াছিল যে, তিনি নিদ্রাযোগে একদিন দেখিলেন, "তাঁহার

নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছেন।” মিশ্র এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শচীদেবীকে বলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। নিমাই-জননী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন বটে, কিন্তু এই ঘটনা তাঁহার নিকট যেন সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিলেন। নিমাই যথাবিধি পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। শচীদেবী পতিহীনা হইয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন ;—নিমাই পিতৃশোকে সন্তপ্ত হইলেও, জননী যখন ক্রন্দন করিতেন, তখন নিমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতেন। নিমাই তাঁহার মাতার এখন একমাত্র আদরের জিনিষ।

তিনি মনোযোগের সহিত গঙ্গাধরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার চাঞ্চল্য ও ক্রোধ যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জ্ঞানাভিমানীর ন্যায় বৈষ্ণবদিগের প্রতি অসম্মানের ভাব প্রদর্শন করিতেন,—অন্যান্য টোলের ছাত্রদিগকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন। তিনি শচীদেবীর আদরের সামগ্রী। এইজন্য সামান্য কারণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া গৃহের দ্রব্যাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। শচীদেবী তাঁহার সকল আব্‌দারই সহ্য করিতেন।

গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতে পড়িতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিষয় চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনিও সে-সময় ব্যাকরণে নবদ্বীপে সকল চতুষ্পাঠীর ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ব্যাকরণ নহে—নিমাই ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় চতুষ্পাঠীতে রীতিমত অধ্যয়ন না করিলেও অধ্যাপকগণের মুখ হইতে ঐ-সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রতিভাবলে ঐ-সকল বিদ্যায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, ঐ-সকল বিষয়ের পারদর্শী ছাত্রদিগকেও তিনি প্রশ্নোত্তরে পরাস্ত করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাদাসের টোলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিমাই নিজে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। তাঁহার সুযশের কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে ছাত্রসকল শিক্ষার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিল। তিনিও দক্ষতার সহিত তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। নিমাই সমস্ত দিনই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার সময় ছাত্রবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া জাহ্নবীর তীরে গমন করিয়া তাহাদিগের নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন। সহস্র ছাত্র তাঁহার টোলে শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিল।

অন্য টোলের ছাত্র চট্টগ্রামবাসী সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত অলঙ্কার-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। নিমাই সকলকেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পরাস্ত করিতেন। মুকুন্দ দত্তের সহিত নিমাইয়ের একদিন পথে দেখা হইলে মুকুন্দ ভাবিলেন, "নিমাই অলঙ্কার-শাস্ত্র বিষয়ে কিছুই জানে না, আজ এ-বিষয়ে দুই একটা প্রশ্ন করিয়া উহাকে পরাস্ত করিব," এই মনে করিয়া, তিনি নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রশ্ন করিলেন। নিমাই তাহার এমন সদুত্তর প্রদান করিলেন যে, মুকুন্দ তাঁহার উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এমন পণ্ডিত ত দেখি না, সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা।" আর একদিন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত গদাধরের সহিত তাঁহার দেখা হওয়াতে, নিমাই বলিলেন, "তুমি ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা কর, আচ্ছা, মুক্তি কাহাকে বলে বল দেখি?" গদাধর মুক্তির ব্যাখ্যা করিলে, নিমাই তাহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া গদাধরকে পরাস্ত করিলেন। গদাধরও তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে দক্ষতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

অনেক সময় নিমাইয়ের উদ্ধত-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত। সে-

সময় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ও নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত বৈষ্ণবেরা ক্ষীণভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন। নিমাই এই-সকল অনুরাগী বৈষ্ণবদিগকে বিদ্রূপ করিতেন, আর বলিতেন, আমি শাস্ত্রালোচনা লইয়া থাকিব, এ-সকল আমার ভাল লাগে না। একদিন নবদ্বীপের বৈষ্ণবপ্রমুখ শ্রীবাস পণ্ডিতকে পথে দেখিয়া ব্যঙ্গ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আজ তিনি যাঁহাদিগকে উপহাস করিতেছেন, একদিন যে তিনি তাঁহাদিগেরই নেতা হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের রসপূর্ণ পথে তাঁহাদিগকেই পরিচালিত করিবেন, তখন তাহা তিনি বুঝিতে সমর্থ হন নাই।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লক্ষ্মীদেবী রূপে গুণে লক্ষ্মীসদৃশাই ছিলেন। শচীদেবী পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া আনন্দে সংসার করিতে লাগিলেন। নিমাইও সম্মানের সহিত অধ্যাপন-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

কিছুদিন পরে কুমারহট্টনিবাসী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি পরমবৈষ্ণব ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। পুরী নবদ্বীপে আসিয়া তৎকালের বৈষ্ণবসমাজের শীর্ষস্থানীয় অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আগমন করেন। পুরীকে দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য পরম ভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। একদিন পুরী পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় নিমাইয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াতে, পুরী রূপলাবণ্য দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শচীনন্দনও পুরীকে একজন পরম ভাগবত জ্ঞান করিয়া তদীয় চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া তাঁহাকে আপন ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া শচীভবনে গমন করিলেন। নিমাই পণ্ডিত দাম্ভিকের শিরোমণি বলিয়াই লোকে জানিত। তিনি বিদ্যারসে যেন সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন, ভক্তিপথাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁহার

বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, বরং তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষেই দৃষ্টিপাত করিতেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহার সে-ভাব যেন তিরোহিত হইল। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে এই ভক্তের মুখবিনিঃসৃত মধুর ভক্তির কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পুরী কৃষ্ণলীলামৃতের রচয়িতা, তিনি নিমাইকে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়া জানিতেন, এজন্য তিনি নিমাইয়ের হস্তে তাঁহার গ্রন্থ প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইহার মধ্যে যদি কোন ভ্রম দৃষ্ট হয়, অসঙ্কোচে তাহা তুমি আমাকে জানাইবে।" নিমাই বলিলেন, "ভক্তিগ্রন্থের দোষ উল্লেখ করিলে অপরাধ হয়। কিন্তু পুরীর বিশেষ অনুরোধে নিমাই উহা পাঠ করিয়া অতি বিনীতভাবে, উহার স্থানবিশেষের ছন্দঃপতন ও ব্যাকরণের দোষ উল্লেখ করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত ঈশ্বরপুরী অতি সন্তুষ্টচিত্তে নিমাই-প্রদর্শিত তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলেন। ইনিই ভবিষ্যতে শচীকুমারের দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপে কেশব কাশ্মীরী নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন। ইনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বড় বড় পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করেন। নবদ্বীপে আগমন করিয়া এই ঘোষণা করিলেন, ইনি সকল বিষয়ের বিচারের জন্য প্রস্তুত আছেন, যদি কেহ বিচারে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে জয়-পত্র লিখিয়া দিন। কিন্তু নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতেরা কেহই তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলেন না। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, যদি ইঁহার সহিত বিচারে নবদ্বীপ পরাস্ত হয়, তাহা হইলে, নবদ্বীপের যশঃসূর্য্য কলঙ্কের মেঘে আচ্ছন্ন হইবে। এ-সময় নিমাই পণ্ডিত তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র-সমবেত হইয়া অধ্যাপন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে কোন ছাত্র বলিল, "প্রভো, এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইনি বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে কেহ সাহসী হন নাই।" নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান দর্পহারীর দর্প চূর্ণ

করিয়া থাকেন, যদি তাঁহার বিদ্যার এতই অহঙ্কার হইয়া থাকে, ভগবান তাঁহার সে গর্ব্ব রাখিবেন না।"

এই-সময় একদিন দিগ্বিজয়ী আপনার সমভিব্যাহারীদিগের সহিত গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, নিমাই পণ্ডিত আপনার বহুসংখ্যক শিষ্যবৃন্দ লইয়া জাহ্নবীর তটে সভা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় চারিদিক আলোকিত হইতেছে ; জাহ্নবীর জলরাশির উপর চন্দ্রের কিরণ পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কেশব কাশ্মীরী নিমাইয়ের সভায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। নিমাইও দিগ্বিজয়ীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারই নাম নিমাই ?"

নিমাই বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ !"

দিগ্বিজয়ী—তুমি নবদ্বীপের মধ্যে প্রধান বৈয়াকরণ বলিয়া শুনিয়াছি।

নিমাই। ব্যাকরণের অধ্যাপনা করি বটে, কিন্তু এখনও ব্যাকরণে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মায় নাই।

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "না, আমি শুনিয়াছি, তুমি ব্যাকরণে অদ্বিতীয়।"

এইরূপ কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দিগ্বিজয়ী দম্ভের সহিত নিমাইকে বলিলেন, "তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে ? যে-কোন বিষয় হয়, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।" নিমাই অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—তিনি তাঁহার ছাত্রেরই উপযুক্ত নন ; কোন বিষয়েই তাঁহার বিশেষ অধিকার নাই—ইত্যাদি। আপনার বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত শুনিয়াছি, আচ্ছা, এই যে সম্মুখে জাহ্নবী বিরাজ করিতেছেন, ইঁহার মহিমা বর্ণনা করিয়া যদি আমাদিগকে শ্রবণ করান, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখী হইব।" কেশব কাশ্মীরী তৎক্ষণাৎ একশত শ্লোকে

গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিয়া গেলেন। নবরচিত শ্লোক শ্রবণ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গৌরচন্দ্র দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার দুই একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" দিগ্বিজয়ী কোন্ কোন্ শ্লোক শুনিতে চাহিলে, গৌর কয়েকটী শ্লোকের উল্লেখ করিলেন। এত শ্লোকের মধ্যে তিনি কিরূপে স্মৃতিতে ঐ শ্লোকগুলি আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দিগ্বিজয়ী অবাক্ হইয়া গেলেন। তৎপর নিমাইয়ের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমার এই শ্লোকের মধ্যে কোথাও কোন দোষ ত আমি দেখিতেছি না।" তখন নিমাই অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "যদি অপরাধ ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি এ-বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া গৌর সেই শ্লোকগুলির ব্যাকরণের ছন্দঃপতনের এবং অলঙ্কারের দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী দেখিলেন, নিমাই পণ্ডিত যে-সকল দোষ প্রদর্শন করিলেন, তাহা যথার্থই বটে। তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। নিমাইয়ের বহুসংখ্যক ছাত্র হাস্য করিয়া উঠিল। গৌর সেজন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন, "মহাশয় আপনার কবিত্ব-শক্তি অসাধারণ, আপনি একশত শ্লোক রচনা করিয়া যে অনর্গল বলিয়া গেলেন, ইহাতে আপনার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দোষ কাহার না ঘটিয়া থাকে; ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিদিগের কবিতার মধ্যেও দোষ লক্ষিত হয়। আপনি সেজন্য মনে কষ্ট না পান এই আমার অনুরোধ।" দিগ্বিজয়ী তাঁহাকে কেবল প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়াই জানিতেন, এখন অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কথিত আছে, সেই দিন রাত্রে বীণাপাণি স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়া গৌর যে ঈশ্বরের অবতার তাহা প্রকাশ করেন। দিগ্বিজয়ী তৎপরদিবস, নিমাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করিবার পর তাঁহার সুযশ চারিদিকে নিনাদিত

হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে পাঠার্থীরা আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। নিমাই কেবল পণ্ডিত বলিয়াই সুনাম লাভ করিয়া ছিলেন তাহা নহে; দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়াও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ লোক ব্যতীত প্রতিদিন কুড়ি বাইশজন ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে আহার করিত। গৌর-জননী শচীদেবী তাঁহার পুত্রবধূ লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী সততই রন্ধনশালায় থাকিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। মিশ্র-পরিবারে আগন্তুকেরা ইঁহাদের ব্যবহারে অতি তৃপ্তিলাভ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে নিমাই মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করেন। তিনি কোন্ কোন্ স্থলে গমন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। তবে তাঁহার আগমনে উক্ত অঞ্চলে যেন একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যেখানেই গমন করিতেন, বহু-সংখ্যক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিত। তিনি এ-সময় ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী প্রস্তুত করেন, অধ্যাপকেরা তাহারই সাহায্যে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। এই টিপ্পনী এখন আর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশেই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া ছিলেন। তিনি যখন স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগত হন, তখন বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে অর্থ ও নানারূপ উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ছাত্রও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার বিদেশে অবস্থানকালে তাঁহার ভবনে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ইতোমধ্যে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে জীবন হারাইয়াছেন। লক্ষ্মীকে হারাইয়া শচীদেবী শোকে কাতরা হইয়া দিনযাপন করিতেছেন।

নিমাই আনন্দের সহিত বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কেহই প্রথমে এ দুঃখের সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর করিতে সাহসী হয় নাই। তিনি বাটীতে আগমন করিয়া প্রথমে বহির্বাটীতে বসিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত দেশভ্রমণের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুরতা-পূর্ণ বাক্য সকলেই আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিল। তৎপর তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, জননী বিমর্ষ-বদনে বসিয়া রহিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ; এমন সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ লক্ষ্মীদেবীর পরলোক-গমনের কথা উল্লেখ করিল। গৌর এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণমাত্র স্থির হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটি চক্ষু হইতে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল। মাতাও উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই ধৈর্য্যধারণ করিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের বিদেশ-ভ্রমণের সময় টোলের কার্য্য বন্ধ ছিল। এখন আগমনের পর হইতে রীতিমত উহার কার্য্য চলিতে লাগিল। পত্নী-বিয়োগ-জনিত শোকের তীব্রতা ক্রমে নিমাইয়ের মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল। মাতা তাঁহাকে পুনরায় পরিণীত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপে তৎকালে সনাতন পণ্ডিত নামে একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। শচীদেবী এই কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সনাতন আনন্দের সহিত এ-প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। গৌরও সম্মত হইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান্ নামক এক ধনী ব্যক্তি এ-বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় বিবাহ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

নিমাই অনেক সময় শিষ্যদিগকে লইয়া বাজারে গমন করিতেন। তাঁহার এমনই স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, যে তাঁহাকে একবার দেখিত

সে-ই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। তিনি যখন বাজারে গমন করিতেন, তখন দোকানদারেরা অনেকেই আপনাপন বিক্রেয় দ্রব্য বিনামূল্যে প্রদান করিতেন। নবদ্বীপের বাজারে শ্রীধর-নামক এক তরকারী-বিক্রেতাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এবং রসিক-পুরুষের ন্যায় তাহার সঙ্গে কৌতুক ও তামাসা করিতেন। নিমাই একদিন তাহাকে বলিলেন, "শ্রীধর, শুনিতে পাই তোমার নাকি অনেক টাকা মাটির ভিতরে পোতা আছে?"

শ্রীধর বলিল, "প্রভো! আমি টাকা কোথায় পাব? আমার যে কষ্ট, তা' আর তোমায় কি বল্‌ব।"

নিমাই একটু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর, আমি জানি তুমি সর্ব্বদা হরিনাম কর; হরিনাম করিলে মানুষ কি দুঃখ পায়?"

নিমাই ইত্যবসরে শ্রীধরের নিকট হইতে থোড় কলাপাতা প্রভৃতি লইয়া বলিলেন, "শ্রীধর, মূল্য লও।"

শ্রীধর বলিল, "ঠাকুর, আমি তোমার নিকট হইতে দাম চাই না, তুমি যখনই হাটে আসিবে, তখনই আমার কাছ থেকে জিনিষ নিয়ে যেও।"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "বেশ! শ্রীধর, তবে আর তোমার সঙ্গে বেশী কথার দরকার কি, আমার থোড়, কলা, মূলা পেলেই হলো।

"থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কোন্দল না কর আমা সনে।

* * * *

প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই।
সবে থোড় কলা মূলা, ভাল যেন পাই॥"

নিমাই পিতৃলোকের সদ্‌গতির জন্য গয়াধামে গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়া মাতার অনুমতিপ্রার্থী হইলেন। শচীদেবী সন্তানকে দূরে পাঠাইতে

অনিচ্ছুক হইলেও, তাঁহাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি কয়েকজন শিষ্যের সহিত গয়া-যাত্রা করিলেন।

নিমাই শিষ্য-বৃন্দের সহিত পথে যাইতে যাইতে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক-দিবস বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না দেখিয়া শিষ্যেরা অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি এক ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। পরে সুস্থ হইয়া শিষ্য-বৃন্দের সহিত গয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা বহুদিন পথ-ভ্রমণের পর গয়াধামে উপনীত হইলেন। ভারতের এই প্রসিদ্ধ পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিয়া নিমাই অবনত মস্তকে সেই স্থানের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া, আপন মস্তক নত করিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত করিলেন। অবশেষে স্নানাদি করিয়া বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম-দর্শনার্থ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গয়াসুরের মস্তকোপরি বিষ্ণুর পদাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া পাণ্ডারা সে চরণের গুণকীর্ত্তনে রত হইলে, নিমাই ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরলধারে বারি বহিতে লাগিল; তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। ঘটনা-ক্রমে ঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনিমিষ লোচনে নিমাইয়ের ভাব দর্শন করিতে করিতে ভাবিলেন, গৌর সামান্য মানব নহেন। এই পরমসুন্দর যুবা-পুরুষ সাধারণ লোকের অতীত। ঈশ্বর পুরী আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে আপনার বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিলনে। এতক্ষণ নিমাই ঈশ্বরপুরীকে দেখিতে পান নাই। তাঁহাকে দেখিয়া নিমাই তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পুরী তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গয়াধামে অবস্থানকালীন নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র-গ্রহণের

প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়া, তাঁহাকে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া পুরী বলিলেন, "তোমাকে মন্ত্র দান করিব, এ আর আশ্চর্য্যের কথা কি, আমি তোমার জন্য এ প্রাণপর্য্যন্ত দান করিতে পারি।" নিমাইয়ের আশা পূর্ণ হইল। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে মন্ত্র দান করিলেন। দীক্ষার পর তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে যেন বিভোর হইয়া পড়িলেন। অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে ও তাঁহার নাম-গুণ-গানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে, "কৃষ্ণ রে বাপ রে আমার, দেখা দিয়ে কোথায় পালালে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারীরা নিমাই পণ্ডিতের এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক লোক আগমন করিতে লাগিল। বিদেশ-প্রত্যাগত সন্তানকে পাইয়া শচীদেবীর আর আনন্দ ধরে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার মন আজ আনন্দে ভাসিতেছে। নিমাই জননীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গেও মধুর বচনে কথা বলিলেন। দিবাবসানে শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। নিমাই তাঁহাদিগের সহিত গয়াধামের বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের কথা বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি নীরব হইলেন। অবশেষে তিনি ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভুর নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল বহুতর॥"

বৈষ্ণবগণ নিমাই পণ্ডিতের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, উদ্ধতের শিরোমণি জ্ঞানগর্ব্বী নিমাই বিষ্ণুভক্ত হইলেন? নিমাইয়ের এই ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিমাই এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্মের কথা বলিতে বলিতে ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন চেতনা লাভ করিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিতকে বলিলেন, "ভাই, আমি তোমাদিগকে আমার মনের কথা বলিতে চাই, তোমরা কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে সকলে মিলিত হইবে।" ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত অন্তরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্রোতস্বিনী-পুলিনে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীর। নিমাইয়ের প্রস্তাবানুসারে পরদিন সকলে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে মিলিত হইলেন। এমন সময়ে নিমাই ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভক্তি-সুরাপানে যেন বিভোর হইয়াই তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি আসিয়াই ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবের স্রোতে ব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত ভক্তমণ্ডলী অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। সকলেরই নয়নধারায় শরীর যেন ভাসিতে লাগিল, হরিধ্বনিতে সে-স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। বিষ্ণু-ভক্তেরা বলিতে লাগিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যখন আমাদের দলভুক্ত হইয়াছেন, তখন পাষণ্ডীদিগের দর্প এবার চূর্ণ হইবে।" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ং গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন?"

"শুনিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে 'ঈশ্বর বা হইল বিদিত॥'

কেহো বোলে 'নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে॥'"

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহের সভা ভঙ্গ হইলে নিমাই তাঁহার গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গঙ্গাদাস তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন; আর বলিলেন, "তুমি যাওয়া অবধি তোমার শিষ্যেরা আর কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে চায় না। এখন টোলের কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিয়মিতরূপে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দান কর।"

এখন গৌর আর সে গৌর নাই; তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত। তিনি চতুষ্পাঠীর কার্য্য আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু অপরা-বিদ্যা শিক্ষাদানে তাঁহার আর রুচি ছিল না। নবদ্বীপে স্নেহ, মমতা, পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাদানের সহজ প্রণালী যেমন তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হইত, তেমন আর কাহারও মধ্যে দেখা যাইত না। গয়াধাম হইতে যখন তিনি আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন বহুসংখ্যক ছাত্র উৎসুক হৃদয়ে চতুষ্পাঠীতে সমবেত হইল এবং সকলে গুরুদেবকে অভিবাদন করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে পুঁথির ডোর খুলিল। ছাত্রেরা অধ্যয়নের বিষয় প্রশ্ন করিলে, গৌর বলিলেন, "হরিই সকল শাস্ত্রের মূল, আগম, নিগম প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; তিনিই জগতের জীবন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহার মতি নাই, সে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও শাস্ত্রের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ভজন ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যায় পটু, সে কেবল গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করে মাত্র। তাঁহারই পবিত্র নামে জগৎ পবিত্র হইয়া যায়।" গৌর এইরূপে হরিনামের মাহাত্ম্য নানারূপে বর্ণনা করিয়া ছাত্রদিগকে সেই হরির চরণ বন্দনা করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, "নবদ্বীপে এমন কার শক্তি আছে, যিনি আমার এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারেন?"

"দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে।"

ছাত্রেরা বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। তৎপর গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আজ আমার ব্যাখ্যা কিরূপ শুনিলে?" ছাত্রেরা বলিল, "প্রশ্নের ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" গৌর বলিলেন, "আজ আর পাঠের প্রয়োজন নাই, চল, সকলে মিলিয়া গঙ্গাস্নানে যাই।" ছাত্রেরা পুঁথি গুটাইয়া কৃষ্ণপ্রেমিক গুরুর সহিত সকলে জাহ্নবীতে স্নানার্থ গমন করিল।

"হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুন সব ভাই।
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই॥"

স্নানান্তে গৌর যখন আহার করিতে বসিলেন, তখন শচীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আজ পড়ুয়াদিগকে কেমন শিক্ষা দিলে?" তিনি বলিলেন, "মা, আমি আজ তাহাদিগের নিকট হরিনামেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি। মা, তুমিও সেই হরিনাম কর, হরির ধ্যান কর, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে।" জননী মনে মনে সকলই বুঝিলেন।

সেদিন চতুষ্পাঠীর আর কোন কার্য্য হইল না। পরদিন প্রভাতে অধ্যয়নার্থ ছাত্রেরা সকলে সমবেত হইল। ছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করিল "সিদ্ধবর্ণের সমন্বয় কি?"—উত্তর হইল, "শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতেই সিদ্ধবর্ণের সমন্বয় হয়।" নিমাই পণ্ডিত সকল পাণ্ডিত্যে জলাঞ্জলি দিয়া, এখন উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবের কথাই বলিতে লাগিলেন। ছাত্রেরা দেখিল, আর নিমাই পণ্ডিতের নিকট তাহাদের শিক্ষা চলিবে না। তাহারা বিষণ্ণ মনে পুঁথির ডোর বাঁধিতে লাগিল। নিমাই বলিলেন, "তোমরা আজ সকলে বৈকালে আসিও।" ছাত্রবৃন্দ গুরুকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া, গুরুদেবের সকল কথা নিবেদন করিল। গঙ্গাদাস নিমাইয়ের পণ্ডিত, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, নিমাইও

শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গঙ্গাদাস গৌর-শিষ্যদিগের নিকট হইতে সকল কথা শ্রবণ করিয়া নিমাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিমাই আসিলে তিনি অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "নিমাই, মন দিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান কর। এ অতি মহৎকার্য্য, আর তোমার বংশের লোক সকলেই পণ্ডিত। জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করা ভাল নহে। জ্ঞান না থাকিলে, মানুষ কি ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে? আমার কথা শুন, ভাল করিয়া কাজ কর।" গৌর সবই শুনিলেন, কিন্তু শুনিলে কি হইবে, এখন তাঁহার মন এক নবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। গৌর মস্তকটি হেঁট করিয়া গঙ্গাদাসের কথা শ্রবণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

তাঁহার কথানুসারে ছাত্রেরা অপরাহ্ণে চতুষ্পাঠীতে আগমন করিল। টোলের নিকটে রত্নগর্ভ নামে এক ব্যক্তি অতি মধুরস্বরে ভাগবত পাঠ করিতেন; সেদিন তিনি মধুরস্বরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। রত্নগর্ভের ভাগবত পাঠের ধ্বনিতে আজ নিমাইয়ের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ভক্তির আবেগে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেদিন আর অধ্যাপনা-কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইল না। ছাত্রেরা গৃহে গমন করিল।

পরদিন তরুণতপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত নিমাই পণ্ডিতের শিষ্যবৃন্দ সকলেই চতুষ্পাঠীতে সমবেত হইল। জনৈক ছাত্র শব্দবিশেষের ধাতু জিজ্ঞাসা করায় গৌর বলিলেন, "কৃষ্ণই একমাত্র ধাতুরূপে সকল পদার্থের মধ্যে থাকিয়া সকল বস্তুকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর ধাতু নাই।" এই বলিয়া গৌর বলিলেন, "নবদ্বীপে এমন কে আছে, যিনি আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে পারেন?" ছাত্রেরা বলিল, "গুরুদেব, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সকলই সত্য, তবে আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে আসি, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না।" তখন গৌর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই, আমার হৃদয়ের মধ্যে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু বংশীর মধুর স্বরে আমার চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে,—সে রূপ দর্শনে, সে মধুর রব শ্রবণে

আমি আত্মহারা হইয়া পড়িতেছি।" এই সকল বলিবার সময় তাঁহার সমস্ত অঙ্গ হইতে যেন দিব্য জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। ছাত্রেরা দেখিল, নিমাই পণ্ডিত আর মরজগতের লোক নহেন। তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণে মতি থাকে; কিন্তু আমরাও আর আজ হইতে কাহারও নিকট পাঠার্থ গমন করিব না।" এই বলিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে পুঁথির ডোর বন্ধ করিল। গৌর কাঁদিতে কাঁদিতে সকলকে আলিঙ্গন দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ছাত্রেরাও গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণত হইল। নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনা শেষ হইল—নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠতম চতুষ্পাঠীর কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

অনেক ছাত্র তাঁহার পথের অনুগামী হইল। তাহারা সকলে মিলিত হইলে, নিমাই আপনার বাটীর প্রাঙ্গণে করতালি দিয়া এই কীর্ত্তনটি গাহিতে লাগিলেন।

"হরয়ে নমঃ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রায় শ্রীমধুসূদন॥"

দিগ্বিজয়ী-জয়ী নিমাই পণ্ডিত ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে নৃত্য দর্শনে ও সে কীর্ত্তন শ্রবণে পাষাণ-প্রাণও যেন গলিয়া যাইতে লাগিল। এই নূতন ব্যাপার দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যে অদ্বৈতাচার্য্য বহুদিন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ও প্রেমের প্লাবনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, তাঁহার নিকট এই শুভ সমাচার প্রেরিত হইল। তিনি তখন শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই নিমাইকে ভক্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; ক্রমে তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে গৌরের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাঁহাদের ভাবও ঘনীভূত হইতে লাগিল। এখন হইতে নবদ্বীপের সুবিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীবাস

পণ্ডিতের বাটীতে তাঁহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিশাকালে ভক্তদল একত্র হইয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন। প্রবল ভাবাবেশে তাঁহারা নিদ্রার সুখ বিস্মৃত হইয়া সমস্ত রজনী কাটাইয়া দিতেন। তাঁহারা যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন নবদ্বীপের বহু লোক মিলিত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বহির্ব্বাটীর চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া ফেলিত।

এ-সময় গৌরের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ভাব এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, লোকে সে-ভাবকে ক্ষিপ্তের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত শচীদেবীর বাটীতে আসিলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, সকলে আমাকে পাগল বলে, আমি কি পাগল হইয়াছি?" শ্রীবাস বলিলেন, "নিমাই, তুমি পাগল হও নাই; তোমার যে রোগ তাহা যদি আমি পাই, তাহা হইলে. আমি কৃতার্থ হইয়া যাই।" গৌর বলিলেন, "তুমি যদি পাগল বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া এ জীবন বিসর্জ্জন করিতাম।"

এই সময় অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। নিমাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যখন তথায় হরিপ্রসঙ্গ উত্থিত হইল, সেই সময়ে নিমাইয়ের হৃদয়ে ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। নিমাই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অনিমিষ-লোচনে তাকাইয়া রহিলেন, অবশেষে মনের আবেগে পুষ্প ও বিল্বপত্র-দ্বারা তাঁহার চরণযুগল পূজা করিলেন। নিমাই জ্ঞানলাভ করিয়া এ পূজার প্রতিবাদ করিয়া অদ্বৈতের চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন, "আজ আপনার দর্শন-লাভে জীবন কৃতার্থ হইল। আপনার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাব মনে উদিত হয়।"

নিমাই ভক্তদিগের সঙ্গে হরিনাম-প্রসঙ্গে ও সংকীর্ত্তনে দিন

কাটাইতে লাগিলেন। যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, সকলেরই কানে নবদ্বীপের এই মহাপ্লাবনের সমাচার পৌঁছিতে লাগিল। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি সকলে মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের বাটীতে যেন আনন্দের বাজার বসিয়া গেল। মানবের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের উৎস খুলিয়া গেলে তাঁহার দিব্য চক্ষুও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অপরে যে গুপ্ত রহস্যের মর্ম্ম-গ্রাহী না হইতে পারেন, তিনি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন। একদিন সকলে প্রেমোন্মত্তভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে নিমাই "পুণ্ডরীক বাপরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মণ্ডলীর লোকেরা পুণ্ডরীকের নাম শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তৎপর "পুণ্ডরীক কে?" নিমাই জিজ্ঞাসিত হইলে, নিমাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিয়া বলিলেন, "শ্রীহট্টনিবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সুপণ্ডিত ঐশ্বর্য্যশালী ও পরম ভক্ত, তিনি এ স্থানে আগমন করিবেন।" কথিত আছে, নিমাইয়ের প্রেমের আকর্ষণে বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি যখন নিমাইয়ের দর্শনোদ্দেশে নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য ও বিলাসিতা দর্শন করিয়া নিমাইয়ের অন্যতম শিষ্য চিরকুমার গদাধর বিদ্যানিধির ভক্তিভাবের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম ত্বরায় ঘুচিয়া গেল। একদিন গদাধর সুগায়ক মুকুন্দ দত্তকে সঙ্গে লইয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখেন, বিদ্যানিধি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতেছেন, তাঁহার শয্যোপরি সুন্দর সুন্দর উপাধান ও পানের ডিবা সুসজ্জিত রহিয়াছে। নিমাইয়ের শিষ্যদ্বয়কে বিদ্যানিধি যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুকুন্দ ভগবদ্বিষয়ক একটি গান ধরিলেন। সঙ্গীত শ্রবণমাত্র ভাবে বিদ্যানিধির প্রাণ উথলিয়া উঠিল। তিনি সেই আবেগে শয্যা হইতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া "গাও গাও," বলিতে বলিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। গদাধর বুঝিতে পারিলেন, নিমাই ইঁহাকে যথার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চিরকুমার

গদাধর এই ঐশ্বর্য্যশালী ভক্তের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নিমাই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির "প্রেমনিধি" নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রাতঃকালে নিমাই নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের বাটীতে গমন করিলেন। ক্রমে তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ সকলে মিলিত হইলেন। নিমাই সংকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, তিনি বিষ্ণু খট্টায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে অভিষেক কর।" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, তদীয় শিষ্যেরা কলস কলস জল কর্পূরে সুবাসিত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ঢালিতে লাগিলেন, এবং ধূপ, ধূনা জ্বালিয়া চারিদিক সুগন্ধে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মুকুন্দ দত্ত সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন। অভিষেক-কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে নিমাই সকলের নিকট হাত পাতিয়া বলিলেন, "আমায় কিছু খাইতে দাও।" শিষ্যেরা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। তৎপর তিনি একে একে তাঁহার শিষ্যদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগের জীবনের অতীত কথা বলিতে লাগিলেন, ও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস প্রভৃতি তাঁহার প্রধান প্রধান প্রবীণ শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নিমাই তাঁহাদের সকলেরই জীবনের অনেক অতীত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ-সময়ে একটি বড় প্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি এ মহাভাবের সময় হাটের খোলা-বেচা শ্রীধরকে ডাকিতে বলেন। শ্রীধর আসিয়া দাঁড়াইল। নিমাই শ্রীধরের অনেক গুণের কথা উল্লেখ করিলে শ্রীধর অতি বিনীতভাবে বলিল, "প্রভো, আমি অতি সামান্য লোক, আমি

তোমার কুকুরের যোগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহি।” নিমাই বলিলেন, “তোমার এই বাক্যই আমার স্তুতি। তুমি আমার নিকট হইতে কিছু বর প্রার্থনা কর।”

শ্রীধর বলিল, “যে ব্রাহ্মণ বাজারে আমার নিকট হইতে খোলা-পাত লইতেন, তিনিই যেন জন্মজন্মান্তরে আমার প্রভু হইয়া থাকেন।” নিমাই তাহাকে অনেক ধনসম্পত্তি প্রদানের কথা বলিলে, শ্রীধর বলিল, “প্রভো, আমি আর কিছুই তোমার নিকট হইতে প্রার্থনা করি না, আমি যেন তোমার নাম গান করিয়া জীবন কাটাইতে পারি, এই আমার প্রার্থনা।”

> “যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেক মোর খোলা পাত।
> সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
> যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
> মোর প্রভু হউ তান চরণযুগল॥”

এই মহানন্দের দিনে তিনি মুকুন্দকে কোন বর প্রদান না করাতে শ্রীবাস নিমাইকে বলিলেন, “মুকুন্দ মধুর গানে তোমার চিত্ত মুগ্ধ করে, তুমি তাহার প্রতি এমন উদাসীন হইয়া রহিয়াছ কেন?” নিমাই বলিলেন, “মুকুন্দ যখন যেখানে থাকে, তখন সেই ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে—তাহার মতি স্থির নাই।” মুকুন্দ গৌরচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া নিরাশ ও ভগ্নহৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কোমল-হৃদয় নিমাই তাঁহার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি আমার দেখা পাবে, কিন্তু কোটী জন্ম পরে।” ভক্তের প্রাণ এক অপূর্ব্বভাবে গঠিত! মুকুন্দ নিমাইয়ের এই আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে দুই বাহু তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তবে কোটি জন্ম পরে আমি প্রভুর দর্শন পাইব এই আমার পরম সুখ।”

> “প্রভু বোলে ‘আর যদি কোটি জন্ম হয়।
> তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥’

শুনিল 'নিশ্চয় প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ নিশ্চিত হৈলা পরমানন্দ সুখে॥
'পাইব পাইব' বলি করে মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥"

নিমাই কেবল তাঁহার কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে হরিনামামৃত পান করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মধুর হরিনাম শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি এজন্য হরিদাস ও নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিনাম গান করিবে; এবং সায়ংকালে সমস্ত দিনের কার্য্য-বিবরণ আমার নিকট প্রকাশ করিবে।" আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দ নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও তাঁহারা একদিনের জন্যও কার্য্য-বিরত হয়েন নাই। তাঁহারা জানিতেন, নামেতেই জীবের শান্তি, নামেতেই জীবের মুক্তি হইবে। এই সময়ে জগাই ও মাধাই নামে অতি দুরন্ত দুই ভ্রাতা সুরাপান করিয়া নবদ্বীপের পথে পড়িয়া থাকিত এবং বিনা কারণে লোকের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিত। ইহাদের প্রকৃতি পশুসম ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা সুরাপান করিয়া যখন পথিমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন নিত্যানন্দ হরিনামের মধুর বার্ত্তা শ্রবণ করাইবার জন্য ইহাদের নিকট গমন করেন। মাধাই ক্রোধান্ধ হইয়া নিত্যানন্দের বক্ষে কলসের কাণাভাঙ্গা নিক্ষেপ করিল। রুধিরধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু নিত্যানন্দ শান্তভাবে প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গৌর সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আপন আলয়ে লইয়া যান। ভ্রাতৃদ্বয় নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব ক্ষমা দর্শনে ও ভক্তদিগের মধুর সংকীর্ত্তন শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তির পথ অনুসরণ করে—তাহাদিগের জীবন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সে-সময় বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হুসেন সা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কাজী নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেন। কাজী দেখিলেন, বৈষ্ণবেরা নিমাই পণ্ডিতকে লইয়া হরিনামের স্রোতে সকলকে ভাসাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছে। মুসলমান-রাজত্বে হিন্দু-ধর্ম্ম এইরূপ অক্ষুণ্ণভাবে প্রচারিত হইবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। এইজন্য তিনি বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনের স্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের খোল ভাঙ্গিয়া ও মার মার শব্দে নিরীহ হরিভক্তদিগের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ভীরু অল্পবিশ্বাসীরা কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিল। যাহারা গৌরের নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল না, তাহারা বলিতে লাগিল, "কাজীর শাসনের নিকট আর এ-সব চলিবে না।" নবদ্বীপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কৃষ্ণভক্তেরা মর্ম্মাহত হইয়া কাজীর অত্যাচার ও আপনাদিগের হৃদয়-বেদনার কথা গৌরের নিকট নিবেদন করিলেন। সংকীর্ত্তনের জন্মদাতা গৌরসুন্দর এ-সকল কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "নবদ্বীপের সকল স্থলে হরিনাম ঘোষণা করিতে হইবে, দেখি কে বাধা দেয়।"

সন্ধ্যা সমাগমের কিছু পূর্ব্বেই দলে দলে লোক আসিয়া নিমাইয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল। গৌর কীর্ত্তনকারীদিগের দল বিভাগ করিয়া প্রত্যেক দলের এক একজন মূল-গায়েন স্থির করিয়া দিলেন। নিমাই নিত্যানন্দের সহিত শেষের দলে অগ্রণী হইয়া যাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনকারীদিগের মধুর কণ্ঠস্বরে যেন চারিদিকে সুধার স্রোত প্রবাহিত

হইতে লাগিল; নবদ্বীপের আকাশ সে মধুর শব্দে নিনাদিত হইল। তাঁহাদিগের সে নৃত্য, সে উচ্ছ্বাস যাহারা দেখিল, তাহাদিগেরই চিত্ত যেন প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু শত শত লোকের মধ্যে গৌর যখন উৰ্দ্ধনেত্র ও উৰ্দ্ধবাহু হইয়া নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে হরিগুণ-কীৰ্ত্তন করিয়া চলিতে লাগিলেন, তখন সে দৃশ্যদর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতারাও মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। নিমাই যখন জনস্রোত লইয়া নবদ্বীপের পথে যাইতে লাগিলেন, তখন গৃহস্থের বাটীর কুলবধূরা হুলুধ্বনি ও শঙ্খনাদের দ্বারা এই শুভানুষ্ঠানের শুভকামনা করিতে লাগিলেন এবং কীৰ্ত্তনকারীদিগের মস্তকোপরি বিবিধ পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে আবৃত হইয়া পড়িলেন; অন্ধকার দেখা দিল। লোকেরা বড় বড় মশাল প্রস্তুত করিয়া জ্বালাইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ মহানন্দে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী দূর হইতেই তাঁহাদিগের মধুর ও গগনভেদী কীর্ত্তনের রোল শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের শব্দ ?" তাঁহার কর্ম্মচারীরা বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত তাঁহার দল লইয়া নগর-সংকীৰ্ত্তন করিতেছেন।" কাজী জনকোলাহল দেখিয়া মনে করিলেন, তিনি বৈষ্ণবদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন, সেজন্য আজ তাঁহারা বহুলোক সঙ্গে লইয়া আমার বাটী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাঁহার মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল; তিনি বাটীর ভিতর লুকাইলেন। এদিকে শত শত লোক তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া হরিনামের ধ্বনিতে যেন চারিদিক নিনাদিত করিতে লাগিল। নিমাই কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কাজী সাহেবকে ডাকিয়া আন।" কাজী বাটীর অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া গৌরের নিকট আসিলে গৌর বলিলেন, "আমরা আপনার বাটীতে আসিয়াছি, আর আপনি বাটীর ভিতরে রহিয়াছেন!" তৎপর উভয়ের মধ্যে

কিছুক্ষণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইলে কাজী বলিলেন, "আর এবার হইতে তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে না। তোমরা অবাধে যথা-ইচ্ছা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" কাজীর মুখ হইতে এই অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া সকলে মহোল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরের বাটীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গই এই নগর-সংকীর্ত্তনের জন্মদাতা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবার কিছুদিন পরেই গৌরের মনে হইল, এমন সুধামাখা হরিনাম বঙ্গদেশের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে না পারিলে, জীবনে সুখ নাই; কিন্তু এ ব্রত গ্রহণ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তিনি দেখিলেন, জগতের সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরের প্রাণে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এ-সময় তিনি একটি স্বপ্ন দর্শন করেন। কোন সদানন্দ পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জননী ও ভার্য্যা পরিত্যাগ করতঃ তাঁহাকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। গৌর এ-সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাঁহাকে প্রশ্ন করাতে, স্বপ্নদ্রষ্ট সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে তাঁহার জীবনের মহৎব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতঃ ত্বরায় সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নরনারীর উদ্ধারের জন্য হরিগুণরত হইতে বলিলেন। স্বপ্ন-দর্শনের পর নিমাইয়ের প্রাণ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য যেন অস্থির হইয়া পড়িল।

এমন সময় সত্য সত্যই একটি ঘটনা ঘটিল। কেশবভারতীনামক একজন পরিব্রাজক দণ্ডী নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র

নিমাইয়ের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি দেখিলেন, যিনি স্বপ্নযোগে সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, নবাগত কেশবভারতীর অবয়বের সহিত সেই স্বপ্নদ্রষ্ট ব্যক্তির অঙ্গের সমস্ত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বপ্ন সত্য হইল দর্শন করিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং দণ্ডী কেশবভারতীকে নিজ ভবনে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। ভারতী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য ও তাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মানুরাগের কথা দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেশবভারতীও তাঁহার গুণগৌরবের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গভীর রজনীতে নিমাই ভারতীর নিকট তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের কথা জ্ঞাপন করেন। ভারতী তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি ত মানুষ নও, সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার।" অবশেষে দীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হইল। পরদিন প্রভাতে ভারতী গোঁসাই কাটোয়ায় তাঁহার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

গৌর নিত্যানন্দকে সকল কথা বলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার সংকল্প বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মতেরই অনুমোদন করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারের মধ্যে গৌরের সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের কথা প্রবেশ করিল। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এ-সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। শচী অশ্রুপূর্ণ লোচনে সন্তানের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের কথা উত্থাপন করিলে নিমাই বলিলেন, "মা, সংসার অনিত্য, কেহ কাহারো নয়, শ্রীকৃষ্ণের ভজন ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তনেই জীবনের সুখ ও আনন্দ। মা, তুমি এই নাম-কীর্ত্তনেই জীবন অতিবাহিত কর।" নিমাই অবশেষে বলিলেন, "মা! সংসারের লোক হরিনাম গান না করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, আমি তাঁহারই মধুময় নাম চারিদিকে ঘোষণা করিব। মা, আমার পথের প্রতিবন্ধক হইও না।" বৈষ্ণব-লোকেরা বলেন, "নিমাই তাঁহার মাতাকে

আপনার অবতারত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন।” নিমাই অবতার হইলেও তিনি তাঁহার সন্তান। শচীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, সন্তানের সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি সন্তানের সংকল্প-সাধনের পথে কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ করিলেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া সকলই শুনিতেছেন; স্বামীর বৈরাগ্যাবলম্বনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রাণ আজ বিষাদে পূর্ণ; সংসারে তাঁহার আর সুখ নাই, শান্তি নাই। রজনী সমাগত হইলে, নবদ্বীপচন্দ্র ভক্তদিগের সঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং আহারাদি করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বামী নিদ্রিত; তিনি সজল নয়নে তাঁহার চরণ সেবা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তস্পর্শে গৌরের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন, সুন্দরী সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পদযুগলে আপনার সুকোমল হস্ত স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখকমল মলিন; আর তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে বারি নির্গত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করা বড় কঠিন সমস্যা। আর তরুণবয়স্কা যুবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংসারের অনিত্যতার কথা বুঝাইয়া তাহার চিত্তকে বৈরাগ্য-প্রণোদিত করিয়া স্বামিবিচ্ছেদে সুস্থির রাখিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনি পত্নীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কাঁদিতেছ কেন!” বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, “তুমি না সন্ন্যাসী হবে।” গৌর বলিলেন, “কে বলিল!” বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, “লোকের মুখে শুনিতেছি। তুমি নবদ্বীপের গৌরব; তোমার জন্য আমি ভাগ্যবতী; তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিতা। আমার জীবনে কত আশা ছিল, তুমি কি সে সকল ভাঙ্গিয়া দিবে? তুমি সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে তোমার ঐ সুকোমল রাঙ্গা চরণে কত কাঁটা বিঁধিবে—” এই সকল কথা বলিতে বলিতে,

তিনি স্বামীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিমাই তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া নানারূপ মিষ্ট বাক্যে তাঁহার মনে আনন্দের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন। পরে বলিলেন, "শুন বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া তুমি তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন কর।"

গৌর দেবতা হইলেও তিনি তাঁহার স্বামী। সতী-হৃদয়ে স্বামি-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অসহনীয়। তিনি অবিরলধারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই মধুর বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তখনই তোমার নিকট উপস্থিত হইব।" তাই কোন বৈষ্ণব-কবি বলিতেছেন ঃ—

"শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছয়ে তোমার ঠাঁই।
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়॥"

নিমাই যেমন তাঁহার মাতাকে আপনার অবতারত্বের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি তাঁহার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটেও আপনার ঐশীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার মনে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার স্বামী শ্রীকৃষ্ণের অবতার। এইজন্য গভীর হৃদয়-বেদনার মধ্যেও তিনি প্রাণে কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন, নিমাইয়ের সংকল্পের নিকট সকল বিঘ্ন-বাধা স্রোতের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। তিনি অবশেষে আপনার মনের আবেগ সংবরণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে স্বামীর চরণযুগলে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমি তোমার পথে বাধা দিব না। রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল, শোকে, দুঃখে ও

কষ্টে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবী আর তাঁহার সন্ন্যাসের কথা উত্থাপন করিতেন না। নিমাই কেশবভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, সে-সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। নিমাই সংকল্পে অটল। তিনি হরিপ্রেম বিলাইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিবেনই স্থির করিয়াছেন। ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস-যাত্রার পূর্ব্বদিন আকাশে নবভানু উদিত হইতে না হইতেই গৌর শয্যা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন—কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মধ্যাহ্নকালে কীর্ত্তন শেষ হইলে আহারাদির জন্য সকলে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন। অপরাহ্নে সকলে জাহ্নবীতটে গমন করিলেন। গৌরসুন্দর উপবেশন করিলেন, তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পের মালা ও তাঁহার অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। গৌর হরিপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলে, সকলে বিমুগ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণই জগতের সার, তাঁহার চরণে সর্ব্বদা মতি রাখিবে। আর কি ভোজনে, কি শয়নে সর্ব্বদা তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিবে।" সে-দিবস নিমাই আহারাদি করিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। কবি লোচন দাস বলেন, "নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে মধুর আলিঙ্গনে ও মধুর আলাপনে সুখী করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃসূর্য্যের উদয় হইতে না হইতে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য তাহা জানিতেন, শচীদেবীও তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

গৌরসুন্দরের চক্ষে আজ আর নিদ্রা নাই! শচীদেবীও বাণবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় পুত্রের সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করিয়া ভূতলশায়িনী হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বামীর অন্তকার আলিঙ্গন ও প্রেমালাপ চিরদিনের জন্য শেষ হইল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাত্রি আর চারি দণ্ড আছে। গৌর শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন, আবার একটু পশ্চাদ্‌পদ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। একবার মনে হইল, হায়! কিরূপে এ পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। পরক্ষণেই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, তিনি মত্তমাতঙ্গের মত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইলেন। নিমাই বহির্গত হইয়া দেখেন, শচীদেবী দ্বারদেশে ভূতলশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন। নিমাই তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে খাওয়াইয়াছ, পরাইয়াছ, বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছ ; তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। মা, আমি যেখানেই থাকি, তোমার সকল ভার আমার উপরেই রহিল।" এই সকল কথা বলিয়া নিমাই জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্রুতপদে বাটীর বহির্দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বহির্গত হইলেন। শচীদেবীর প্রাণ গভীর শোকে এতই আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না ; কেবল স্পন্দহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। নিমাই নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যামিনী প্রভাতা হইলে গৌর-শিষ্যেরা অসিয়া দেখিলেন, শচীদেবী গৃহ-প্রবেশদ্বারে যেন মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন-পথের নেতা ও তাঁহাদের পথপ্রদর্শক চলিয়া গিয়াছেন। অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তখনও নিদ্রিতা। গৌরের সন্ন্যাস-যাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া এক একটি করিয়া লোক আগমন করিতে লাগিল, সকলেই কাঁদিয়া আকুল। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি বুঝিলেন, স্বামী চলিয়া গিয়াছেন ; অন্তঃপুরবাসিনী লজ্জাশীলা বিষ্ণুপ্রিয়া আজ লোকলজ্জায় বিসর্জ্জন দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বাহিরে

আসিয়া পড়িলেন। ক্রমে গৌরের সন্ন্যাসের সমাচার চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বহুলোক ব্যথিত হৃদয়ে আগমন করিতে লাগিল। যাঁহারা নিমাইয়ের নবপ্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারাও আজ শোকাকুল হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস কোন স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, গৌরের শোকে অধীর হইয়া লোকে বলিতে লাগিল—"গৌর বিহনে এ জীবনধারণে আর প্রয়োজন কি? চল আমরাও গৌরের অনুসরণ করি।"

নিমাই হরিগুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়া-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য গুরুর তত্ত্বাবধান ও শরীর রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ইঁহারা পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

সন্ধ্যার সময় নিমাই কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন; এবং কেশবভারতীর আশ্রমে গমন করিয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আগামী কল্য আমাকে দীক্ষা দান করিয়া আমার সংসার-বন্ধন মোচন করুন।" ভারতী প্রথমে গৌরের অল্প বয়সের জন্য দীক্ষা দানে অসম্মত হয়েন, পরে তাঁহার অসাধারণ ভক্তির লক্ষণ দর্শন করিয়া বলেন, "আমি তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, সেরূপ ভক্তি-ভাব সাধারণ মানবে দৃষ্ট হয় না। তুমি নরনারীর গুরু হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে; আমি তোমার গুরুর যোগ্য নহি। তবে ধর্ম্মজীবন-লাভের জন্য গুরুকরণ যে আবশ্যক, এই সত্যটা শিক্ষা দিবার জন্য তুমি আমাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে, আমার তাহাই বোধ হইতেছে।" পর দিন প্রাতে গৌর মস্তকের চাঁচর কেশ ফেলিয়া দিলেন, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিলেন। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য নানা গ্রাম হইতে নরনারী মিলিত হইতে লাগিল। সকলেই এই নবীন সুন্দর পুরুষের সন্ন্যাসবেশ দর্শন

করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর আচার্য্য দীক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলে যথাসময়ে দীক্ষাকার্য্য সামাধা হইয়া গেল। দীক্ষার সময় কেশবভারতী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রদান করিয়াছিলেন। দীক্ষান্তে তিনি ভক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণত হইলেন, এবং নব বলে বলীয়ান হইয়া হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতভূমিতে এক সুরসাল ভক্তিধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন; এক নবযুগের সূত্রপাত করিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। কেশবভারতী এই দীক্ষাকার্য্যে আপনাকে প্রকৃত উপকৃত বোধ করিতে লাগিলেন। গৌর-হৃদয়ের ভগবৎপ্রেমের মধুর ও স্নিগ্ধ হিল্লোলে তাঁহার জীবনও শীতল হইতে লাগিল, ভক্তকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার চিত্তও ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া গেল। দীক্ষার দিন ভারতীর আশ্রমে ভক্তেরা সমস্ত রজনী নাম-সংকীর্ত্তনেই অতিবাহিত করিলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কোন নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সময় অতিবাহিত করিবার জন্য ভারতীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত তাঁহার অনুগমন করেন। কেশবভারতীও কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাইতে যাইতে নিমাই চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপে যাইয়া শচীদেবীকে সকল সমাচার অবগত করিতে বলেন। চন্দ্রশেখরও গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তথায় গমন করিলেন, এবং গৌর-জননীকে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা সকলই অবগত করিলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। চন্দ্রশেখরের আগমন-বার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইলে, গৌরের সন্ন্যাস-কাহিনী শুনিবার জন্য দলে দলে নরনারী আসিতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল।

শ্রীচৈতন্য অন্যান্য স্থান দর্শন করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং আচার্য্যের চরণে প্রণত হইয়া চক্ষের জলে সে চরণ

ধৌত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যও কাঁদিতে কাঁদিতে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি গৌরের অনুগত শিষ্যেরা শচীদেবীকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইলেন। ভক্তেরা কয়েকদিন অদ্বৈতভবনে আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করেন। গৌর তথা হইতে নীলাচল যাইবেন স্থির করিয়া জননীকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না, আমি নীলাদ্রিতে থাকিলে তুমি মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ পাইবে।" এইরূপ নানাপ্রকার সান্ত্বনার বাক্য বলিয়া তিনি নীলাচল যাত্রা করিলেন।

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য তাঁহার সঙ্গী হইলেন। চৈতন্যদেব সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কাহার নিকট কি আছে বল? পথের সম্বলের জন্য তোমাদিগকে কেহ কি কিছু দান করিয়াছেন?" সকলেই বলিলেন, "তোমার বিনা অনুমতিতে, কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতে কাহার সাধ্য আছে?" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবশেষে তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাসের বিষয় উপদেশ প্রদান করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। যাত্রিদল ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে ছত্রভোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমিক-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য আম্বুলিঙ্গ ঘাটে গঙ্গাদেবীর মনোহারিণী সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, এবং এ-স্থানের পৌরাণিক কাহিনী স্মরণ করিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মধুর ও উচ্চ কণ্ঠে 'হরি হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আম্বুলিঙ্গ ঘাটে হরিনামে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খান দোলারোহণে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভক্তি দেখিয়া দোলা হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভক্তিভরে তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি এ-স্থলের অধিকারী, ভালই হইয়াছে, কিরূপে

নীলাচলে নীলাদ্রিকে দর্শন করিব, বলিয়া দাও।" রামচন্দ্র খান তাঁহাদের আহারের আয়োজন করিয়া দেন, এবং নৌকারোহণে নীলাচলে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যথাসময়ে শ্রীচৈতন্য হরিধ্বনি করিতে করিতে সশিষ্যে নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল। আরোহীরা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাঝিরা বলিল, "কূলে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ বাস করিতেছে, জলে কুম্ভীর বাস করিতেছে, আর ডাকাইতেরা আরোহীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য জলপথে বিচরণ করিতেছে। যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যা দেশে না যাই আপনারা কীর্ত্তন করিবেন না।" মাঝিদিগের নিকট হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সকলের রসনা নীরব হইল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি হুঙ্কার রবে কীর্ত্তন করিতে বলিয়া বলিলেন, "নির্ভয়ে হরিনাম কীর্ত্তন কর, কোন ভয় নাই।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাক্যে ভক্তদিগের প্রাণ হইতে ভীতির মেঘরাশি যেন বায়ু-প্রবাহে উড়িয়া গেল। তাঁহারা আরো উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝিরা বুঝিল, পরম রূপবান্ নবীন সন্ন্যাসী নরদেহধারী হইলেও সামান্য মানব নহেন। চৈতন্য শিষ্যবৃন্দসহ উৎকল প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। মাঝিরা প্রয়াগ ঘাটে তরীসংলগ্ন করিলে, তিনি সদলে কূলে অবতরণ করিলেন। সেদিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রভাতে, সশিষ্যে পদব্রজে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা জলেশ্বর, যাজপুর প্রভৃতি স্থানসকল দর্শন করিয়া কমলপুরে আগমন করিলেন।

কমলপুর হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ধ্বজা দর্শন করা যায়। শ্রীচৈতন্য সেই ধ্বজা দর্শন করিয়া যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি যাইতে যাইতে অনুরাগভরে ভূতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। চারিদিকের লোক এই অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসীর মধ্যে ভক্তির অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা বলিতে লাগিল,

"এমন ভক্তির লক্ষণ কোন মানবে ত দেখা যায় নাই; ইনিই নারায়ণের অবতার।" যাত্রিদল আঠারো নালায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, গৌর সকলকে বলিলেন, "তোমরাই অগ্রে যাইবে, না আমি অগ্রে যাইব বল?" মুকুন্দ দত্ত বলিলেন, "তুমিই অগ্রে গমন কর।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ত্বরিত গতিতে পুরুষোত্তম যাইয়া জগন্নাথদর্শনার্থ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নীলাদ্রিনাথ-দর্শনে তাঁহার ভাবসিন্ধু আরো উথলিয়া উঠিল। তিনি জগন্নাথের মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ধাবিত হইলে পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহার গতি রোধ করিল, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইল। রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া "হাঁ হা" শব্দে পাণ্ডাদিগকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি গৌরচন্দ্রকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া সকলে মিলিত হইলেন। সার্ব্বভৌমাচার্য্য সকলেরই থাকিবার ও আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া আতিথেয়তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমাচার্য্য প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ছাত্রদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দান করিতেন। সার্ব্বভৌমাচার্য্য তাঁহার শ্যালক গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, "তুমি এই নবীন সন্ন্যাসীকে প্রাতে আমার নিকট লইয়া আসিবে, আমি তাঁহাকে বেদান্ত শিক্ষা দান করিতে ইচ্ছা করি।" পরদিন গোপীনাথ শ্রীচৈতন্যকে লইয়া আচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইলে, সার্ব্বভৌমাচার্য্য গৌরকে বলিলেন, "তোমার ন্যায় সন্ন্যাসীর

বেদান্ত পাঠ করা আবশ্যক। গৌর তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া, তাঁহার নিকট অন্যান্য ছাত্রদিগের সঙ্গে বেদান্তের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌমাচার্য্য চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই কয়েকদিন আমার উপদেশ শুনিতেছ, কিন্তু এ-বিষয়ে একটি কথাও ত আমাকে বলিলে না, তুমি আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছ কি না, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার থাকিলে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

তখন শ্রীচৈতন্য বাহ্য বিনয় পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনার বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিতেছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইয়া মন যেন বিকল হইয়া পড়িতেছে। ভাষ্যের দ্বারাই সূত্রের অর্থ প্রকাশ পায়, কিন্তু আপনার ভাষ্যে 'সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতেছে না। আপনার ব্যাখ্যায় সূত্রের প্রকৃত অর্থ যেন কল্পনা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। আপনি ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করিয়া থাকেন।" গৌরচন্দ্র যখন এইরূপে সার্ব্বভৌমকে বেদান্তের তাৎপর্য্য বিষয়ে যুক্তি সহকারে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, নবদ্বীপের নবীন সন্ন্যাসী সামান্য পুরুষ নহেন। চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ভগবানে ভক্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ; তাঁহাতেই ভক্তি অর্পণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করুন।"

এই বলিয়া চৈতন্যদেব ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥"

আত্মারাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়াও সেই অমিত-পরাক্রমশালী হরিতেই অহেতুকী ভক্তি স্থাপন করিয়া থাকেন। কারণ, সেই শ্রীহরির গুণই এইরূপ!

ভট্টাচার্য্য গৌরকেই এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কিন্তু গৌর তাহা না করিয়া, ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতেই উহার ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সার্ব্বভৌম এই শ্লোকটির ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। গৌর তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আপনি পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু উহার আর একটা দিক আছে।" এই বলিয়া তিনি ঐ শ্লোকটির অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, অথচ সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার কোন অংশই গ্রহণ করিলেন না। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন, এবং তিনি যে সাধারণ মানবের অতীত তাঁহার মনে এই প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণব-লেখকেরা বলেন, "সার্ব্বভৌম সে সময় একশত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।" গৌর তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে ভক্তির ফোয়ারা খুলিয়া গেল; তাঁহার দুনয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল; তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি প্রকৃত অনুরাগী ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় নৃত্য ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত বৈদান্তিক রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তৎপ্রদর্শিত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপদেশে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভক্তিপথাবলম্বী হইলে, নীলাচলের চারিদিকে এই বার্ত্তা বিস্তারিত হইয়া পড়িল। লোকে চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। নীলাচলের ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই নবদ্বীপের এই নূতন সন্ন্যাসীর বিদ্যা বুদ্ধি, জীবনের অনুপম সৌন্দর্য্য ও তাঁহার অসাধারণ ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে

লাগিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল —যাঁহাদের রসনা হইতে কখন ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় নাই, তাঁহাদের রসনাও এই নাম-উচ্চারণে সুধারসে সিক্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন পথে বাহির হইতেন, তখন পথের দুই পার্শ্বের লোক হরিনামের মধুর রবে যেন চারিদিকের বায়ু-মণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া তুলিত। শ্রীচৈতন্যের আগমনে নীলাচলে এক নবভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি হরিপ্রেমে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন।

নিমাই কিছুদিন নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে যাইবার বাসনা করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি একাকীই গমন করিব, তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান কর।" নিত্যানন্দ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "একাকী গমন করিলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ তোমার হস্ত নাম-জপেই সর্ব্বদা রত থাকে, তোমার করঙ্গ বহিবারও ত একজন লোক চাই?" নিত্যানন্দের কথায় নিমাই আর কিছু বলিলেন না। সার্ব্বভৌমাচার্য্য যখন নিমাইয়ের দক্ষিণাপথ ভ্রমণের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আমি বহুপুণ্যফলে তোমার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! বিধি সে সঙ্গ আমার ভাঙ্গিয়া দিলেন; আমার সন্তান যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আমি তা-ও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ তদপেক্ষা আমার পক্ষে অসহনীয়। তবে যদি তুমি নিতান্তই যাইতে চাও, তাহা হইলে আর কয়েক দিন এখানে থাক, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া জীবন শীতল করি।" শ্রীচৈতন্যের হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল; তিনি সার্ব্বভৌমের অনুরোধে কয়েক দিন নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া সার্ব্বভৌমের ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গৌরসুন্দর জগন্নাথদেবের অনুগ্রহ ও সকলের শুভপ্রার্থনা মস্তকে ধারণ করিয়া দক্ষিণদেশে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় ভট্টাচার্য্য নিমাইকে বলিলেন, "গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় নামে একজন সাধুপুরুষ আছেন, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিলেও এমন সুপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়; তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিলেন। যাত্রিদল বিশাল বারিধির উপকূল দিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। এখানে লোকে নিমাইয়ের রূপলাবণ্য, তরুণ যৌবনে কঠোর বৈরাগ্য ও ভগবানের প্রতি অলৌকিক প্রীতি দর্শনে দলে দলে আলালনাথ দেবমন্দির সমীপে উপস্থিত হইল। গৌর-হৃদয়ের ভগবৎ-প্রেম তাড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বহুজনাকীর্ণ লোকমণ্ডলীর মধ্য হইতে আকাশভেদী হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোক শ্রীচৈতন্যের পদানুসরণ করিয়া তৎপ্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিল। রজনী প্রভাতা হইলে গৌরসুন্দর দক্ষিণাপথ পর্য্যটনের জন্য আলালনাথ হইতে যাত্রা করিলেন। একটিমাত্র সহায় ব্যতীত সঙ্গীরা সকলেই আলালনাথ হইতে পুরুষোত্তমে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে গৌর যাইতে যাইতে কূর্ম্মনামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ অতি যত্নপূর্ব্বক নিমাইকে তাঁহার ভবনে লইয়া গেলেন, এবং পত্নী, পুত্র, কন্যাসহ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে এমনই এক ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিল যে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম

গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গৃহে বসিয়াই কৃষ্ণনাম জপ করিতে উপদেশ দান করেন। ঐ অঞ্চলে বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গৌর তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। কথিত আছে, তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে বাসুদেব রোগমুক্ত হয়েন, এবং তাঁহার দেহ লাবণ্যযুক্ত হইয়া উঠে। তিনি বাসুদেবকে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন কর ও সকল লোকের মধ্যে সে নাম প্রচার কর।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে কয়েক দিবস পরে গোদাবরী-তীরে উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-তীরস্থ সুরম্য বনরাজী ও নদীর নির্ম্মল জল দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বৃন্দাবনের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলসলিলা গোদাবরী যমুনা ও তাহার তীরস্থ ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষসমূহ বৃন্দাবনের বন বলিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হইল। তিনি সুরম্য স্থানে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক ব্যক্তি বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া দোলারোহণপূর্ব্বক আগমন করিতেছেন ; তাঁহার সঙ্গে বাদকেরা বাদ্য বাজাইতেছে, ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য দোলারোহণকারীকে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ইনিই রায় রামানন্দ। ইঁহারই বিষয় কি সার্ব্বভৌমাচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন? পরে দোলারোহণকারী দোলা হইতে অবতরণ করিলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল, পরস্পরের পরিচয়ে উভয়েরই হৃদয়ে যেন হরিপ্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে চৈতন্য তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া রায় রামানন্দের সহিত তত্ত্ব-কথায় কয়েক দিন যাপন করেন।

ভক্তচূড়ামণি গৌর তৎপর সিদ্ধবটনামক স্থানে গমন করেন, এবং এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ রামভক্ত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ গৌরের ভক্তিভাব দর্শন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণানুরাগী হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার রসনা হইতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। গৌর তাঁহার এই ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া অবধি, আমার মনের ভাব কেমন পরিবর্ত্তন হইল, যে, আমার জিহ্বা হইতে রামনামের পরিবর্ত্তে আপনা-আপনিই কৃষ্ণনাম বহির্গত হইতেছে।"

"বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেহ হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥"

নিমাই তৎপর ত্রিমন্দিরে গমন করেন। এখানে রামগিরিনামক একজন বৌদ্ধ অনেক শিষ্য লইয়া বাস করিতেন। নিমাই রামগিরিকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতাবলম্বী করিলে, তাঁহার শিষ্যেরাও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন। নিমাই প্রাতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্থানীয় এক জমিদার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দুইজন বারাঙ্গনা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। নারীদ্বয় গৌরের পুণ্যপ্রভা ও অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শন করিয়া সে-স্থান হইতে পলায়ন করিল। জমিদার অবশেষে গৌরের নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন; এবং অবশেষে বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পথানুসরণ করেন। গৌর নানা স্থান ভ্রমণানন্তর অবশেষে শ্রীরঙ্গধামে গমন করেন। বেঙ্কটভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ তথায় তাঁহাকে আপন ভবনে থাকিবার জন্য অনুরোধ করাতে গৌর সম্মত হইয়া চারিমাসকাল তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট নামে বেঙ্কটভট্টের এক পুত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার পরলোক-গমনের পর গোপাল শ্রীচৈতন্যের পথানুসরণ করিয়া ভক্ত-সঙ্গে ও হরিগুণ-কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তৎপর নিমাই জিজুরী নগরে গমন করেন। তথায় অনেক বারবনিতা বাস করিত। তিনি তাহাদিগের জীবন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যত্নবান্ হন। ইন্দিরা বাঈ নাম্নী এক নারী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া করজোড়ে আপনার কলঙ্কিত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বিলাপ করিতে করিতে বলিল, "প্রভো, আমাকে তোমার পদধূলি দিয়া উদ্ধার কর।" ইন্দিরা শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রভাবে উদ্ধার হইয়া যায়, এবং হরিগুণ-কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করে। গৌর চোরানন্দিবনে নারোজী নামে এক বিখ্যাত দস্যুকে উদ্ধার করেন। সে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-পথ অনুসরণ করে, এবং তাঁহার সহিত অনেক দেশ ভ্রমণানন্তর বরদা নগরে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখের দিকে তাকাইয়া হরিনাম করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করে।

নারোজীর মৃত্যুর পর চৈতন্য যোগানামক এক গণ্ডগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে বারামুখীনাম্নী এক পরমাসুন্দরী বারাঙ্গনা বাস করিত। বহু ধনীর সন্তান তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারই হস্তে আপনাদিগের জীবনকে কলঙ্কিত করিত। বারামুখী ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া অনেক দাস-দাসী লইয়া বাস করিত। শ্রীচৈতন্য তাহার ভবনের নিকট একটি বৃক্ষতলে বসিয়া বহুজন-পরিবেষ্টিত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বালাজীনামক এক দুষ্ট লোক আসিয়া চৈতন্যের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়। বালাজীর এই ব্যবহার দেখিয়া অনেকে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, গৌর সকলকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং বালাজীর নিকটে গিয়া বালাজীর কর্ণে কি এক গুপ্ত মন্ত্র ফুঁকিয়া দিলেন; নিমেষের মধ্যে বালাজীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে শ্রীচৈতন্যের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুন্দরী বারামুখী আপন ভবনের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দর্শনে অবাক্ হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে আসিয়া বলিল, "আমাকে উদ্ধার কর, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ।" শ্রীচৈতন্য, তাহাকে হরিনাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে বাস করিতে বলেন। সে-ও তৎক্ষণাৎ আপনার মস্তক মুণ্ডন করতঃ সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করিয়া হরিনাম জপে ও কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কিছুকাল দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া গৌর পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ তিনি রাজদর্শনে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "তিনি যদি আমাকে তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিব।" অবশেষে রাজা ছদ্মবেশে ব্যাকুল হইয়া, ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার অনুগত ভক্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় গৌড় দেশ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনেক শিষ্য নীলাচলে আগমন করিতেন এবং চারিমাসকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া নামসংকীর্ত্তনে ও সদালাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীচৈতন্য যখন শিষ্যবৃন্দসহ জগন্নাথের মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন কীর্ত্তনের মধুর রবে উৎকলবাসীরা আর গৃহে থাকিতে পারিল না। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। গৌড়ীয় ভক্তদিগের দর্শন নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ-মানসে কেবল যে জনসাধারণেই

ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিল, তাহা নহে; রাজা প্রতাপরুদ্রও আপনার পারিষদ্‌বর্গসহ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ভক্তদিগের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পুরুষোত্তমে অবস্থানের পর নিমাই বৃন্দাবন-গমনের বাসনা শিষ্যদিগকে অবগত করিয়া বলিলেন, "আমি এবার কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকীই বনপথে যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি।" তাঁহারা সকলেই তাঁহার একাকী বৃন্দাবন-যাত্রার পক্ষপাতী না হওয়ায়, বলভদ্রনামক এক ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের সাথী হইয়াছিলেন। তিনি বলভদ্রের সহিত নানা পল্লবাবৃত বৃক্ষলতাদিপূর্ণ বিহগকূজিত বনস্থলীর ভিতর দিয়া আনন্দিত মনে গমন করিতে লাগিলেন। গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তিনি কত দেশ ও কত পল্লী দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীধামে কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। এখানে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বেদান্তধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার বিচার হইয়াছিল। বিচারে শ্রীচৈতন্যই জয়লাভ করেন, এবং প্রকাশানন্দ অদ্বৈত মত পরিত্যাগ করতঃ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। এখানে শ্রীচৈতন্য সুবুদ্ধি রায়কে হরিনাম গ্রহণ করিতে বলিয়া তাঁহার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন। গৌড়ের অধিপতি সুবুদ্ধি রায়ের কোন ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা 'বিষপান' তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন। সুবুদ্ধি রায় ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধানে প্রস্তুত না হইয়া কাশীতে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলেন, "তুমি হরিনাম কর, তাহা হইলে তোমার সকল দোষ কাটিয়া যাইবে।" সুবুদ্ধি রায় এই বিধানই প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং হরিগুণ-কীর্ত্তনে অবশিষ্ট জীবন বারাণসীধামেই যাপন করেন।

গৌর অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। এখানে আগমন করিয়া তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

এখানে বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার পথ আশ্রয় করিয়াছিল। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আগমনে বৃন্দাবন যেন নবতর আকার ধারণ করিল ও বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনর্জ্জীবিত হইল।

বৃন্দাবন-বিহারের পর শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ন্যাস অবধি ছয় বৎসরকাল নানা স্থান পরিভ্রমণে অতিবাহিত হইল। এখন হইতে অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ তিনি নীলাদ্রিতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই অষ্টাদশবর্ষ গৌড় দেশ হইতে রথযাত্রার সময় প্রতিবৎসর তাঁহার বহু-সংখ্যক ভক্ত মিলিত হইতেন এবং প্রভুর সঙ্গে চারিমাস কাল অবস্থিতি করিতেন। অনেকে নীলাচলে বাস করিয়া, তাঁহার নিত্যসঙ্গলাভে ও তাঁহার কথামৃত-পানে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহারই অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার সেবায় আনন্দ লাভ করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গলাভে পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইল বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে অনেক ধনী, জ্ঞানী, তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তির পথ অনুসরণ করতঃ আপনাদিগের জীবনকে মধুময় করিয়া গিয়াছেন। নীলাচলে বাস করিতে করিতে গৌরের ভক্তির ভাব ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, কৃষ্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাস ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি বারিধি-বক্ষে ঝম্প প্রদান করেন। ধীবরেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। গৌর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি এ অবস্থায় একাকী নির্জ্জনে থাকিয়া, তাঁহার হৃদয়নাথের সহবাস-সুখ-লাভের জন্য অত্যন্ত প্রয়াসী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শিষ্য আজন্ম সাধু ও চিরকুমার গদাধর যমেশ্বরটোলার সাগরতীরবর্ত্তী এক মনোহর উদ্যানে বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্য অনেক সময় সে-স্থলে গমন করিয়া নামকীর্ত্তন ও গদাধরের ভাগবত-পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার আদেশে

গদাধর উদ্যান মধ্যে গোপীনাথের একটি মন্দির প্রস্তুত করেন। কথিত আছে, প্রভু একদিন গোপীনাথের গৃহে প্রবেশ করিলেন; তখন গদাধর বৃক্ষতলে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না দেখিয়া গদাধরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া, প্রভুর লীলা সম্বরণ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। গৌর-অদর্শনে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল; এবং তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন।

বৈষ্ণবেরা বলেন, "গোপীনাথের দেহের সঙ্গে প্রভু আপনার দেহ মিশাইয়া দিয়া মর্ত্ত্যলীলা সমাপ্ত করিয়াছেন।" ১৪৫৫ শকের মাঘ মাসে পূর্ণিমা' তিথিতে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাবের দিন নির্ণীত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের সহিত নিত্যানন্দের নাম এমনই ভাবে জড়িত যে, উভয়কে একাত্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "গৌর-নিতাই" এক সঙ্গেই অনেকের রসনা হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচাকানামক গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। একচাকা গ্রাম এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। নিত্যানন্দের পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওঝা ইঁহাদের উপাধি মাত্র। লোকে হাড়াই ওঝাকে হাড়াই পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। ওঝা-পরিবার সততা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য গ্রামের সকলের নিকট বিদিত ছিল।

গ্রামের কিয়দ্দূরে মৌড়েশ্বর নামে এক দেবতা ছিলেন। হাড়াই প্রতিদিন তথায় গমন করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত দেবতার অর্চ্চনাদি করিতেন। হাড়াই ও পদ্মাবতী উভয়েই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ওঝা-পরিবারের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পৌরোহিত্যের কার্য্য করিতেন। হাড়াইও সেই কার্য্য করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু সংসারে তাঁহাদের কোন বিষয়ে অপ্রতুল না থাকিলেও তাঁহাদের মনে কোন সুখ ছিল না। তাঁহাদের কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই অল্পকালের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করে। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেলে একদিন পদ্মাবতী স্বপ্নে দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি চিন্তা করিও না। তোমার গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পাপীর উদ্ধারসাধন ও নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন।"

এই স্বপ্ন-দৃষ্টে ধর্ম্ম-পরায়ণা পদ্মাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তাঁহার পতিকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। নরনারীর কল্যাণসাধনের জন্য সন্তানরূপে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, এই চিন্তায় পতি-পত্নীর প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পদ্মাবতী গর্ভবতী হইলেন, এবং ১৩৯৫শকে মাঘ মাসে শুক্ল তিথিতে হাড়াই পণ্ডিতের ঘর আলো করিয়া এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন। মাতাপিতার মনে আনন্দের ত কথাই নাই, প্রতিবেশীরা নবজাত শিশুর শরীরের গঠন ও রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া রহিল। এই সুন্দর শিশু সকলের শুভ কামনার মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে হাড়াই পণ্ডিত শিশুর 'হাতেখড়ি' দিলেন। এই উপলক্ষে শিশুর নাম হইল নিত্যানন্দ। বালক নিত্যানন্দের শিক্ষা আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি দর্শনে সকলে অবাক্ হইয়া থাকিত। নিত্যানন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন।

বালক নিত্যানন্দ অপরাপর বালকের সহিত ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু ক্রীড়ার মধ্যেও যে-সময় তরলমতি বালকেরা হাস্য ও আমোদ করিয়া বেড়ায়, অনেক সময়ে ক্রীড়াতে রত থাকে, সে-সময়ে হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র গাম্ভীর্য্য ভাব ধারণ করিলেন। ভবিষ্যতের কি যেন এক মহান্ ছবি তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে তাহারই চিন্তনে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিত। নিতাইয়ের পিতা পুত্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার মুখ ক্ষণকাল না দেখিলে তাঁহাদিগের মন অস্থির হইয়া পড়ে, সেই পুত্র যদি এই ভাবের স্রোতে পড়িয়া সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাহইলে তাঁহারা কিরূপে প্রাণধারণ করিবেন এই চিন্তাতেই তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল। বাল্যকালেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। শৈশবেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় জীবনের আভাস তাঁহার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি বালকদিগের সহিত সেই-লীলার অভিনয় করিতেন।

যথাসময়ে হাড়াই পণ্ডিত সন্তানের উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। এই উপলক্ষে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইল। শুভানুষ্ঠান সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হাড়াই পণ্ডিত সন্তানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিতাই ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া শিক্ষকের মনে আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রতিভার সম্মান সকলেই করিয়া থাকে। চতুষ্পাঠী হইতে নিত্যানন্দ প্রতিভার গুণে 'তর্কচঞ্চু' উপাধি লাভ করিলেন। পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আলোকচ্ছটার ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু পাণ্ডিত্যলাভই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে আর একটি ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেটি সংসারের প্রতি উদাসীনতা। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, যে-সময়ে হৃদয়ের মধ্যে সংসারের সুখ-লালসার উন্মেষ হইতে থাকে সে-সময়ে তাঁহার হৃদয়ে সংসারের প্রতি বীতরাগের সঞ্চার হইতে লাগিল। মহাপুরুষদিগের চিরবাঞ্ছিত নির্জ্জনতা উপভোগ করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে জনকোলাহলশূন্য স্থানে উপবেশন করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে এক ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন এক সন্ন্যাসী হাড়াই ওঝার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। হাড়াই ওঝা অতি সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন বাটীতে স্থান দান করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার

ভগবন্নিষ্ঠারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। হাড়াই পণ্ডিত ভক্ত ও প্রেমিক লোক, আগন্তুক তাঁহার ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গে সমস্ত রজনী যাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে উভয়েই পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর নয়ন-পথে পতিত হইলে, তিনি তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। বালক নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনে এক আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, এই বালককে সঙ্গের সাথী করিতে পারিলে তাঁহারও প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইবে, এবং বালকেরও প্রভূত কল্যাণ হইবে। সন্ন্যাসী বুঝিয়াছিলেন, ওঝার এই পুত্র সামান্য বালক নহেন—ইনি কোন মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য এ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী আর মনের বাসনা গোপন রাখিতে পারিলেন না। গৃহস্বামীকে মনের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শ্রবণে তাঁহার মস্তকের উপর যেন অশনি নিপতিত হইল। যে পুত্রকে নিমেষমাত্র না দেখিলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, সেই পুত্রকে বিদায় দিয়া তাঁহারা কিরূপে সংসারে জীবনধারণ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণ যেন এক দুর্ব্বিষহ ভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

ওঝার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সন্ন্যাসী দেবতার ন্যায়; তিনি দাতাকর্ণ প্রভৃতির কথা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও তিনি নিজ পত্নীর নিকট নবাগত সন্ন্যাসীর এই অভূতপূর্ব্ব প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। পদ্মাবতীও ধার্ম্মিকা নারী, তিনিও স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর কি বলিব, তোমার ইচ্ছার উপরেই আমার সমস্ত মতামত নির্ভর করিতেছে—সন্ন্যাসীর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিলে, আমাদের অমঙ্গল হইবে, তুমি যাহা ভাল

মনে কর তাহাই কর।" পত্নীর মতামত শ্রবণ করিয়া হাড়াই ওঝা পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন, এবং তাঁহাদের নয়নমণি ভালবাসার ধন পুত্রের হস্ত ধরিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল; তিনি নিতাইকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

পুত্রকে বিদায় দিয়া হাড়াই ওঝা ও তদীয় পত্নীর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা বিষাদে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সন্তান-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রায় তিন মাস কাল অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন। ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ের জ্বালা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু তাহা একেবারে নিবারিত হইল না। যখনই পুত্রের প্রেমানল তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইত, তখনই সে জ্বালা তাঁহাদের হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

এদিকে নিতাইকে লইয়া সন্ন্যাসী দেশ-দেশান্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ভারতের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থলই দর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে যখন তিনি গমন করেন, তখন স্বাভাবিক রূপেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ভাবরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে;—

"শ্রীবৃন্দাবন আদি দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া।"

হস্তিনানগরে যাইয়া পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বকীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যানগরে গমন করিয়া তাঁহার ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তৎপর যে যে বনে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের সময় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল অরণ্যানীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় ভাবাবেশে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে নানা তীর্থ

বন, উপবন, পর্ব্বত, নদী ও সাগর দর্শন করিয়া মনের আনন্দে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর নিজ অন্তরে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইতে লাগিলেন।

"নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁন্দে কে বুঝিবে রস॥"

ভক্তের সঙ্গে ভক্তের প্রাণের আকর্ষণ আছে। নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে বৈষ্ণবাচার্য্য পরম ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ পাইলেন। মাধবেন্দ্র পুরী তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া লইলেন এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া নিতাইকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। সাগরের দুইটি ঢেউ যেমন দুই দিক হইতে আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, উভয় হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ তেমনি সে আঘাত-প্রতিঘাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উভয়েই ভাবাবেশে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরী ও অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাদিগের তদবস্থা দর্শন করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন।

"এই মত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমে বন।
দৈবে মাধবেন্দ্র সনে হৈল দরশন॥
* * *
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধব পুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া আপনা পাসরি।
* * *
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন, দোঁহা দরশনে।
কাঁন্দয়ে ঈশ্বরী পুরী আদি শিষ্যগণে॥"

অবশেষে উভয়ের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, তাঁহারা অরণ্যের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। উভয়েই ভাবে গদগদ, উভয়ের হৃদয় হইতেই প্রেমধারা বহির্গত হইতে লাগিল; উভয়েরই অঙ্গে কম্প পুলক প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে নিত্যানন্দ গোঁসাইকে

বলিলেন, "প্রভো, আজ আপনার দর্শনে তীর্থ-যাত্রার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইলাম।"

"নিত্যানন্দ বোলে যত তীর্থ করিলাও।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইঁলাও॥"

মাধবেন্দ্র পুরীও নিত্যানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিতাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া, মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আর তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

"মাধবেন্দ্র পুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফূরে রুদ্ধ-কণ্ঠ প্রেমজলে॥"

এইরূপে তাঁহারা কিছুকাল বনে বনে ভ্রমনানন্তর কৃষ্ণপ্রসঙ্গে দিনযামিনী অতিবাহিত করিলেন। তৎপর নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ, আর মাধবেন্দ্র সরযূ দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। নিতানন্দ সেতুবন্ধ দর্শনানন্তর ধনুতীর্থ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া নীলাচলে আগমন করিলেন এবং দূর হইতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"আইলেন নীলাচলের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে॥"

নীলাচলে বাস করিয়া সাগরজলে স্নান ও জগন্নাথ দর্শনে কিছুকাল আনন্দিত মনে ক্ষেপণ করিয়া, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার ভক্তির ভাব আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অনুরাগভরে অনেক সময় আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, নাম-কীর্ত্তন ও নাম-ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অযাচিত

রূপে কেহ যদি কখন কিছু দেন তবেই আহার করেন, নতুবা অনশনেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে :—

"নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি,
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি।
আহার নাহিক—কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥"

সাধুদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া যায়। নিত্যানন্দ যেন মানসচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র নাম-সংকীর্ত্তনের প্রেম-তরঙ্গে সকলকে ভাসাইতেছেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার প্রাণ সেই দিকে ধাবিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৌরের দর্শন-মানসে নিতাই নবদ্বীপধামে যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, এই আনন্দে তাঁহার প্রাণ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কখন হাস্য ও কখন ক্রন্দন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবের আবেগে তাঁহার মনপ্রাণ টলমল করিতেছে। অবশেষে তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় নন্দন আচার্য্যের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। নিতাইয়ের অবধূত বেশ, দীর্ঘ ও সতেজ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, পদ্মের ন্যায় চক্ষু ও উজ্জ্বল বর্ণ দর্শন করিয়া নন্দন আচার্য্যের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হইল। তিনি অতি আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে আপন আলয়ে আশ্রয় দান করিলেন।

নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনের চারিদিবস পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র তাঁহার

শিষ্যবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, ভাইসকল, আর দুই তিন দিন পরে কোন মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিবেন।

"আরে ভাই! দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥"

যেদিন নিতাইচাঁদ নবদ্বীপে পৌঁছিলেন, সেদিন প্রাতঃকালে গৌরের শিষ্যবৃন্দ সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, "দেখ গত রাত্রিতে আমি এক সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি। তালধ্বজ রথে এক মহাপুরুষ আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, হলধর মূর্ত্তি, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে পীতবস্ত্র। এই বিচিত্র মনোহর পুরুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী?' এইরূপ দশ বার বার জিজ্ঞাসা করাতে, আমি এই অবধূতের রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কোন্ মহাপুরুষ?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ভাই, কাল্ তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।' তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে আমার প্রাণ উথলিয়া উঠিল।"

শিষ্যবৃন্দের সম্মুখে গৌর আপনার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; এবং "মদ আন মদ আন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, "গোঁসাই তুমি যে-মদ চাহিতেছ সে-মদ ত তোমারই নিকট আছে; তুমি যাহাকে তাহা বিতরণ কর, সে তাহা প্রাপ্ত হয়।"

"শ্রীবাস পণ্ডিত বোলে, 'শুনহ গোসাঞি!
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি॥
তুমি যারে বিলাও, সেই তারে পায়।'"

গৌরের এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে।" কিছুক্ষণ পরে গৌর চেতনা লাভ করিয়া বলিলেন, "আজ নবদ্বীপে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ আগমন করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার

অনুসন্ধান কর। শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, কিন্তু অধিক বেলা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তাঁহার কোনই সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন গৌর বলিলেন, "চল, আমরা সকলে যাই, তিনি নন্দন আচার্য্যের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন।" প্রভুর বাক্যে সকলে উল্লসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিতে করিতে তাঁহার সহিত নন্দনাচার্য্যের ভবনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

"ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষৎ হাসিয়া।
'আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া॥'
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্বভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ বলি' সভে করিলা গমন॥
সভা লই প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
জানিঞা উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে॥"

তাঁহারা নন্দন আচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া দেখেন, এক দিব্য কান্তিযুক্ত পুরুষ ঘর আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি ও মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৌরসুন্দর অবধূত নিত্যানন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। নিতাই বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন, এক দিব্য লাবণ্যযুক্ত পুরুষ,—কাঁচা সোনার ন্যায় বর্ণ—বদনমণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। গলায় সুগন্ধি পুষ্পের মালা—প্রশস্ত ললাটে চন্দনের তিলক—দেহের উপর শুভ্র সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র লম্বিত রহিয়াছে। নিতাই আবার ভাল করিয়া পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকাইলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। কোন কথা নাই; যেন দুই ভ্রাতার ভবিষ্যতের কার্য্য নীরবে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। আর সকলেই নীরবে দুই প্রধান্ ভক্তের নীরবতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর মুখ চায়॥"

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, গৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। পণ্ডিত দশম অধ্যায়ের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরবর্হরচিত চূড়া, শ্রুতি-যুগলে কর্ণিকার পুষ্প, কনকতুল্য কপিশ বা নীলপীত মিশ্রিতবর্ণের বসন এবং পঞ্চবর্ণপুষ্পে গ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া নটবরের ন্যায় স্বীয় অঙ্গ নিরন্তর নূতন নূতন শোভার আবির্ভাবে সমৃদ্ধি করিতে করিতে আর অধরামৃতে বেণুর রন্ধ্র সকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে—যে-স্থানে তদীয় অসাধারণ পদচিহ্ন-সমূহ সকলেরই নিরতিশয় রতি বা আনন্দ সম্পাদন করিতেছে—সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। এদিকে গোপবৃন্দ তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের এই রসযুক্ত শ্লোকটি পাঠ করিবা মাত্র নিতাই ভাবে অচেতন হইয়া পড়িলেন। গৌর বলিলেন, "শ্রীবাস, আবার ঐ শ্লোক পাঠ কর।" শ্রীবাসও উৎসাহের সহিত পুনঃপুনঃ ঐ মধুর শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

"আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
পঢ় পঢ় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥"

কিছুক্ষণ পরে নিতাই চেতনা লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কখন নৃত্য করিতে লাগিলেন; আবার কখন-বা ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এই ভাবোন্মত্ত অবস্থার মধ্যে আবার প্রেমপূর্ণ বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন নদীবক্ষে বাতাহত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাঁহার ভাবতরঙ্গ আরো উচ্ছ্বসিত

হইয়া তাঁহাকে যেন ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি হুঙ্কার রবে চীৎকার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবৎপ্রেমে মানুষ কিরূপ উন্মত্ত-প্রায় হইতে পারে, বৈষ্ণববৃন্দ তাহা দর্শন করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই প্রশমিত হয় না দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়েরই চক্ষু হইতে প্রেমধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাই বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন ঃ—

"ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে হেন রাম-কোলে॥
প্রেম-ভক্তিবাণে মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কাঁদে গৌরচন্দ্র॥"

নন্দন আচার্য্যের গৃহে যেন প্রেমের হাট বসিয়া গেল। তথায় ভগবৎ-প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। রামায়ণবর্ণিত রামলক্ষ্মণের প্রেমের ছবি যেন গৌর-নিতাইয়ের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশে যে ভক্তি-গঙ্গা ও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইবে তাহারই সূচনা আরম্ভ হইল।

ভক্ত ভক্তকেই চেনে; ভক্ত ভক্তকেই ভক্তি করিতে পারে! গৌর নিত্যানন্দকে বলিলেন, "প্রভো, তোমাতে ভক্তির চারি লক্ষণ দর্শন করিলাম। দেখিলাম কম্প, অশ্রু, গর্জ্জন, হুঙ্কার; এই ত ভক্তির লক্ষণ; এই ত বেদের সার। তুমি ত আর মানব নও—তুমি সাক্ষাৎ দেবতারূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার দর্শনে আজ আমার প্রাণে সেই শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। মহাভাগবতের চরণ-দর্শনে আজ আমার জীবন ধন্য হইল!" তিনি এইরূপে ক্ষণকাল আবিষ্টচিত্তে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে নিত্যানন্দের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

"মহাভাগ্য দেখিলাও তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সেই পায় কৃষ্ণধন॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরসুন্দর।
নিত্যানন্দ স্তুতি করে, নাহি অবসর॥"

গৌরচন্দ্র তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, কোথা হইতে এখানে শুভাগমন হইল, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" নিতাই বালকের ন্যায় সরল। তিনি বলিলেন, "গোঁসাই, বাল্যজীবন হইতে ভারতের অনেক তীর্থ দেখিলাম—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে বাস করিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনবিহারীকে দেখিতে পাইলাম না! তাই সকলকে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কোথা পাইব তোমরা কি বলিতে পার?' আমার কথার সদুত্তর প্রথমে পাই নাই; পরে শুনিতে পাইলাম, নবদ্বীপে আমার লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর হরিনাম-সংকীর্ত্তনে লোককে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছেন। আর থাকিতে পারিলাম না। তাই তোমাকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবন হইতে ছুটিয়া আসিলাম।" বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন ঃ—

"নিত্যানন্দ বোলে তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঁই॥
তারা বোলে—কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড় দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কথোক দিবসে॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরি-সংকীর্ত্তন।
কেহো বোলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী তথায়॥"

নিতাই অতি বিনতীভাবে তাঁহার নবদ্বীপ-আগমনের কারণ সকলই বলিলেন। বলিতে বলিতে আনন্দের অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, শরীর মন পুলকে পূর্ণ হইতে লাগিল! ভগবদ্‌ভক্ত না হইলে কি মানুষ এত বিনয়ী হইতে পারে?

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের কথা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার আগমনে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইয়াছি।" তাঁহাদের

দুইজনের এইরূপ কথোপকথনে ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই অবাক্ হইয়া পরস্পর তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। মুরারি গুপ্ত হাসিয়া গৌর ও নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ভাব আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।" শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, "আমরা কি বুঝিব, যেন মাধব ও শঙ্কর পরস্পরের অর্চ্চনা করিতেছেন।" গদাধর পণ্ডিত বলিলেন, "যেন রাম ও লক্ষ্মণ মিলিত হইলেন।" কেহ বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম," কেহ বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মিলিত হইয়াছেন।" এইরূপে যাঁহার যেরূপ মনে আসিতে লাগিল, তিনি সেই ভাবেই আপনার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শুভক্ষণে গৌর-নিত্যানন্দের মিলন হইল; বঙ্গদেশে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইবার সূত্রপাত হইল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতেই নিত্যানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

একদিন গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আগামী কল্য পূর্ণিমা—ব্যাস-পূজার দিন। পূজা কোথায় হইবে?" নিত্যানন্দ গৌরের হাত ধরিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, এই বামনার ঘরেই ব্যাস-পূজা হইবে।

হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর !
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনের ঘর ॥"

গৌর হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমারই উপরে সব বোঝা পড়িল।" শ্রীবাস বলিলেন, "এ আর ভার কি? পূজার সকল উপকরণই বাড়ীতে আছে। কেবল পুঁথিখানা চাহিয়া আনিতে হইবে—এই মাত্র।" শ্রীবাসের বাক্য শুনিয়া বৈষ্ণবেরা উচ্চ রবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গৌর বলিলেন, "চল, আমরা সকলে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী যাই।" প্রভুর ইচ্ছায় সকলে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহারা শ্রীবাসের বাটীতে প্রবেশ করিলে বাটীর দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। গৌরচন্দ্রের আজ্ঞায়

ভক্তগণ মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ গৌর-নিতাইকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের রবে চারিদিক যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৌর ও নিত্যানন্দ নৃত্য করিতে করিতে কখন উভয়ে কোলাকুলি করিতে লাগিলেন, কখন কেহ কাহারও চরণ স্পর্শ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আর গৌর 'বোল' 'বোল' বলিয়া হুঙ্কাররবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"এই মত নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত।"

এইরূপে সংকীর্ত্তনের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দের ভাব-তরঙ্গ আরো উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যেন ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল ; তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য অধীর অস্থির চঞ্চল। কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন বা গড়াগড়ি যাইতেছেন। ভাবাবেগে কটিদেশ হইতে বস্ত্র খসিয়া পড়িতেছে। দণ্ড কমণ্ডলু গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। ভক্ত যে সরল বালকের ন্যায় হইতে পারে নিতাই তাহা নিজ জীবনে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
কোথা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল নাহি আদি মূল॥"

নিতাই সুন্দর বড় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখা যায় না। তখন গৌরসুন্দর অধীর নিত্যানন্দকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "নিতাই, স্থির হও, কাল যে ব্যাসদেবের পূজার দিন। গৌরের কোমল করস্পর্শে তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব প্রশমিত হইল, নিতাই স্থির হইলেন। শ্রীবাসের বাটীতে যেন একটি ক্ষুদ্র উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল।

গৌর ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। নিতাই শ্রীবাসের বাটীতেই রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভক্তদিগের কার্য্য অনেক সময় বুঝা যায় না। সেদিন নিত্যানন্দ রজনীতে শ্রীবাসের ভবনে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে কি এক ভাবের উদয় হইল, তিনি হুঙ্কার করিয়া আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিত উঠিয়া দেখেন, নিত্যানন্দের দণ্ডকমণ্ডলু ভগ্নাবস্থায় বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বিস্মিত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতার নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া, আসিয়া দেখেন, নিতাই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া কখন হাসিতেছেন ও কখন নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাস এই ব্যাপার দেখিয়া গৌরকে জানাইলেন। গৌর আসিয়া বলিলেন, "এ কি, দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়াছ কেন?" নিতাইয়ের কোন উত্তর নাই, তিনি আপনার ভাবে বিভোর। গৌর তখন তাঁহার ভগ্ন দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "চল, আমরা গঙ্গাস্নানে যাই—আসিয়া আবার ব্যাসপূজা করিতে হইবে।" নিতাই, গৌর ও অন্যান্য বৈষ্ণবেরা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গায় স্নানার্থ গমন করিলেন। গৌর নিতাইয়ের ভাঙ্গা দণ্ডকমণ্ডলু গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন। নিতাই খুব সন্তরণে পটু, তাহাতে আবার বালকস্বভাব। তিনি জলে নামিয়া, নানা রকমে চারিদিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেবল সন্তরণ করিয়া নিরস্ত থাকিলেন না; কুম্ভীর দেখিয়া, তাহা ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গদাধর প্রভৃতি চীৎকার করিয়া, তাঁহাকে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। নিতাই কাহারও বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া আপন মনে ধাবিত হইলেন। তখন গৌর বলিলেন, "শ্রীপাদ! শীঘ্র জল

হইতে উঠ! ব্যাসপূজার যে সময় হইয়াছে।" সে বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নিতাই তীরে উঠিলেন। ব্যাসপূজার জন্য সকলে শ্রীবাস-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাস পূজার আয়োজনে প্রস্তুত হইলেন—ভক্তগণ মৃদু ও মধুর রবে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভবন॥"

শ্রীবাস পণ্ডিত নিজেই ব্যাসপূজার আচার্য্য। তিনি যথাবিধি ব্যাসদেবের পূজা করিয়া একগাছি সুন্দর গন্ধযুক্ত মালা লইয়া নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! এই মালাগাছটি লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্যাসদেবকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি স্বহস্তে মালা দান করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।" তিনি মালাগাছটি শ্রীবাসের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন, আর আপনাআপনি কি বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না।

"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচনে পড়িয়া ব্যাসদেব নমস্কর॥
শাস্ত্র বিধি আছে. মালা আপনে যে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হইলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥"
* * * *
কিবা বোলে ধীরে ধীরে বুঝান না যায়।
মালা হাথে করি পুন চারিদিকে চায়॥"

শ্রীবাস যখন দেখিলেন, তাঁহার অনুরোধ ব্যর্থ হইল, তখন তিনি গৌরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, নিমাই, শ্রীপাদ মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ব্যাসকে দিতেছেন না, তুমি একবার এদিকে এস।" গৌর শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?

পণ্ডিতের কথা শুন, এই সুন্দর মালা ছড়াটি ব্যাসকে দিয়া নমস্কার কর।” নিত্যানন্দ আর কিছু না বলিয়া হস্তস্থিত মালাগাছটি ব্যাসকে না দিয়া তিনি গৌরসুন্দরের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। গৌরসুন্দরের চাঁচর কেশোপরি মালা বেষ্টিত হইয়া তাঁহার বদনমণ্ডলের শোভা যেন আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

> “প্রভু বোলে ‘নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
> মালা দিয়া ঝাট কর ব্যাসের পূজন॥’
> দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
> মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর॥”

বৈষ্ণব-লেখকেরা বলেন, ‘এ-সময় গৌর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল ও মুষল লইয়া, ষড়্ভুজধারী হইয়া নিত্যানন্দের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। নিতাই গৌরের সেরূপ দর্শনে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।’ নিত্যানন্দের প্রাণ-বায়ু বুঝি বহির্গত হইল, এই মনে আশঙ্কা করিয়া, সকলে “হে কৃষ্ণ রক্ষা কর” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে মূর্চ্ছা কিছুতেই অপনোদন হইতেছে না দেখিয়া, গৌর তাঁহার সুকোমল হস্ত নিত্যানন্দের গাত্রে রাখিয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ উঠ! চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তদিগের হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ কর। যে নামপ্রচারের জন্য এ সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা ত পূর্ণ হইল, এখন উঠ, তুমি মধুর হরিনাম বিতরণ না করিলে আর তাহা কে করিবে? তোমার প্রতি যাহার বিন্দুমাত্র দ্বেষ থাকে, সে আমার কখন প্রিয় হইতে পারে না।”

> “উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত্ত।
> সংকীর্ত্তন শুন যে তোমার সমীহিত॥
> যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
> সে তোমার সিদ্ধ হইল, কিবা চাহ আর॥
> * * * *
> তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
> ভজিলেই সে আমার প্রিয় কভু নহে।”

গৌরের বাক্যে নিত্যানন্দ চেতনা লাভ করিলেন। গৌর বলিলেন, "ব্যাসপূজা সাঙ্গ হল, তোমরা সকলে কীর্ত্তন কর।" গৌরের আজ্ঞা পাইয়া ভক্তগণ মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শচীদেবী নিভৃত স্থল হইতে গৌর ও নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। যেন তাঁহার দুইটি পুত্র আনন্দে নৃত্য করিতেছে, এই তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

"চৈতন্যের মাতা জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে।
দুই মোর পুত্র হেন বাসে মনে॥"

সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময় হইল। গৌর কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলিলেন। কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া সকলে উপবেশন করিলে, গৌর ব্যাস-পূজার দ্রব্যাদি শ্রীবাসকে আনিতে বলিলেন। শ্রীবাস উহা আনিলে, গৌর সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন। সকলে পরমানন্দে তাহা ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার পত্নী মালিনী দেবী তাঁহাকে আপনার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং মালিনী দেবী আপনার শিশুপুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়াদিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিতাই গৌরচন্দ্রের বাড়ীতেও অনেক সময় গমন করিতেন। শচীদেবী তাঁহাকে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের ন্যায় স্নেহ করিতেন। নিতাইও তাঁহাকে মাতৃস্থানীয়া জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু নিতাই বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন। একদিন বিবস্ত্র হইয়া গৌরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৌর তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বসিয়া কথোপকথন

করিতেছিলেন, নিতাইকে এ অবস্থায় দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন। গৌর তাড়াতাড়ি আপনার মস্তকের বস্ত্রখানি তাঁহাকে পরিতে দিলেন। নিতাইয়ের চক্ষু হইতে তখন দরদরধারে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে; রসনা হইতে মধুর কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইতেছে। তিনি সত্যই তখন ভক্তির আবেগে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

গৌর ভক্তের শিরোমণি; প্রবল ভক্তির আবেগে মানুষ যে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাহা তিনি জানিতেন। এইজন্য তিনি নিত্যানন্দকে সমাদর করিতেন। তিনি সেদিন নিতাইয়ের গলে পুষ্পের মালা পরাইয়া, স্বহস্তে তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া সেই বারি সকলকে পান করিতে বলিলেন। সমবেত বৈষ্ণবেরা অতি আগ্রহের সহিত সে বারি পান করিয়া, কেহ বলিলেন, "আজ জীবন ধন্য হইল," কেহ বলিলেন, "আজ সকল পাপ খণ্ডিত হইল," কেহ বলিলেন, "আজ হইতে যথার্থ কৃষ্ণের দাস হইলাম;" কেহ বা বলিলেন, "অদ্যকার দিন ধন্য হইল।" কেহ বলিলেন, "এমন মিষ্ট পাদোদক পান করিলাম যে তাহার মিষ্টতা এখনও মুখে লাগিয়া রহিয়াছে।" তৎপর গৌরচন্দ্র নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! তোমার কৌপীন-খানি আমাকে দাও।" নিতাই গৌরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলে, তিনি সেই কৌপীন ছিন্ন করিয়া, বৈষ্ণবদিগকে এক একখণ্ড প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইহা সকলে মাথায় বাঁধ এবং গৃহে গিয়া উহা সযত্নে রক্ষা করিবে এবং উহা উৎকৃষ্ট সমাগ্রী বলিয়া মনে করিবে—তোমাদের কৃষ্ণ-প্রেম বাড়িয়া যাইবে।" প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে ছিন্ন কৌপীনখণ্ড আপনাপন মস্তকে বন্ধন করিলেন।

"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥"

নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিয়া, এবং তাঁহার ছিন্ন কৌপীন শিরে ধারণ করিয়া, বৈষ্ণবদিগের প্রাণে যেন ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কৃষ্ণপ্রেমে

তাঁহাদিগের প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল—তাঁহারা গৌর-নিতাইকে বেষ্টন করিয়া মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌরের আদেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাস নগরের দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইতেন। একদিন তাঁহারা নগরের পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দুইজন লোক পথের ধারে সুরাপান করিয়া পরস্পর মারামারি করিতেছে; নিতাই পথিকদিগকে তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, "উহাদের নাম জগাই ও মাধাই, উহারা উচ্চবংশ-জাত, ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা উহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না—উহাদের ভয়ে সকলে সশঙ্কিত।" জগাই-মাধাইয়ের অবস্থা শুনিয়া নিত্যানন্দের মন গলিয়া গেল, তিনি হরিদাসকে বলিলেন, "দেখ হরিদাস, হরিনামে যদি এদের উদ্ধার না হয়, তাহা হইলে নামের শক্তি কিরূপে বুঝা যাইবে? আর গৌরচন্দ্র যে পতিতের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সাক্ষ্যই বা কে প্রদান করিবে?"

এই বলিয়া, তাঁহারা সেই দুরন্ত দুই ভাইয়ের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥"

এই কথা শুনিবামাত্র "তোরা কে রে" বলিয়া উদ্ধতপ্রকৃতি জগাই-মাধাই চক্ষু লালবর্ণ করিয়া নিতাই ও হরিদাসকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। তাঁহারাও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও

"মার-মার" করিয়া ভক্তদ্বয়ের পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল। অবশেষে নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৌরের বাড়ী পৌঁছিলে, দুরন্ত ভ্রাতৃদ্বয় বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল।

গৌর ভক্তবৃন্দপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে নিত্যানন্দ ও হরিদাস উপস্থিত হইয়া, জগাই ও মাধাইয়ের চরিত্র বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "প্রভো! তোমারই আজ্ঞাতে আমরা দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ঘোষণা করিয়া থাকি, কিন্তু আজ দুরন্ত, সুরাপায়ী, দুষ্ক্রিয়াসক্ত দুই ভাইকে কৃষ্ণনাম শুনাইতে গিয়া, আমাদের জীবন রক্ষা করা ভার হইয়াছিল। তাহারা এই বাড়ী পর্য্যন্ত আমাদের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিল।" গৌর তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্যত হইলে, নিতাই বলিলেন, "হরিনামের দ্বারা যদি উহাদের উদ্ধার করিতে না পার, তাহা হইলে, নামের শক্তি লোকে কিরূপে বুঝিবে, আর তোমার পতিত উদ্ধারের শক্তির পরিচয়ই বা লোকে কিরূপে পাইবে?" তখন গৌর হাসিয়া বলিলেন, "নিতাই, যাহাদের কল্যাণের জন্য তুমি এত চিন্তা করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন। তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।" সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী গৌরের আশা-পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

হরিনামে জগাই-মাধাই তরিবে,—তাহাদের শুষ্ক কঠোর হৃদয়ে হরিপ্রেমের মধুর স্রোত প্রবাহিত হইবে, এই চিন্তাই তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা বলিয়া উঠিল, "কেরে কেরে, তোর নাম কি?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "আমার নাম অবধূত।" তাহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মাধাই কলসীর কাণা কুড়াইয়া লইয়া নিতাইয়ের কপালে ছুঁড়িয়া মারিল। রুধির-ধারায় তাঁহার বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল পূর্ণ হইয়া গেল; নিতাই রক্ত মুছিতে মুছিতে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে

লাগিলেন। পাষাণহৃদয় মাধাই পুনরায় তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইল। তখন জগাই বলিল, "মাধাই, করিস্ কি? কোথা হইতে সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহাকে কি মারিতে আছে? তুই বড় নির্দ্দয়।"

এই ঘটনার স্থল হইতে গৌরের বাটী অধিক দূর নয়। নিতাইয়ের প্রতি এই অত্যাচারের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। গৌর এই সংবাদ শ্রবণমাত্র শিষ্যগণ সহ তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন নিত্যানন্দ দারুণ আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার দেহ রক্তেপূর্ণ হইয়া যাইতেছে,—আর নিতাই মাধাইকে বলিতেছেন, "মেরেছিস্ তা'তে ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার হরিনাম বল্।" গৌর নিত্যানন্দের প্রতি এরূপ অমানুষিক প্রহার দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া দুই ভাইকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন, বলিতে লাগিলেন। নিতাই তাঁহাকে ক্রোধ সংবরণ করিতে বলিয়া বলিলেন, "জগাই প্রহার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে এবং মাধাইকে ভৎর্সনা করিয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া জগাইকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, আর বলিলেন, "জগাই রে! তুই আমার নিতাইকে রক্ষা করিয়াছিস্, শ্রীকৃষ্ণ তোকে কৃপা করিবেন।" পাপী, পুণ্যাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমালিঙ্গনে নব-জীবন লাভ করিল। তাহার পাষাণ-সম পাপ-হৃদয়ে পুণ্যের ধারা বহিতে লাগিল। মাধাই দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অবাক্ হইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, যাহাকে এমন নিদারুণ প্রহার করিলাম, তিনি কি না, বিন্দুমাত্র ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য হরিনাম গ্রহণ করিতে বলিলেন! আর এ কি, দাদাও যে নূতন ভাব ধারণ করিল! বিশেষতঃ নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব ক্ষমা ও ধৈর্য্য দেখিয়া তাহার মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে নিত্যানন্দের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নিত্যানন্দ তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "মাধাই রে, তোর সকল পাপ আমি গ্রহণ করিলাম।" মাধাই নিত্যানন্দের প্রেমালিঙ্গনে নব-জীবন লাভ করিল।

গৌর তখন শিষ্যদিগকে বলিলেন, ইহাদিগকে আমার বাড়ীতে লইয়া চল। তাঁহারা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে জগাই মাধাইকে লইয়া গৌরের বাটীতে গমন করিলে, গৌর জগাই-মাধাইকে বলিলেন, "তোমরা সকলের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" তাহারা অবনত-মস্তকে সকলের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল, ভক্তেরাও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৌর বলিলেন, "জগাই-মাধাই, উঠ! আজ হইতে তোমরা আমার দাস হইলে।"

"শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সভার চরণে ধরি পড়ে সেই ঠাঞি॥
সর্ব্ব মহা ভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগ্নাই মাধাই দোঁহে হৈলা নিরপরাধ॥
প্রভু বোলে, উঠ উঠ জগাই-মাধাই।
হৈলা আমার দাস চিন্তা আর নাই॥"

যে নামের গুণে জগাই মাধাই তরিল, যে নামের গুণে চিরদিন মহা পাতকীরা তরিয়া গিয়াছে, ভক্তবৃন্দ মহানন্দে সেই নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। জগাই মাধাইও ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভগবানের নামের গুণে ও সাধুজীবনের প্রভাবে যে নিমেষে পাতকী তরিয়া যায়, জগাই-মাধাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

জগাই-মাধাইয়ের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহারা হরিনাম কীর্ত্তনে ও নামানন্দ-রস-পানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস বলেন, তাঁহারা দুইজনে জাহ্নবীর তীরে দুইলক্ষ নাম জপ করিতেন। তাই তিনি বলিতেছেন,—

"জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক-রূপে বৈসে নদীয়ায়॥
উষা-কালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥"

অনুতাপের অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ না হইলে, হৃদয় পরিষ্কার হয় না; প্রকৃতরূপে হৃদয়ে প্রেম জাগিয়া উঠে না। মাধাইয়ের প্রাণে এখনও শান্তি আসিতেছে না। সে যে পরমভক্ত নিত্যানন্দের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, এবং শত লোকের প্রতি অকারণ অত্যাচার করিয়াছে, সে-সকল স্মৃতি তাহার প্রাণে উদিত হইয়া, এখনও তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। এক দিন নিত্যানন্দকে পথে দেখিতে পাইয়া, মাধাই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং বলিল, "প্রভো! যে অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, এমন কোমল অঙ্গে আমি প্রহার করিলাম— আমার ন্যায় পাতকী আর কে আছে?"

নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধরিয়া ভূমি হইতে তুলিয়া লইলেন, আর বলিলেন, "মাধাই! শিশুপুত্র পিতাকে মারিলে, তিনি কি সেজন্য কষ্ট অনুভব করেন? আজ হইতে আমি তোমারই শরীরে বাস করিব।" এইরূপ নানা আশার কথা বলিয়া, তাহার অনুতপ্ত প্রাণে যেন শান্তির বারি সিঞ্চন করিয়া দিলেন। নিতাই বলিতেছেন,—

"উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥
শিশু-পুত্র মারিলে কি বাপ দুঃখ পায়?
এই মত তোমার প্রহার মোর গায়॥"

এ-সকল কথা কি সাধারণ লোকের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে? গৌর-শিষ্য নিত্যানন্দের ন্যায় ভক্তই এ-কথা বলিতে সমর্থ।

মাধাই কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল, "প্রভো! আর একটি নিবেদন আছে, তাহার উপায় কি করিব বলুন। আমি অনেক লোকের প্রতি অকারণ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, আমি ত সকলকে চিনি না, তাঁহাদের নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনার উপায় কি?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি গঙ্গার ঘাটে বসিয়া থাকিবে, আর সকলের চরণ ধরিয়া বলিবে, 'আমাকে ক্ষমা কর।'"

মাধাই নিত্যানন্দের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, নিজে কোদাল লইয়া স্বহস্তে জাহ্নবীতীরে এক ঘাট নির্ম্মাণ করিল এবং তথায় উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনে ও নিত্যানন্দের আদেশ পালন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ তখন হইতে প্রায় সকল সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম প্রচারের সহায় হইলেন। গৌর যখন সন্ন্যাসান্তে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, নীলাচলে জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করেন, তখন বঙ্গদেশ হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় তাঁহার বহুসংখ্যক ভক্ত তথায় গমন করিতেন, এবং চারি মাস কাল তাঁহার সহবাসে থাকিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে ও সংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। গৌর যে বৎসর বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন সে বৎসর গৌড় হইতে ভক্তেরা আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দও তৎসঙ্গে আগমন করিলেন।

হরিনাম চারিদিকে প্রচার হয়, নরনারী শান্তিসুধারসে প্রাণ শীতল করে, গৌর সেই উদ্দেশ্যেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, কেবল সন্ন্যাসীর দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি এক-দিন নিত্যানন্দকে ডাকিয়া সমস্ত দিবস তাঁহার সঙ্গে যাপন করেন, কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্য কেহ শুনিতে পান নাই। বোধ হয়, নিত্যানন্দকে দার পরিগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে হরিনাম ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; কারণ তিনি বঙ্গদেশে প্রচার-কার্য্যে রত ছিলেন, এবং দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সময় গৌর সর্ব্বসমক্ষে নিত্যানন্দকে বলিলেন, "নিত্যানন্দ তুমি

গৌড়ে যাইয়া হরিনাম প্রচার কর। গৌড় দেশ প্রচারের জন্য তোমারই হস্তে অর্পণ করিলাম। ত্বরায় তথায় গমন কর, এবং মধুর হরিনামের সুধা সকলকে পান করাও।"

"প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে,
মূর্খ নীচ ভাসাব প্রেম-সুখে।
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥"

গৌর বলিলেন, "তুমি তোমার কার্য্যের অনেক সহায় পাইবে। রামদাস, গদাধরদাস, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতির সহায়তায় তুমি এই মহৎ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।" প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র নিত্যানন্দ ঐ সকল ভক্তদিগকে সঙ্গে করিয়া গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। মধুর হরিপ্রেমে গৌড়দেশ ভাসাইবার জন্য তাঁহারা গমন করিতেছেন, এ আনন্দে তাঁহাদের সকলের প্রাণ যেন উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা মনের আনন্দে হরিগুণ গান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। আর হরিপ্রেমের সুধাপানে যেন সকলে মাতোয়ারা। যাইতে যাইতে কেহ বা কাহারো গায়ে হেলিয়া পড়িতে লাগিলেন, কেহ বা আর ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া, আত্মহারা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তাঁহারা পানিহাটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ আপন পার্ষদগণের সহিত রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাঘব পণ্ডিত পরম ভক্ত নিত্যানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে আপন বাড়ীতে রাখিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে রত হইলেন। তাঁহার নাম প্রচারে পানিহাটি গ্রামে ভক্তিস্রোত বহিতে লাগিল। এবং সেই সুশীতল ভক্তি-বারি গ্রামগ্রামান্তরে প্রবাহিত হইয়া নরনারীর প্রাণ শীতল করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের অলঙ্কার পরিবার সাধ হওয়াতে তিনি নানাপ্রকার স্বর্ণালঙ্কারে আপনার অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া ভাগীরথীর দুই কূলে শিষ্যবৃন্দসহ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের ভক্তিবিগলিত হৃদয় হইতে হরিনামের ধ্বনি উত্থিত হইয়া সকলকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। এমন কি শিষ্যগণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া, উচ্চরবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দের জয় বলিয়া আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও তদীয় শিষ্যগণ সকল সময়েই হরিনাম গানে সকলকে মত্ত করিয়া তুলিলেন। নিত্যানন্দ যেখানেই বাহু তুলিয়া কীর্ত্তন করিতেন, সেইখানেই শত শত লোক ভাবরসে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন॥"

এখান হইতে নিত্যানন্দ এঁড়েদহে গদাধরদাসের বাড়ীতে আগমন করিলেন। গদাধরও একজন ভক্তলোক। নিত্যানন্দ কিছুকাল তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে প্রেমানন্দে ভাসাইতে লাগিলেন। এখানে এক কাজি বাস করিতেন। তিনি সংকীর্ত্তনের বড় বিরোধী ছিলেন। নিত্যানন্দ যখন সকলকে সংকীর্ত্তনে মত্ত করিতে লাগিলেন, তখন গদাধর একদিন সেই কাজির নিকট গমন করিয়া নির্ভয়ে এই কথা বলিলেন যে, "নবযুগে পাপীর উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ অবতীর্ণ হইয়া হরিনাম বিলাইতেছেন, দেশের বহু লোক এই নাম কীর্ত্তন করিয়া তরিয়া যাইতেছে, তুমি কিরূপে অলসভাবে বসিয়া থাক? যদি পরিত্রাণ চাও, মুখে হরিনাম বল।" কাজি গদাধরের কথায় স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "গদাধর! আজ ঘরে যাও, কাল আমি হরিনাম বলিব।" গদাধর দাস

বলিলেন, "আর কাল কেন, এই ত তুমি মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিলে। আজই প্রাণ ভরে' ঐ নাম কর, সকল পাপ খণ্ডিয়া যাক।" যে ব্যক্তি কঠোরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন তিনি আজ গদাধরের ভাব দেখিয়া, হরিপ্রেমের মধুরতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সেই দিন হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। গদাধর দাস ভক্ত বটে, কিন্তু তিনি এ-সময় নিত্যানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এইরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি তৎপর খড়দহে গমন করেন, এখানে চৈতন্যদাস ও পুরন্দর পণ্ডিত নামে দুই সাধু পুরুষ বাস করিতেন। নিতাই এখানে এই দুইজন ভক্তের বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিয়া হরিনামের সুধা বিতরণ করেন। এখান হইতে নিত্যানন্দ তাঁহার পার্ষদবর্গের সহিত সপ্তগ্রামে গমন করিয়া, উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ বণিক ও বিশেষ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি নিত্যানন্দকে পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রেম ও ভক্তির স্রোতে সপ্তগ্রাম ভাসাইয়া তুলিলেন।

"প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥
নিত্যানন্দ রূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥"

সপ্তগ্রামে ভক্তি বিতরণ করিয়া, নিতাইচাঁদ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে গমন করেন। বহুকাল পরে উভয়ের মিলন হওয়াতে উভয়ের হৃদয়ে প্রেমতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আচার্য্য ভাবে বিভোর হইয়া নিত্যানন্দকে আপন ক্রোড়ে করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিতাই ভক্তগণসহ বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈতের বাটীতে কয়েক দিন বাস করিয়া,

হরি-কথা ও নাম কীর্ত্তনে দিন যাপন করিলেন। আচার্য্য নিত্যানন্দকে এইরূপে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন ঃ—

"তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য-বৃক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥"

অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দের স্তব করিতে করিতে ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

"কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা॥"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন। নবদ্বীপ গৌর বিহনে জ্যোতিহীন হইয়া রহিয়াছে। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া রহিয়াছেন। ভক্ত-দিগের প্রাণে সুখ ও শান্তি নাই; যখন তাঁহারা বৎসরান্তে নীলাচলে যাইয়া, প্রভুর মুখ দর্শন করেন, তখনই তাঁহাদের প্রাণে আনন্দধারা বহিতে থাকে। আজ নিতাইচাঁদকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শচীদেবী নিতাইকে আপনার পুত্রের ন্যায় দর্শন করিতেন। নিতাইকে দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিলেন, "ওরে নিতাই, তুই আমার বাড়ীতে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন কর।" শচী নিতাইকে দেখিয়া বিশ্বরূপের ও গৌরের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া যাইতেন।

নিতাই নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন। যে সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে নবদ্বীপ পূর্ণ হইয়াছিল, নিতাইয়ের আগমনে আবার তাহা পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভক্তগণ নিত্যানন্দকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। নিতাই নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ আবার নবভাবে জাগিয়া উঠিল। শুষ্ক জ্ঞানের কঠোরতার স্থলে সরস ভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল ; পাষাণ-সম-প্রাণ ভক্তিরসে গলিয়া গেল।

সে-সময় নবদ্বীপে একজন ব্রাহ্মণ-কুমার চুরি ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদিন সে নিত্যানন্দের শরীরে বহুমূল্য স্বর্ণা-লঙ্কার দর্শন করিয়া, উহা অপহরণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। একদিন অধিক রাত্রিতে সে সঙ্গীদিগকে লইয়া হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইল। গিয়া দেখিল, নিত্যানন্দ আহার করিতেছেন, আর তাঁহার ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতেছে। দস্যুপতি সকলকে বলিল, "এখন আমরা কিছুক্ষণ কোন নিভৃত স্থানে অপেক্ষা করি, কিছুক্ষণ পরেই কার্য্য সিদ্ধ করিব।" তাহার আদেশানুসারে সকলে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। যখন প্রাতঃ-কালে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহারা তাহাদিগের অস্ত্রাদি একটা বনের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সকলে পলায়ন করিল। দ্বিতীয় দিন, তাহারা আবার আসিয়া দেখে হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীর চারিদিকে পাইকগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রহরীরূপে কার্য্য করিতেছে, আর হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে। কিরূপে এরূপ সম্ভব হইল, তাহা তাহারা স্থির করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবস দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমার সদলে আগমন করিল কিন্তু আসিবামাত্রই সকলের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। তাহারা এ অবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিয়া কেহ গর্ত্তে, কেহ বা কণ্টকাকীর্ণ স্থলে পতিত হইয়া বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। তাহাদিগের অধিপতি ব্রাহ্মণকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে নিত্যানন্দের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল ; এবং

অবাক্ হইয়া তাঁহার ঐশীশক্তির পরিচয় দান করিল। নিত্যানন্দ কৃপা-পরবশ হইয়া, তাহার অন্ধতা ঘুচাইয়া বলিলেন, "শুন বিপ্র! তুমি জীবনে যত পাপ করিয়াছ, সে সকলই আমি গ্রহণ করিলাম। তুমি এখন হইতে হিংসা, চৌর্য্যবৃত্তি, প্রভৃতি যে-সকল অপরাধে জীবন কলঙ্কিত হয়, সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সেই সর্ব্বপাপ-তাপহারী হরিনাম কীর্ত্তন কর; —তাহা হইলে তোমার জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে অপরেও পরিত্রাণ লাভ করিবে, পরমেশ্বরের নামের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে।" এই বলিয়া, ক্ষমার অবতার নিত্যানন্দ আপনার গলদেশ হইতে পুষ্পমাল্য লইয়া তাহার গলে পরাইয়া দিলেন।

"ধর্ম্মপথে গিয়া তুহি লহ 'হরি' নাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত চোর দস্যু ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সভারে লওয়াও তুমি গিয়া॥
এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥"

দস্যুপতির দৃষ্টান্তে তাহার সঙ্গীরাও সকলে ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করিল। দস্যুরা যে নিত্যানন্দের অলঙ্কার অপহরণ করিতে গিয়া অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ও শেষে অন্ধতা প্রাপ্ত হয়, উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল বোধ হয়, আর কিছুই নহে, নিত্যানন্দের জীবনের প্রভাবে দস্যুদল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। ভগবৎ-কৃপার আশ্চর্য্য শক্তি মহাপাপীকেও উদ্ধার করিয়া পুণ্যপথে পরিচালিত করিয়া থাকে।

নিত্যানন্দ কিছুকাল নবদ্বীপে অবস্থিতি করিয়া, প্রেমতরঙ্গে সকলকে ভাসাইলেন, জীবনের মাধুর্য্যগুণে পাষাণসম দস্যুদিগের প্রাণ বিগলিত করিলেন। তাঁহার আগমনে নবদ্বীপ নব জাগরণে জাগিয়া উঠিল। তিনি এখন নীলাচল যাইয়া গৌরসুন্দরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নীলাচল যাত্রা করিলেন। মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন তিনি কমলপুরে উপস্থিত হইলেন, তখন দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দর্শনে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য তথায় আগমন করিলেন এবং তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়া বলিলেন, "নিত্যানন্দ! তুমি যে গাত্রে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ, সে-সকল মণি, মুক্তা তোমার ভক্তির লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমারই নাম-কীর্ত্তনের গুণে অনেক নীচ জাতি উদ্ধারলাভ করিল, অনেক পাতকী তরিয়া গেল।" অবশেষে সকলে নীলাচলে গমন করিলেন। গদাধর নিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাকে আপনার আশ্রমে লইয়া গেলেন। নিত্যানন্দ গদাধরের জন্য এক মণ সুন্দর আতপ চাউল ও এক খানি সুন্দর লাল রঙের বস্ত্র আনিয়াছিলেন; আশ্রমে গমন করিয়া নিত্যানন্দ গদাধরকে সেগুলি অর্পণ করিলেন। গদাধর সেই তণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া গৌর ও নিত্যানন্দকে ভোজন করাইলেন। গৌর সেই তণ্ডুলের সুগন্ধে মোহিত হইয়া বলিলেন, "গদাধর! এ অন্ন খাইলে কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি হয়।" নিত্যানন্দ কিছু কাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলে পর, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি সংসারধর্ম্ম করিয়া গৌড় দেশে যাইয়া হরিনাম প্রচার কর।"

"তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে সে সব লোকের হইবে নিস্তার॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ আর অমান্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং অবশেষে আপনার পার্ষদবর্গের সহিত গৌরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। বিদায়ের সময় সকলের চক্ষু হইতেই বারিধারা বহিতে লাগিল।

নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে আগমন করিয়া পানিহাটি গ্রামে রাঘব

পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করা বিধেয় মনে করিয়া তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অম্বিকানগরে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যা ছিল। নিত্যানন্দ এজন্য অম্বিকানগরে গমন করিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিতের নিকট আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। সূর্য্যদাস নিত্যানন্দকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। পরে বসুধার নিত্যানন্দের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার পরিচয় পাইয়া, বসুধার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন, তৎপর নিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবীকেও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

নিত্যানন্দ সংসারী হইয়া ভাগীরথীতীরবর্ত্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ খড়দহে আসিয়া শ্রীপাট নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে বসুধাদেবীর গর্ভে বীরচন্দ্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্র ভবিষ্যতে বৈষ্ণবধর্ম্মের এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাহার নেতারূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের আগমনে খড়দহে ভক্তির তরঙ্গ উত্থিত হইল, নাম-সংকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তিনি গৌর-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা বড়ই অনুভব করিতে লাগিলেন। সে নাম বলিতে বলিতে তিনি অনেক সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন শ্যামসুন্দর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। ভক্তেরা কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেতনা হইল না; চিরদিনের জন্য তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

হরিদাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুমান ১৩৭১ শকাব্দের মার্গশীর্ষ মাসে যশোহর জেলার অন্তর্গত 'বুড়ন' গ্রামে মুসলমান বংশে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। হরিদাস যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের ধর্ম্মাবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধ নীতির ও অদ্বৈতবাদের সুমহান্ প্রভাবও বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুরাণ ও ভাগবতের ভক্তিধর্ম্মও ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তান্ত্রিক, বামাচারী ও কাপালিকগণ আপনাপন ধর্ম্মের সার পরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া সুরাপান ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মের আদর্শকে অতি হীন করিয়া ফেলিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই হরিদাস হরিনামের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। যবন পরিবারে বাস করিয়া হরিনামের প্রতি একান্ত অনুরক্তিবশতই বোধ হয় তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়।

হরিদাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগ্রামের নিকট বেনাপোলের নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, নির্জ্জন সাধনে রত হইলেন। হরিনামসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। কথিত আছে, তিনি নিত্য তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, কিন্তু হরিদাস মনে মনে জপ করিতেন না, তিনি অনেক সময় সেই মধুময় নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন, কারণ সে নাম শ্রবণে অপরের প্রাণও শীতল হইতে পারে—শুষ্ক হৃদয়েও প্রেমের গোলাপ বিকশিত হইতে পারে। ভক্ত হরিদাসের সাধনার কথা চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। পল্লীর সকল বর্ণের ও সকল শ্রেণীর লোক, তাঁহার প্রতি

অনুরাগী হইয়া, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া বেনাপোলের কুটীরে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহার অমিয়মাখা ভক্তিপূর্ণ মুখদর্শনের জন্য আগমন করিত এবং তদীয় চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইত। তাঁহার নিকট যাহারা গমন করিত, তিনি তাহাদিগকে মধুর হরিনাম গ্রহণ করিতে বলিতেন। হরিদাস হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন, এই জন্য তাঁহার কথা অপরের প্রাণকেও আলোড়িত করিত। তিনি যখন বলিতেন, 'হরিনাম কর', তখন ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তও দ্রবীভূত হইত, এবং তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতেও সুধামাখা হরিনাম উচ্চারিত হইত।

সন্ন্যাসী হরিদাস দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহার আহারের জন্য নানারূপ ফলমূল আনয়ন করিত। হরিদাস এক বেলা আহার করিতেন, এতদ্ভিন্ন ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি পরদিনের জন্য সঞ্চয় না করিয়া, তিনি বালক ও অন্যান্য লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন।

সেই সময় বনগ্রামে রামচন্দ্র খান্ নামে এক দুর্ব্বৃত্ত জমিদার বাস করিত। হরিদাসের সাধনার কথা শুনিয়া, তাহার মনে কেমন এক অসৎ ইচ্ছা উদিল হইল যে, সে হরিদাসকে জব্দ করিবে। রামচন্দ্র এই ভগবদ্ভক্তের জীবনের কঠোর সাধনা, ও তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য বিনাশ করিবার জন্য এক অতি অসৎ উপায় অবলম্বন করিল। সে কয়েকজন রূপসী বারাঙ্গনা আনিয়া তাহাদিগকে হরিদাসের জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করিতে বলিল। অর্থলোভে বারবিলাসিনীরা প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তন্মধ্যে একজন বিশিষ্টা রূপ-যৌবনসম্পন্না নারী বলিল, "আমি একাই তথায় যাইয়া সেই সাধুকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিব, আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ফিরিব।" এই বলিয়া সেই সুন্দরী নারী বেনাপোলের বনস্থিত হরিদাসের নির্জ্জন পবিত্র সাধনকুটীরে গমন করিল। তখন দিনমণি পশ্চিম গগনে প্রবেশ

করিয়াছেন, সন্ধ্যার অন্ধকার বনের চারিদিক পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, কেবল পক্ষীদিগের কলরব ভিন্ন তথায় জনমানবের শব্দ নাই। বারাঙ্গনা সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে হরিদাসের কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথারীতি তাঁহার চরণে প্রণত হইল। হরিদাস নামসাধনে রত—নাম-কীর্ত্তনে বিহ্বল।

হরিদাস সুপুরুষ ছিলেন। বারবনিতা তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেল, এবং নির্লজ্জভাবে মৃদু মধুর বচনে আপনার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। হরিদাস বলিলেন, "আমি নামজপের একটা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পূর্ণ হইলে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" ভক্ত এই বলিয়া নামজপসাধনে রত হইলেন। সে জপের বিরাম নাই, সে নাম কীর্ত্তনের বিরতি নাই। বারবনিতা কুটীরের দ্বারদেশে বসিয়া সকলই দেখিতে লাগিল, কিন্তু তাহার নীচ বাসনা আর পূর্ণ হইল না,—দেখিতে দেখিতে প্রভাতকাল উপস্থিত হইল। বারাঙ্গনা নিরাশ মনে হরিদাসের কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, রামচন্দ্র খানের নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল যে, সে অদ্য রাত্রে তাঁহাকে আপনার রূপের ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহার সাধনা পণ্ড করিয়া দিবে। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সেই কুলটা নারী পুনরায় হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভক্তের চিত্তবিকারের প্রয়াসী হইল। হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "তুমি গতকল্য নিরাশ মনে ফিরিয়া গিয়াছ, আমি নামজপের যে ব্রত লইয়াছি, তাহা এখন পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইলেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" বারাঙ্গনার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। সে পূর্ব্বদিনের ন্যায় দ্বারদেশে বসিয়া রহিল। হরিদাস যথারীতি নামজপ ও নাম-কীর্ত্তনে রত হইলেন। হরিদাসের দিব্যকান্তির ভিতর দিয়া, যেন এক অপার্থিব জ্যোতি বহির্গত হইতেছে। কণ্ঠ হইতে মধুর হরিধ্বনি উত্থিত হইতেছে,—বারাঙ্গনা বসিয়া বসিয়া সকলই দেখিল। কিন্তু সেদিনও তাহার

বাসনা পূর্ণ হইল না দেখিয়া সে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া গিয়া রামচন্দ্র খানের নিকট সকলই প্রকাশ করিল। আজ তৃতীয় দিন; বারাঙ্গনা আজও তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে বলিয়া, রামচন্দ্র খানকে জানাইল এবং অদ্য নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে, বলিয়া রামচন্দ্রকে আশাদান করিল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল; সুন্দরী বারাঙ্গনা পূর্ব্বের ন্যায় বেনাপোলের নির্জ্জন কুটীরে গমন করিল। হরিদাস বলিলেন, "আজ বোধ হয়, নামজপ পূর্ণ হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া, হরিদাস নামজপে প্রবৃত্ত হইলেন: ক্রমে যামিনী প্রভাতা হইয়া আসিল। বারাঙ্গনার মনোরথ পূর্ণ হইল না—বিফলমনোরথ হইয়া সে চলিয়া গেল, এবং রামচন্দ্র খান্‌কে সকল কথা বলিল। আজ চতুর্থ দিন, তবুও হরিদাসকে কুহকের জালে ফেলিবার আশা তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সন্ধ্যা-সমাগমে সে পুনরায় হরিদাসের কুটীরে গমন করিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারদেশে উপবেশন করিল। হরিদাস আপন হৃদয়ে হরিনাম জপ করিতেছেন, অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে রাত্রি গভীরতর হইয়া আসিল। বারবিলাসিনী ভাবিল, এ ত মানব নয়—রক্ত মাংসের দেহ লইয়া যে মানব এরূপ জ্বলন্ত প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইতে পারে, সে নরলোকের অতীত।

ভক্তের অমৃতময় নামকীর্ত্তনের ধ্বনিতে যেন স্নিগ্ধ বারিধারার ন্যায় তাহার হৃদয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তির অনলশিখা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল—তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে করতালি দিয়া হরিদাসের সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার নয়ন হইতে অনুপাতের বারিধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল। রামচন্দ্র খান্-প্রেরিত নারী আর সে নারী নাই। অবশেষে সে কাঁদিয়া আকুল হইয়া হরিদাসের চরণ ধরিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং করজোড়ে বলিল, "আমি মহাপাপী, আমার পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দাও।"

হরিদাস বলিলেন, "আমি তোমার পরিত্রাণের জন্যই এখানে তিন দিন অবস্থিতি করিতেছিলাম। তুমি এখন তোমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা দরিদ্রদিগকে দান কর এবং একান্ত অন্তরে জীবনের অবশিষ্ট সময় হরিনাম-কীর্ত্তনে অতিবাহিত কর। এই সকল কথা বলিয়া হরিদাস ঠাকুর মধুর কণ্ঠে সুধামাখা হরিধ্বনি করিতে করিতে, বেনাপোলের কুটীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলন।

সেই নারী হরিদাসের উপদেশানুসারে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দীন দুঃখী-দিগকে দান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিল, এবং তপস্বিনীর ন্যায় হরিদাসের সেই গোফায় বসিয়াই হরিনাম জপে ও কীর্ত্তনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহার জীবনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও তাহার প্রগাঢ় ভক্তি নিষ্ঠা দর্শন করিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া গেল। তখন হইতে সে ভক্তিমতী বৈষ্ণবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। হরিদাসের প্রভাবে অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে লোকে হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল,—তাই চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত লীলায় দেখিতে পাই ঃ—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোক চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার।"

দুর্বৃত্ত রামচন্দ্রকে শেষে অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। সে নবাবকে রীতিমত খাজনা প্রদান করিত না, সেজন্য নবাবের কর্ম্মচারীরা তাহার বাটীর বহির্দ্দেশে আসিয়া হিন্দুর অখাদ্য ভোজন করে, এবং স্ত্রীপুত্রসহ তাহাকে বন্দী করিয়া তাহার বাটী ও সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইয়া যায়।

হরিদাস বারবনিতাকে উদ্ধার করিয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন শান্তিপুরে বাস করিতেন। হরিদাস উপস্থিত হইলে, অদ্বৈত তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক আপনার বাটীতে স্থান দান করিলেন।

উভয় ভক্তের সম্মিলনে যেন উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের প্রস্রবণ উছলিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অদ্বৈত সে-সময় দেশের অবস্থা দর্শনে এক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাবের জন্য সততই একান্ত নিষ্ঠার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও সেজন্য সময়ে সময়ে অনশনে দিন যাপন করিতেন। হরিদাসকে পাইয়া তাঁহার প্রাণে যেন এক নব আশার সঞ্চার হইল। আচার্য্য ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তিনি হরিদাসের জন্য নিজগ্রামের নিকট একটি গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, ভক্ত সেই নির্জ্জন কোলাহলশূন্য স্থানে বসিয়া মনের সাধে হরিনাম জপে ও তাঁহার নামামৃত পানে সময় যাপন করেন। কেবল আহারের সময় আচার্য্যের ভবনে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। হরিদাস কেবল নির্জ্জন সাধক নহেন। তিনি যে মধুর নামরসপানে অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেন, সে আনন্দের সকলকে অধিকারী করিবার জন্য, তিনি যখন বাহির হইতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে করতালি দিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন। সে পাপতাপহারী বিশ্ববিধাতার সুধাময় নাম গ্রামবাসীদিগের কর্ণকুহরে যেন সুধা বর্ষণ করিত। অনেক তাপিত-হৃদয়ে শান্তির বারি বহিয়া যাইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রাম। এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। হরিদাস এই ব্রাহ্মণনিবসতি গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভক্তেই প্রভাব সর্ব্বত্রই সমান। হরিদাস যবন হইলে কি হয়, তাঁহার জীবনের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। হরিদাস শান্তসলিলা জাহ্নবীতে অবগাহন করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে আপনার আশ্রমে প্রত্যাগত হইতেন, এবং একান্ত

অন্তঃকরণে পরমেশ্বরের সেই মধুময় নাম-গানেই দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেন।

তখন মুসলমান-রাজত্বের সময়। কাজিদিগের অত্যাচারে অনেক সময় হিন্দুরাই নিরুপদ্রবে বিশ্বাসানুসারে আপনাদিগের ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইত না। এখন যবনের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ যে একেবারে বিনা আপত্তিতে চলিয়া যাইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। হরিদাস যবন হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করাতে অন্যান্য মুসলমানদিগের নিকট অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, এইজন্য তাঁহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত কবিবার জন্য, গোরাই কাজি, মুলুকপতির নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। মুলুকপতি যবন হরিদাসের হিন্দুধর্ম্ম আচরণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। হরিদাস রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা বন্দী হইয়া তথায় গমন করিলেন।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির দ্বারে দিলা দরশনে॥"

হরিদাসকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হইলে, ফুলিয়াবাসী সকলেই তাঁহার জন্য মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। এদিকে হরিদাস কারাগারে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য বন্দীরা হরিদাসের আগমনে উৎফুল্ল মনে তাঁহার নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইল। হরিদাস সকলকে আশীর্ব্বাদসূচক বচনে বলিলেন, "তোমরা যেমন আছ, সেইভাবেই সুখে বাস কর।" বন্দীরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ বচন শ্রবণ করিয়া কিছু বিস্মিত হইল, অনেকে দুঃখিত হইল। হরিদাস বুঝিলেন, তাহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছে; তিনি অবশেষে সকলকে বলিলেন, "ভাই! আমি তোমাদিগকে বন্দিদশায় অবস্থিতি করিবার আশীর্ব্বাদ করি নাই। তোমরা এখন যেরূপ মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছ সেই আনন্দ চিরদিন সম্ভোগ কর এবং হরিনাম কীর্ত্তন কর।"

"এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা সভাকার মন।
যেন আছে এই মত রহু সর্ব্বক্ষণ॥
*   *   *   *
বন্দী থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি॥"

তিনি এইরূপে তাঁহার গুপ্ত আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, যেন ভবিষদ্বক্তার ন্যায় সকলকে বলিলেন, "ভাই সকল, দুই তিন দিন পরেই তোমরা সকলে কারামুক্ত হইবে।" ভক্তের কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। দুই তিন দিন পরেই মুলুকপতির আদেশে সকলে কারামুক্ত হইল।

হরিদাসের বিচারের দিন উপস্থিত হইল। আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। মুলুকপতি বিচারাসনে উপবেশন করিলে, সৌম্যমূর্ত্তি প্রফুল্লচেতা পরমভক্ত হরিদাসকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করা হইল। মুলুকপতি, এত বড় ভক্তের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। মুলুকপতি অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভাই! কতভাগ্যে তুমি যবন হইয়াছ, কিন্তু তবে কি জন্য হিন্দুর দেবতার নাম গ্রহণ ও হিন্দুর আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছ? আমরা হিন্দুকে দেখিয়া ভাত পর্য্যন্ত খাই না, তুমি যবনকুলের এমন উচ্চ অধিকার লঙ্ঘন করিয়া কেন অন্যায় আচরণ করিতেছ? এ পাপের জন্য পরকালেও তোমার নিস্তার নাই জানিও। এখন কলমা পড়িয়া এ পাপ হইতে উদ্ধার লাভ কর।"

মুলুকপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিদাস যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অহো বিষ্ণু মায়া;" তৎপর বলিলেন, "শুন বাপ! জগতের যিনি অধিপতি, তিনি এক; হিন্দু ও মুসলমানেরা কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে, কোরাণ ও পুরাণে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমা নানা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি নিত্য, অখণ্ড ও অব্যয়—

তিনি সকল মানবের হৃদয়েই সমভাবে বাস করিতেছেন। তিনিই যেমন করান, লোকে তেমনই করিয়া থাকে। সকল শাস্ত্রই সেই একমাত্র পরমেশ্বরেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কেহ যদি হিন্দুকুলে জন্মিয়া আপন ইচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে হিন্দুরা ত তাহার প্রতি অত্যাচার করে না। মহাশয়! আমার যাহা বলিবার তাহা সকলই বলিলাম, এখন আপনার বিচারে যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন।” তাই চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই—

"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥

* * *

যে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥"

হরিদাসের এই সুযুক্তিপূর্ণ ও মধুমাখা বাক্য শুনিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিল। মুলুকপতিও সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু গোরাই কাজি তাঁহার অভীষ্ট সমস্ত ব্যর্থ যায়, সেজন্য তিনি মুলুকপতিকে বলিলেন, “ইহাকে বিধিমতে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা ইহার দৃষ্টান্তে মুসলমান ধর্ম্মের অনিষ্ট হইবে, এবং অন্যান্য মুসলমানেরাও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে।” মুলুকপতি, গোরাই কাজির কথা শুনিয়া পুনরায় হরিদাসকে বলিলেন, “দেখ, আপনার ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে চল—হরিনাম ছাড়িয়া দেও, নতুবা তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে।”

হরিদাস পরম বিশ্বাসী—পরম ভক্ত। তিনি কি কোন শাসন-ভয়ে বিচলিত হইয়া আপনার হৃদয়ের ইষ্টদেবতার নাম পরিত্যাগ করিতে পারেন? তিনি স্থির ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, “যদি আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয় তবুও মধুর হরিনাম আমি কখন ছাড়িব না।”

"খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

মুলুকপতি এ উক্তি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গোরাই কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বিধান করা উচিত তাহা বল?" গোরাই সানন্দমনে বলিলেন, "ইহাকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া পিঠে বেত্রাঘাত করা হউক, যে পর্য্যন্ত প্রাণ বিয়োগ না হয়।" মুলুকপতি তাহা সঙ্গত মনে করিয়া পাইকদিগকে ডাকিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিতে বলিলেন। কঠিনহৃদয় পাইকগণ নবাবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হরিদাসকে এই কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য লইয়া গেল, এবং এক একটি বাজারে লইয়া গিয়া ভক্তের পৃষ্ঠদেশে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। সে অমানুষিক প্রহার দর্শনে সকলেই হাহাকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল; প্রত্যেক স্থানের লোকই নির্ম্মম পাইকদিগকে এই হৃদয়বিদারক কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিল। কিন্তু পাষাণসম পাইকগণ কি সে কথায় কর্ণপাত করে? তাহারা একে একে বাইশটি বাজারে লইয়া গিয়া নির্ম্মম হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু এত আঘাতেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি স্থির ও প্রসন্ন মনে সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ দুঃখ না হয় প্রকাশ॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবদ্ভক্তেরা চিরদিনই ক্ষমাশীল। তাঁহারা অত্যাচারিত হইয়াও অত্যাচারীদিগের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর পাইকগণ যখন হরিদাসের প্রাণবিনাশের জন্য অনবরত তাঁহাকে আঘাত করিতেছে, তখন তাহাদের উপর অভিসম্পাত অথবা ক্রোধ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তিনি তাহাদের অসৎ আচরণের জন্য ব্যথিত হৃদয়ে সেই

চিরক্ষমাশীল মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, "ভগবন! আমার প্রতি প্রহারের জন্য তুমি ইহাদের অপরাধ লইও না। তুমি ইহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ কর।"

প্রহারকারীরা প্রহার করিতে করিতে যখন দেখিল যে, কিছুতেই হরিদাসের প্রাণ বিনষ্ট হইল না। তখন তাহারা ভীত হইয়া পড়িল, তাহারা ভাবিল, 'ইহার প্রাণ যদি বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে মুলুকপতি আমাদেরও প্রাণ লইবেন।' তাহারা সেজন্য হরিদাসকে আপনাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "মহাশয়! আমরা যদি তোমাকে মারিয়া ফেলিতে না পারি, তাহা হইলে, আমাদের এ জীবন রক্ষার আর উপায় নাই।" কোমলহৃদয় হরিদাস তাহাদের এই কথায় বড় দুঃখিত হইলেন, এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিজে যোগবলপ্রভাবে আপনার সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া, মৃতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন। পাইকগণ দেখিল, তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহারা হরিদাসকে যথার্থই মৃতকল্প মনে করিয়া তাঁহার দেহ বহন করিয়া মুলুকপতির নিকট উপস্থিত করিল। মুলুকপতি গোরাই কাজি প্রভৃতি সকলেই দেখিলেন, হরিদাসের প্রাণবায়ু যথার্থই বহির্গত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানের প্রথানুসারে মুলুকপতি হরিদাসের দেহ মাটিতে প্রোথিত করিতে বলিলে, গোরাই কাজি একটু আপত্তি উত্থাপন করিলেন, হরিদাস মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু হইয়াছিল উহাকে আমাদের ধর্ম্মানুসারে মাটিতে সমাধিস্থ করিলে, উহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে; এজন্য গঙ্গার জলে উহার দেহ ফেলিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে কাফিরের ন্যায় উহাকে নরক ভোগ করিতে হইবে। তাহাই সিদ্ধান্ত হইল। অবশেষে মুলুকপতির অনুচরেরা ধরাধরি করিয়া হরিদাসের সংজ্ঞাহীন মৃতকল্প দেহ শুভ্রসলিলা গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিল। জাহ্নবীর খরতর স্রোত সে পবিত্র দেহ ভাসাইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু হরিদাস ত মরেন নাই, তিনি দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে আপনার সংজ্ঞাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—

আত্মার সহিত সেই পরমাত্মার যোগে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এই মাত্র। এখন ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল এবং তাঁহার দেহ তটে আসিয়া লাগিল।

চারিদিকে এ-সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। মুলুকপতি, গোরাই কাজি ও অন্যান্য যবনগণ হরিদাসের দর্শনার্থ আগমন করিলেন। মুলুকপতি হরিদাসের এই লোকাতীত শক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং করজোড়ে তদীয় পবিত্র চরণের সমীপে নত হইয়া বলিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ পীর এখন আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি আপনার নিকটে যে-সকল অপরাধ করিয়াছি, সে-সকল দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। আর এখন হইতে আপনি স্বাধীন ভাবে গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গুহায় অথবা যথা ইচ্ছা বাস করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবেন।" সকলে হরিদাসের সাধুতা, বিনয় ও ভগবন্নিষ্ঠা দর্শনে ভক্তির অসাধারণ প্রভাবই অনুভব করিল; অনেকে ভক্তিপথের পথিক হইল,—গোরাই কাজির নির্ব্বুদ্ধিতা দূর হইল। তিনিও ভগবদ্ভক্তির অভিনব শক্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

তৎপর তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় সুধামাখা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রাহ্মণপ্লাবিত ফুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

"উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে॥"

হরিদাসকে দেখিয়া সকলেই পরম পুলকিত হইলেন। বিপ্রগণ মহোল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিদাসও প্রেমে বিভোর হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; কখনও বা ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। অশ্রু, কম্প, হাস্য, পুলক প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার প্রতি যে অযথা অত্যাচার হইয়াছে, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরিদাস

অতি বিনীত বচনে বলিলেন, "বিপ্রগণ! শুন, এই পাপ-কর্ণে নিন্দা শ্রবণ করিয়াছি বলিয়াই পরমেশ্বর আমার প্রতি শাস্তি বিধান করিয়াছেন। সেজন্য তোমরা দুঃখ করিও না।" তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মহানন্দে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হরিদাস নির্ম্মলসলিলা জাহ্নবীর তটে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনের জন্য ফুলিয়াবাসী বহুলোক নিত্য আগমন করিত। এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহারা সেই আশ্রমে আগমন করিত, তাহারা তথায় নিজ নিজ দেহে একটা জ্বালা অনুভব করিত। ইহার কারণ প্রথমে কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই, পরে ওঝারা বলে, সে আশ্রমের তলদেশে এক প্রকাণ্ড সর্প বাস করিতেছে; তাহারই বিষপ্রভাবে তথাকার বায়ু দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে হরিদাসকে সে গোফা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। হরিদাস তাহাদের অনুরোধে সম্মতি দান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোগত ভাব তাহা ছিল না। বৈষ্ণব-লেখকেরা বলেন, তৎপর দিবস তিনি যখন সকলের সঙ্গে প্রেমানন্দে হরিনামকীর্ত্তনে রত রহিয়াছেন, তখন বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত এক প্রকাণ্ড সর্প আশ্রমের তলদেশ হইতে আপনাআপনি বাহির হইয়া চলিয়া গেল। লোকে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

হরিদাস যখন ফুলিয়ায় বাস করেন তখন তথায় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে-সময় "ডঙ্ক" নামধারী এক শ্রেণীর লোকে মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া গান ও নৃত্য করিত। একদিন এক ডঙ্ক এক ধনী লোকের বাটীতে নৃত্য করিতেছিল। এমন সময়ে হরিদাস ঘটনাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডঙ্ক অনেক লোকপরিবেষ্টিত হইয়া কালিয়দমনের গীত গাহিতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া হরিদাসের ভাবের উদয় হইল। তিনিও সকলের সঙ্গে "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথার্থ ভক্ত

যিনি, ভগবানই লোকের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। হরিদাসের প্রেমবিগলিত অশ্রুধারা ও তাঁহার নৃত্য দর্শন করিয়া ডঙ্ক মোহিত হইয়া গেল। সে জোড়হস্তে এক পার্শ্বে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তৎপর পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিল।

সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিল। সে হরিদাসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়া ভাবিল, যদি হরিদাসের মতন নৃত্য করি, এবং ভাবাবেশের ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি দেই, তাহা হইলে, আমাকেও লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবে,—এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ নৃত্য করিতে লাগিল, এবং ভূতলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কিন্তু ডঙ্ক ব্রাহ্মণের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হরিদাসের নৃত্য ও ভাবাবেশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিলে, আর এ ব্রাহ্মণের প্রতিই বা কেন এরূপ ব্যবহার করিলে?" তখন সেই ডঙ্ক বলিল, "এ ব্রাহ্মণ কপট, এ ব্যক্তি লোকের নিকট হইতে ঐরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিবার জন্য ভাণ করিয়া ঐরূপ করিতেছিল। হরিদাস পরম সাধুপুরুষ, তাঁহার নৃত্য দেখিলে মানুষের ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়। ভক্ত হরিদাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে নৃত্য করেন, সেজন্য সে-নৃত্য দর্শনে নরনারী পবিত্র হইয়া যায়।"

বৃন্দাবন দাস ডঙ্কের কথা এইরূপে বলিতেছেন :—

"এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
এ নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দেখনে॥"

ডঙ্ক এইরূপে ভক্ত হরিদাসের গুণাবলী বর্ণন করিতে করিতে বলিল, "হরিদাস বিধাতার আদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া লোককে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, 'জাতিকুল সব নিরর্থক, নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ হরিভক্ত হয়, তাহা হইলে তিনি পূজনীয়, ইহাই সকল শাস্ত্রের কথা।'"

"জাতি কুল সর্ব্ব নিরর্থক, বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।"

* * *

এ সকল বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

ডঙ্ক হরিদাসের দর্শন লাভে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া সমবেত লোকমণ্ডলীকে বলিল, "তোমরা ভাগ্যবন্ত, আজ আমি তোমাদেরই প্রসাদে এমন সাধুকে দেখিলাম এবং কথঞ্চিৎ রূপে এ রসনা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিল।"

"ভাগ্যবন্ত—তোমরা সে, তোমা সভা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস যখন ফুলিয়াতে বাস করিতেন তখন তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে গমন করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন কোন একজন মহাপুরুষের আগমনের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা ও উপবাসাদি দ্বারা দিন অতিবাহিত করিতেন। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে, এই শচীকুমারই ভবিষ্যতে বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুরতা বিশেষরূপে প্রচার করিবেন, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তিনি এক সময়ে হরিনদী নামক গ্রামে গমন করেন। তথায় কোন শাস্ত্রবিৎ তাঁহাকে বলেন, "হরিদাস, তুমি উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন কর কেন? কোন্ শাস্ত্রে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম-কীর্ত্তনের বিধি আছে? নাম সাধন

মনে মনে করাই বিধেয়।" "হরিদাস বলিলেন, "হরিনাম উচ্চকণ্ঠে বলিলে অপরের কল্যাণ হয়, আমি সেই জন্যই উচ্চরবে মধুর হরিনাম গান করিয়া থাকি।" শাস্ত্রবিৎ হরিদাসের এই উত্তর শুনিয়া, তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সে-সময় সপ্তগ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার নামে দুই প্রসিদ্ধ জমিদার বাস করিতেন। বলরাম আচার্য্য নামে, তাঁহাদের এক কুল-পুরোহিত ছিলেন। হরিদাস অনেক সময় তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করিতেন। বলরাম আচার্য্য তাঁহার অপূর্ব্ব ভগবৎ-প্রীতির জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। একদিন তিনি হরিদাসকে লইয়া হিরণ্য মজুমদারের সভায় উপস্থিত হইলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয় ভ্রাতা হরিদাসকে দর্শন করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হরিদাস উপবেশন করিলে, কোন পণ্ডিত হরিদাসের সঙ্গে হরিনামের মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। হরিদাস হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলে জীবের হৃদয়ে যে ভক্তি-প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহাই হরিনাম গ্রহণের ফল।" সেই পণ্ডিতের সঙ্গে ঐরূপ প্রসঙ্গ চলিতেছে, এমন সময়ে জমিদারদিগের গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন কর্ম্মচারী সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই লোকটা বলে হরিনামেই মানুষ মুক্তি লাভ করিবে, লোকটা ভাবুক।" ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিদাস বিনীতভাবে নামগ্রহণের উপকারিতা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যদি হরিনামে মানবের নীচতা ঘুরিয়া চায় তাহা হইল আমি নাক কাটিয়া ফেলিব।" ভক্ত হরিদাস অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "হরিনামে যদি মানব মুক্তি লাভ না করে তবে আমিও আমার নাক কাটিয়া ফেলিব।"

ভক্তের প্রতি গোপাল চক্রবর্ত্তীর এ প্রকার ব্যবহার দর্শনে সভাস্থ সকলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন

দাস তাঁহাদের কর্ম্মচারী গোপাল চক্রবর্ত্তীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দান করিলেন।

সে-সময় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব হরিনাম-সংকীর্ত্তনে সকলের প্রাণে সুধা বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচারবার্ত্তা সকল দিকেই ঘোষিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্ত হরিদাসের কর্ণে এ বার্ত্তা প্রবেশ করিলে তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। গৌর তাঁহার মুখমণ্ডলে অনুপম জ্যোতি ও তাঁহার ভক্তিভাব দর্শন করিয়া, তাঁহাকে ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন। হরিদাস যবন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সচ্চরিত্র, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ভক্তি প্রদান করিতেন। একবার শ্রীবাসের বাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ হয়। এই উপলক্ষে ভক্তেরা তাঁহাকে নানা উপচারে অভিষেক করেন। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে সেদিন তাঁহার শিষ্যদিগকে তাঁহাদিগের প্রার্থিত বিষয় জ্ঞাপন করিতে বলেন। হরিদাস অতি হীন বলিয়া আপনাকে মনে করিতেন, সেজন্য তিনি সকলের পশ্চাতে লুক্কায়িত ভাবে বসিয়াছিলেন। গৌরের অনুরোধে তিনি যখন সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার এ দেহ অপেক্ষা তুমিই শ্রেষ্ঠ; তোমার যে জাতি, আমারও সেই জাতি। যখন পাপিষ্ঠ যবনেরা বাজারে বাজারে ঘুরাইয়া তোমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করে, তখন আমিই তাহাদের দমনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। তোমার পৃষ্ঠে যে বেত্রাঘাত পতিত হইয়াছে, আমার পৃষ্ঠেই তাহার রেখা পাত হইয়াছে। কিন্তু তোমার ধৈর্য্য অতি অপূর্ব্ব! তুমি আঘাতকারীদিগের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে! বাপ হরিদাস, আমি সর্ব্বদাই তোমার দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। যে ব্যক্তি দিনান্তেও একবার তোমার পবিত্র সঙ্গ লাভ করে এবং তোমাকে ভক্তি করে, সে ব্যক্তি আমাকেই লাভ করিয়া থাকে।"

গৌরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিদাস ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। কিন্তু গৌরচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া ভূমি হইতে উত্থিত করিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার প্রকাশ দর্শন কর!"

—"উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥"

গৌরচন্দ্রের কথায় হরিদাসের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি প্রেমাশ্রু নয়নে ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন।

গৌর হরিপ্রেমে সদাই উন্মত্ত; তিনি যে নামের রসাস্বাদনে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন, তাহা মানবের মধ্যে বিতরণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতির সহিত কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়াই তিনি আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন গৌরচন্দ্র পরিবার সহ বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে, তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "নগরের চারিদিক ভ্রমণ করিয়া সমস্ত দিবস নরনারীর মধ্যে হরিনাম ঘোষণা কর, দিবাবসানে আমার নিকট আসিয়া প্রচার-বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।"

"হাসিয়া কহিলা প্রভু ভক্ত সবাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে॥"

গৌরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস মধুময় হরিনাম ঘোষণার জন্য বহির্গত হইলেন। নবদ্বীপের লোকেরা বলিতে লাগিল যে, "নিমাই পণ্ডিত নিজে পাগল হইয়াছে, আবার এই লোকগুলাকেও পাগল করিয়া তুলিল।" কিন্তু প্রচারকদ্বয়, লোকের সকলপ্রকার কথার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া লোকের পরিত্রাণের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়া নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রচারে, অনেক শুষ্ক হৃদয় সরসতার পথে, অনেক পাপাসক্ত মন পুণ্যের পথে, ও অনেক বিষয়াসক্ত হৃদয় বৈরাগ্যের দিকে নীত হইয়াছিল। ইঁহারা সায়ংকালে দিবসের

প্রচার-বৃত্তান্ত ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট জ্ঞাপন করিতেন। এই সময়েই নবদ্বীপের দুই পাষাণসম দুষ্ক্রিয়াসক্ত জগাই মাধাই উদ্ধার লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৌর ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পুরুষোত্তমে আগমন করেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা বঙ্গদেশে ঘোষণা করিবার জন্য নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদাস এই বার্ত্তা শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যকে জ্ঞাপন করেন। গৌরের আগমন-বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। নবদ্বীপে এই সমাচার উপস্থিত হইল। বহুদিন তীর্থপর্য্যটনানন্তর গৌর শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন, এই বার্ত্তায় চতুর্দ্দিকে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যবৃন্দ এই শুভ বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন মানসে শ্রীক্ষেত্রে গমনের প্রয়াসী হইয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে সকলে সমবেত হইলেন। অদ্বৈত-ভবনে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। যাঁহার প্রেমপূর্ণ মুখ-দর্শনে ও যাঁহার রসনা-নিঃসৃত হরিনামশ্রবণে সহস্র সহস্র লোকের চিত্তে ভক্তিধারা প্রবাহিত হইয়াছে, বহুদিন পরে সে আনন দর্শন করিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রাণপ্রদ মধুর হরিনাম শ্রবণ করিবেন, এ আশায় তাঁহাদের চিত্ত নৃত্য করিয়া উঠিল; তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গৌর-চরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া, পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য এই দলের নেতাস্বরূপ। ভক্ত হরিদাসও এই যাত্রীদিগের সাথী হইয়াছিলেন। দুই শত লোক দুর্গম পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং প্রায় বিশদিবস পরে তাঁহারা গম্য স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা নগর মধ্যে প্রচারিত হইলে, উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র

ও সার্ব্বভৌমাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় মহামান্য ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্যদিগকে দর্শন করিবার জন্য বাটীর ছাদোপরি আরোহণ করিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ দুইশত গৌরশিষ্য সারি বাঁধিয়া নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গৌর স্বয়ং প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক ভক্তদিগকে সম্ভাষণ করিলেন। তিনি সকলের দিকে চাহিলেন, কিন্তু একজনকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি কে? তাঁহার প্রাণসম হরিদাস। গৌর ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হরিদাস কোথায়?" ভক্তেরা বলিলেন, "হরিদাস আপনাকে অত্যন্ত হীন মনে করেন, এবং সেজন্য শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম মনে করিয়া তিনি পথিপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। গৌর সমুদ্রস্নানান্তে ভক্তদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে যাইতে বলিয়া, হরিদাসকে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, হরিদাস ভূতলে পড়িয়া হরিগুণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। গৌর তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "এখানে পড়িয়া আছ কেন, আমার সঙ্গে এস।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভু! আমি পাপী ও অতি হীন।" গৌর তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যের কথা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন,। তিনি বলিলেন, "হরিদাস! তোমাতে যে পবিত্রতা আছে, সে পবিত্রতা আমাতে নাই। আমি সেইজন্য আমার নির্ম্মলতা লাভ করিবার জন্যই তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শ করি; সকল তীর্থ ও সকল যজ্ঞ তোমাতেই দর্শন করা যায়। পবিত্র হরিনাম উচ্চারণে তোমার রসনা হইতে নিরন্তর বেদধ্বনিই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তুমি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥" (চৈঃ চরিতামৃত)

গৌরাঙ্গপ্রভু ইহার পূর্ব্বেই উৎকলাধিপতির পুরোহিত কাশীমিশ্রের অনুমতি লইয়া পুষ্পোত্থানে একটি নিভৃত কুটীর হরিদাসের বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সেই কোলাহল-শূন্য নির্জ্জন কুসুমোত্থানে ভক্ত হরিদাসকে লইয়া গেলেন। পরম সাধনশীল হরিদাস এই উত্থানস্থিত নির্জ্জন কুটীর দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন। গৌর বলিলেন, "হরিদাস, এই কুটীরে বসিয়া পরমানন্দে নাম জপ কর; এবং এখান হইতে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিবে।" এদিকে ভক্তেরা স্নানান্তে সকলে প্রভুর বাস-স্থানে উপস্থিত হইলে প্রসাদান্ন উপস্থিত হইল। সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আহার করিতে বসিলেন। গৌর হরিদাসের জন্য গোবিন্দের দ্বারা প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিলেন। হরিদাসের এখন বয়ঃক্রম অনুমান ৬২।৬৩ বৎসর হইবে। নীলাচলে এই বিহগকূজিত নির্জ্জন পুষ্পোত্থানে ভক্ত হরিদাস মনের সুখে হরিনাম জপে ও কীর্ত্তনে জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করিয়াছিলেন।

গৌর যখন নীলাচলে অবস্থিতি করেন, তখন রূপ ও সনাতন তাঁহার সঙ্গ-লাভের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে রূপ তৎপর সনাতন আগমন করেন। দুই ভ্রাতাই নীলাচলে আগমন করিয়া হরিদাসের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা হরিদাসের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে পরম প্রীতিলাভ করেন।

গৌর প্রতিদিনই হরিদাসের কুটীরে গমন করিয়া, কিয়ৎকাল হরিনাম-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস! এই যে যবনেরা গো-হত্যা প্রভৃতির দ্বারা জীবন কলঙ্কিত করিয়া থাকে, উহাদের পরিত্রাণের উপায় কি?" হরিদাস বলিলেন, "মুসলমানেরা যে হারাম, বলিয়া থাকে,—অর্থাৎ—'হা, রাম!' এই নামাভাষেই তাহারা পরিত্রাণ লাভ করিবে। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে স্থাবর জঙ্গমাদি—উহাদেরও কি পরিত্রাণ হইবে?" হরিদাসের

হরিনামে অটল বিশ্বাস, তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "প্রভো! তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন কর, সেই ধ্বনিতে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ প্রাণীই মুক্তিলাভ করিবে।" শ্রীচৈতন্য নিরুত্তর হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে হরিদাস বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলেন। ক্রমে তাঁহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তবুও মধুর হরিনাম কীর্ত্তনে তাঁহার বিরাম নাই। গোবিন্দ প্রতিদিন তাঁহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়া দিতেন। গোবিন্দ একদিন প্রসাদান্ন লইয়া আসিয়া দেখেন, হরিদাস শয্যোপরি শয়ন করিয়া ক্ষীণস্বরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন, "হরিদাস! মহাপ্রসাদ আনিয়াছি, অন্ন গ্রহণ কর।" হরিদাস ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজ আমার আহারে রুচি নাই।" এই কথা বলিয়াই কি যেন মনে ভাবিলেন, পাত্র হইতে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। গোবিন্দ সকলই বুঝিলেন। তিনি গৌরের নিকটে এ-দিনের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলে পরদিন প্রাতে গৌর সমুদ্র-স্নানান্তে হরিদাসকে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুকে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস! কেমন আছ?" হরিদাস বলিলেন, "শরীর মন্দ নহে, কিন্তু মন তেমন সুস্থ নহে। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি ব্যাধি একবার ভাল করিয়া বল দেখি?" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! আর কোন ব্যাধি নহে, আমি এখন আর নামজপের সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না; এই জন্যই প্রাণে সুখ পাইতেছি না।" গৌর বলিলেন, "এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নাম-সংখ্যা হ্রাস করিয়া ফেল, যে মধুর নাম বিতরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! আমি অতি নীচ জাতি ও অতি অধম, তোমারি কৃপাতে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। আমার এই বাসনা,

তোমার চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করি এবং তোমার চাঁদবদন সর্ব্বদা দর্শন করি; আর তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিরন্তর উচ্চারণ করিয়া এ অধম জীবন সফল করি। প্রভো! আমার মনে হইতেছে তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে, ও-দৃশ্য আমায় না দেখিতে হয়; আমি যেন তোমার চাঁদবদন দেখিতে দেখিতে এ দেহ ত্যাগ করিতে পারি!" হরিদাসের এই সকল করুণ বাক্য শ্রবণে গৌরচন্দ্রের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "হরিদাস! আমার যা কিছু কার্য্য, যাহা কিছু সুখ সকলই তোমাকে লইয়া,—আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার উচিত নয়।" হরিদাস, গৌরের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি অতি অধম; আমার মস্তকের শিরোমণি, এমন কত ভক্ত তোমার লীলার সহায় হইবে। আমার ন্যায় সামান্য একটি কীট মরিয়া গেলে তোমার লীলার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। তুমি ভক্তবৎসল, অবশ্য তুমি আমার বাসনা পূর্ণ করিবে।" এদিকে বেলা অধিক হইয়া আসিল; গৌর স্নান ও ভোজনের জন্য বাসায় গমন করিলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, হরিদাসের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। পরদিন প্রভাতে তিনি ভক্তগণসঙ্গে হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস সকলের চরণ বন্দনা করিলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস! খবর কি?" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! তুমি যেমন রেখেছ, আমি তেমনই আছি।" শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও তদীয় ভক্তগণ দেখিলেন, হরিদাসের জন্য যেন এক জ্যোতির্ম্ময় শান্তিরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে! এ মর্ত্ত্যধাম তিনি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়া সে রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। যে মধুর হরিনাম তাঁহারা জীবনের সম্বল করিয়াছিলেন, এখন সেই বিশ্ববিজয়ী ভগবানের নাম হরিদাসের শয্যার চারিদিক বেষ্টনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের রবে যেন পুরুষোত্তমের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৌরের পরিকরদিগের মধ্যে রামানন্দ রায়, সার্ব্বভৌমাচার্য্য

প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিরা মুমূর্ষু হরিদাসের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভক্তের জীবন্ত ছবি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং যেন শতকণ্ঠে তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণ-বায়ু এখনও দেহ ছাড়িয়া যায় নাই। ভক্তেরা একে একে সেই ভক্তাত্মার চরণ বন্দনা ও চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

আর বিলম্ব নাই; হরিদাসের প্রার্থনায় গৌরচন্দ্র সজলনয়নে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। হরিদাস ক্ষীণ হস্তে প্রভুর দুইখানি চরণ নিজ বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন; এবং সেই অনুপম মুখের জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চক্ষের পলক আর পড়িল না—রসনা হইতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রসনা একেবারে নীরব হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমভক্ত হরিদাসের অমর আত্মা অনন্তধামে চলিয়া গেল।

গৌর হরিদাসের মৃত তনু কোলে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপর মৃতদেহ বিমানে স্থাপন করা হইল। গৌর ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাগরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। মহাপ্রভু শববাহীদিগের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। চিরপ্রবাহিত সাগর-জলে তাঁহারা মৃত শরীর স্নান করাইলেন। গৌর বলিলেন, "আজ হইতে সাগরের জল মহাতীর্থরূপে পরিণত হইল।"

"হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল॥"

তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তদীয় শিষ্যেরা যবন হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। তৎপর তাঁহার অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিয়া কৌপীন ও প্রসাদান্ন দিয়া সাগরতীরে বালুকাভূমি খনন করিয়া মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। গৌর নিজহস্তে মৃতদেহের উপর বালুকা প্রদান করিয়া তাহা আবৃত করিয়া ফেলিলেন। দেহ সমাধিস্থ হইলে "হরিবোলের" ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত

হইয়া উঠিল। হরিদাস সেই জগন্মাতার ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ কিছুকাল সমাধির চারিদিকে কীর্ত্তন করিয়া, সাগর-জলে স্নানাবগাহন পূর্ব্বক, পুনরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন।

পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ মানবসমাজের চিরন্তন প্রথা। হরিদাস স্বর্গারোহণ করিলে, গৌরসুন্দর উৎসব করিবার জন্য সিংহদ্বারের পসারীদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন দেখিয়া, পসারীরা তাঁহার অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আপনাদিগের বিক্রয়ের দ্রব্যাদি প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে স্বরূপ গোঁসাই প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া, আর চারিজন বৈষ্ণবের সঙ্গে ভিক্ষা সংগ্রহে রত হইলেন। হরিদাসের নামে তাঁহারা প্রচুর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় বহু লোকে নিমন্ত্রিত হইল। নির্দ্ধারিত দিবসে সকলে সমবেত হইয়া ভোজন করিতে বসিলে, প্রভু তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। গৌরের হাত বড় প্রশস্ত, তিনি একজনের পাতে প্রায় চারি পাঁচজনের ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিতে লাগিলেন। সকলেই মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলেন। এই মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যদেব প্রাণসম পরম ভাগবত হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "সকলে হরিদাসের জন্য জয়ধ্বনি কর" ;—এই বলিয়া তিনিও প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে জয় জয় রবে হরিদাসের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

"জয় হরিদাস বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ॥"

রামানন্দ রায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যার মধ্যে রাজা ভবানন্দ নামে করণবংশীয় এক সাধুপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ, বাণীনাথ ও রামানন্দ ভিন্ন অন্য দুইজনের নামের উল্লেখ দেখা যায় না। ভবানন্দ উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী হইয়া সম্মানের সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। গোপীনাথ ম্যালজ্যাঠা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, বাণীনাথও তদ্রূপ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রামানন্দ সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং রাজ্যশাসনের গুরুতর ভার মস্তকে ধারণ করিয়াও তিনি ভদবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও ভগবৎ প্রেম একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল। পরমভক্ত ও পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণাপথে ভ্রমণের জন্য বহির্গত হন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, রামানন্দের পরিচয় প্রদান করেন। গৌর রামানন্দের কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিবার মনস্থ করেন। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া গোদাবরী-তীরে উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-তীরস্থ সুরম্য বনরাজী ও তদীয় নির্ম্মল জল দর্শনে তাঁহার মনে বৃন্দাবনের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল-সলিলা গোদাবরী যমুনা ও তাহার তীরস্থ ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষসমূহ বৃন্দাবনের

বন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বৃন্দাবনের স্মৃতিতে তাঁহার মন যেন উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; গোদাবরী-তীরস্থ বনরাজির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি আনন্দে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই স্থানের নাম বিদ্যানগর। গৌর অরণ্যের মধ্যে নৃত্য-কীর্ত্তনে রত রহিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে বাদ্যধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া দোলারোহণে আগমন করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে বাদকেরা বাজনা বাজাইতেছে, এবং ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সকলে নদীতীরে উপনীত হইল। দোলারোহী ব্যক্তি জলে নামিলে ভৃত্যেরা তাঁহার অঙ্গমার্জ্জনাদি করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। গৌর তখন নদীতীরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্ত সার্ব্বভৌমের মুখ হইতে রামানন্দ রায়ের যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, ইনিই সেই রামানন্দ রায়। রামানন্দও স্নানাবগাহনের পর দেখিলেন, একটি সুন্দর গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ বৃক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর রূপলাবণ্য ও তাঁহার অপূর্ব্ব মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া তিনি সদলে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। এবং তাঁহাকে অসামান্য পুরুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

"হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদিতর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥

সূর্য্য-শত-সম-কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিল করিল দণ্ডবৎ চমৎকার॥"

রামানন্দ রায় গৌরের চরণে প্রণাম করিলে, তিনি রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই রামানন্দ রায়?" রামানন্দ বিদ্যানগরীর রাজা হইলেও তিনি বিনয়ের অবতারস্বরূপ ছিলেন। রামানন্দ বিনীতভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই অধম শূদ্র রামানন্দই বটে!" তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, আর বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য যে আপনার সহিত আজ আমার সাক্ষাৎ হইল।" ভক্তের সঙ্গে ভক্তের মিলন অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিচয় পাইলেন। তখন উভয়ে উভয়ের চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। উভয়ের হৃদয় হইতে প্রেমের ফোয়ারা উত্থিত হইতে লাগিল। উভয়ের রসনা হইতে হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; উভয়ের চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল।

রাজা রামানন্দের সমভিব্যাহারীরা সকলে সমবেত হইয়া এই চমৎকার দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যের অল্প বয়স কাঁচাসোনার ন্যায় বর্ণ ও তাঁহার মুখের স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অপরন্তু তাঁহাদের রাজা রামানন্দ রায় একজন সন্ন্যাসীর নিকট যেন বালকের ন্যায় তাঁহার চরণে নিপতিত হইতেছেন। ইহাই তাহাদের নিকট এক বিস্ময়কর ঘটনা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দ কিছুক্ষণ পরস্পর প্রেমালিঙ্গন ও হরিকথা কথনের পর উভয়ে নীরব হইয়া বসিলেন। চৈতন্যদেব রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে আপনার গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও আপনার অপূর্ব্ব কৃষ্ণানুরাগের কথা বলিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন, আজ তাই আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া, আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার প্রাণ কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছে, আপনি

পরম ভাগবত।” রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ হইতে তাঁহার প্রশংসার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও অধমের উদ্ধারের জন্যই আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি বিষয়ী, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আজ যে শত শত লোক আমার সঙ্গে আসিয়াছে ইহারা সকলেই আপনাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আপনার মুখনিঃসৃত হরিনামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ইহাদের পরিত্রাণ হইবে। ঐ শুনুন, কত লোক হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে। এ কি সামান্য মানুষের গুণে সম্ভবে? আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম।”

“কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুই রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥”

* * *

“আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥”

রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এইরূপ কথা চলিতেছে, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ চৈতন্যকে তাঁহার বাটীতে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। রামানন্দ রায় বলিলেন, “যদি অধমকে কৃপা করিতে এখানে আগমন করিয়াছেন তাহা হইলে, ছয় সাতদিন এখানে অপেক্ষা করুন। আপনার সহিত হরিকথাপ্রসঙ্গে জীবনকে শীতল করি।” শ্রীচৈতন্য রামানন্দ রায়ের কথায় বিদ্যানগরীতে কয়েকদিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করি।” রামানন্দ তৎপর তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বাদকেরা বাজনা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে রামানন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তিনিও রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। অবশেষে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনার জন্য উভয়ে একটি নির্জ্জন কুটীরে উপবেশন করিলেন। শ্রীচৈতন্য রামানন্দ রায়কে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দান করেন। এখানে তাঁহাদের আলোচনার বিষয় চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার॥

প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।

প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥

প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, দাস্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু কহে, এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে, বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

ইহার মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

প্রভু কহে, আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥

রায় কহে, তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমেব উপমা॥"

এইরূপ আলোচনায় সেদিন সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাত হইলে, রায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি দিনদশেক এখানে অবস্থিতি করিয়া আমাকে কৃপা বিতরণ করুন।"

এই বলিয়া রামানন্দ রায় বাড়ী গমন করিলেন। আবার সায়ংকালে উভয়ে মিলিত হইয়া নিভৃত গৃহে উপবেশন করিলেন। প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। এখানেও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত হইল।

"প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি॥

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তি-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্তশিরোমণি॥

গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥

কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥

ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান সবার প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্য লীলা-রস॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥"

এইরূপে দশরাত্রি চৈতন্যদেবের সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথন হইয়াছিল। চৈতন্য রামানন্দকে বলিলেন, "এখানে আসিয়া তোমার নিকট কৃষ্ণতত্ত্বের নূতন কথা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।" রামানন্দ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "প্রভো! তুমি যেমন বলাইয়াছ, আমি তেমনই বলিয়াছি। তুমি নিজের কথাই আমার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছ, এই মাত্র।"

"এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥"

দশ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেবের বিদায়ের সময় রামানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। কথিত আছে, তিনি সে সময় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রেমভরে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহার চেতনা উৎপাদন করিলেন, এবং তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠিয়া, তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন, "আমি এখন নীলাচলে চলিলাম; তুমি বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আমার নিকট গমন করিবে। উভয়ে হরিকথা-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তেরা অনেক সময় সাহিত্যালোচনায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। রূপ, সনাতন, নরোত্তম দাস প্রভৃতি নাটক, কবিতাদি রচনা করিয়া, ভাষার পুষ্টিসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন।

রামানন্দ রায়ও ধর্ম্মের মধুর ভাব সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচারের জন্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীচৈতন্যের অনুগত শিষ্য প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে কৃপা করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা দিন্।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "তুমি রায় রামানন্দের নিকট গমন কর। তিনিই তোমাকে এ বিষয়ে সুন্দররূপ বুঝাইতে পারিবেন।" প্রদ্যুম্ন মিশ্র গুরুদেবের কথা শ্রবণ করিয়া রামানন্দের ভবনে গমন করিলেন। রায় তখন বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার ভৃত্য মিশ্রকে বসিতে বলিলেন। মিশ্র 'রায় কোথায়' জিজ্ঞাসা করাতে, ভৃত্য বলিল, "তিনি বাগানে দুইটি মেয়েকে নাটক শিখাইতেছেন।" বৈষ্ণব-লেখকেরা বলেন, "রায় সে সময় নাটক রচনা করিয়া দুইটি অল্পবয়স্ক মেয়েকে এই নাটক অভিনয় করিবার শিক্ষা দান করিতেন, কেবল তাহাই নহে তিনি এই দুইটি মেয়েকে স্নান করাইয়া দিতেন এবং তাহাদিগের অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দিতেন; ইহাতেও তাঁহার চিত্তের কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইত না।" উচ্চদরের ভগবদ্ভক্তদিগের পক্ষে কিছু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রায় রামানন্দ যেরূপ ভক্ত ছিলেন, তিনি যে এ-সকল প্রলোভনের অতীত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই।

মিশ্র অনেকক্ষণ রামানন্দ রায়ের বাটীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রায় আর উদ্যান হইতে গৃহে আসেন না। তখন তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে ভৃত্য বাগানে গিয়া রামানন্দকে মিশ্রের আগমন-বার্ত্তা অবগত করিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাড়ীতে আগমন করিয়া মিশ্রের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্রও রামানন্দের প্রতি যথারীতি ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু সেদিন আর যাইবার উদ্দেশ্যের বিষয় কিছু উল্লেখ না করিয়া অন্যান্য কথার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কয়েকদিন পরে মিশ্র শ্রীচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি মিশ্রকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন রায়ের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব কেমন শিক্ষা করিলে?" মিশ্র সেদিনকার সকল ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "রামানন্দ যে নারী দুইটিকে নাটক শিক্ষা দেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের মধ্যে কোন মলিনতা স্পর্শ করে না।" তিনি রামানন্দের চিত্তের নির্ম্মলতা বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "কাষ্ঠের পুত্তলিকা দেখিয়া আমার মনেও বিকার উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু রামানন্দের মন সকল অবস্থায় অবিকৃত থাকে।" প্রভুর মুখে রায়ের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া প্রত্যুম্ন মিশ্র মনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য রামানন্দের নিকট গমন করিলেন। রামানন্দ মিশ্রকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। তৎপর তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র বলিলেন, "আমি আপনার নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি।" রায় তাঁহার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য, আপনার ন্যায় মহাপুরুষ আমার নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।" অবশেষে এক নিভৃত গৃহে বসিয়া রায় কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামানন্দ ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। দিবা অবসান হইয়া আসিলে, রায় কথা বন্ধ করিলেন। মিশ্র কৃষ্ণপ্রেমের নব নব তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া রামানন্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যুম্নের বিদায়কালে রামানন্দ "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথারসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দুঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি কাহা জানে দিন শেষে॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণ-কথা করিল বিশ্রাম॥"

প্রদ্যুম্ন গৃহে গমন করিয়া ভোজনাদির পর সায়ংকালে শ্রীচৈতন্যের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিশ্র, রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা কিরূপ শ্রবণ করিলে?" মিশ্র বলিলেন, "প্রভো! আপনার কৃপায় আজ রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে। রামানন্দ মানব-দেহ ধারণ করিলেও, তিনি যেন কৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া, প্রদ্যুম্ন বলিলেন, "প্রভো! রায় একটি কথা আমাকে বলিয়াছেন যে, কেহ যেন আমাকে কৃষ্ণ-বক্তা বলিয়া মনে না করেন, আমি যাহা বলি, তাহা গৌরচন্দ্রই আমার মুখ দিয়া বলাইয়া থাকেন। আমি তাঁহার হস্তের বীণাযন্ত্রের ন্যায়—তিনি যেমন বাজান, আমি তেমনি বাজি।"

"রামানন্দ রায় কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথাবক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥"

রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরমভক্ত রূপ ও সনাতনের নাম এদেশে কাহারও অবিদিত নাই। ইঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পিতার নাম কুমার দেব। রূপ-সনাতনের উৰ্দ্ধতন পূৰ্ব্বপুরুষেরা বঙ্গদেশবাসী ছিলেন না। কুমার দেব বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ নামে এক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে যশোহর জেলার অন্তর্গত ফতয়াবাদ নামক স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। অবশেষে তিনি সেই স্থানেই আপনার বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন। কুমার দেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, সনাতন ও বল্লভ, এই ফতয়াবাদ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। বল্লভের আর এক নাম অনুপম। ইনি এই নামেই বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত। কুমার দেব অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ধৰ্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে অনেকেই তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু জাতিভেদের বন্ধনে তিনি আপনাকে এমনই করিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি কখন কোন মুসলমানের মুখ দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। যাহাই হউক, তাঁহার জীবনের ধৰ্ম্মনিষ্ঠার প্রভাব রূপ-সনাতনের মধ্যে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

রূপ-সনাতন বাল্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের তাঁহাদিগের পুস্তকাদিই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণস্থল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ মুসলমানাধিকৃত ছিল, এবং সৈয়দ হুসেন সা তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় নগরে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গৌড়াধিপতি রূপ-সনাতনের বিদ্যাবুদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। সনাতন মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং রূপের উপর প্রধানতম রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। উভয়েই বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কার্য্যশীল লোক ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের কার্য্যকুশলতায়, হুসেন সার ভাগ্যলক্ষ্মীও সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপতি এই সুযোগ্য কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়া উভয়কে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতন রাজানুগ্রহে ক্রমে বিশিষ্ট রূপ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের জন্মস্থান ফতয়াবাদে গমন করা আর সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। এজন্য তাঁহারা গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে আপনাদিগের বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া রামকেলিতে নূতন বাসভবন নির্ম্মাণ করেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগের দেশস্থ অনেক লোক আনাইয়া রামকেলিতে তাঁহাদের স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কি বিচিত্র গতি! রূপ-সনাতন ধনরত্নের মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়কার্য্য হইতে একটু অবসর পাইলেই ধর্ম্মচর্চ্চা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। রাজকার্য্যের গুরুতর দায়িত্ব মস্তকে করিয়াও ইঁহারা পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং "হংসদূত" ও "পদ্যাবলী" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাল্যাবস্থা হইতেই ইঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। ভক্তাত্মারা হৃদয়ের প্রীতি লাভ করিবার জন্য রামকেলিতে আপনাদিগের বাসভবনের নিকট কদম্ব-তরুকুঞ্জপরিবেষ্টিত স্থানে দুইটি খাদ কাটাইয়া উহা সলিলরাশিতে পূর্ণ করিয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে উহাদের নামকরণ

করেন। এই রমণীয় স্থানে বসিয়া তাঁহারা হরিনাম কীর্ত্তনে ও ধ্যানে আত্মার তৃপ্তি সাধন করিতেন। মহাত্মা শ্রীচৈতন্য যখন হরিপ্রেমামৃতরসে বঙ্গদেশকে পরিপ্লাবিত করিতেছেন, তখন রূপ-সনাতন, তাঁহার রসপূর্ণ জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দিকে বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও সেই প্রেমিক-চূড়ামণি চৈতন্যের অমৃতময় উপদেশানুসারে চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগের ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং বিষয়কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও ভগবৎ-প্রাণ হইয়া, কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, সেজন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করেন।

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রোঽপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥"

"অন্য পুরুষে অনুরক্তা নারী যেমন সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাহার ভালবাসার পাত্রের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া কার্য্য করে, সেরূপভাবে বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তোমরা ভগবৎপ্রেমানন্দ-রসপানে চিত্তকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।"

রূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যের এই প্রাণপ্রদ অমূল্য উপদেশবাণী প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে তৎপর হইলেন।

চৈতন্যদেব কিছুদিন নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া, বৃন্দাবন-দর্শন-মানসে কয়েকজন শিষ্যসহ বহির্গত হইলেন। তাঁহারা মধুর হরিনামের ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত করিয়া, গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে চারিদিকে যেন মলয় পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, শুষ্ক মরুতে প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল। গৌরাঙ্গের রূপমাধুরী দর্শনে ও তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর হরিধ্বনি শ্রবণে রামকেলিবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিল। রামকেলি গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত; এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস।

ব্রাহ্মণেরা ত হরিনামের স্রোতে আপনাদের অঙ্গ ঢালিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু গৌরের এমনই মোহিনী শক্তি যে, যবনেরা পর্য্যন্তও গৌরমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দূর হইতে নতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

"হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর রায়।
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার।
নির্ভয় হইয়া সর্ব্ব লোক বলে হরি।
দুঃখশোক ঘর দ্বার সকল পাশরি॥"

ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন-বার্ত্তা গৌড়াধিপতির কর্ণগোচর হইল। মুসলমান রাজা পাছে তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারী গৌরকে স্থানান্তরিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। হুসেন সা কেশব বসু নামক তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া গৌরের আগমনসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি ভয়ে গৌরের প্রভাব বিশেষ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "তিনি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র, দুই চারিজন শিষ্য লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান।" কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই তিনি নগর-কোতয়ালের নিকট হইতে গৌরের প্রভাবের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি কেশব বসুর নিকট হইতে গৌরের বার্ত্তা এইরূপ শ্রবণ করিয়া, তৎপর দবির খাঁনকে আহ্বান করিলেন; তিনি গৌরের অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "শত শত লোক তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিতেছে—তাঁহার চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দিতেছে—এমন লোকের আগমনে আজ আপনার দেশ ধন্য হইল।" হুসেন সা দবির খাঁনের নিকট হইতে গৌরের প্রতাপের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি বেতন দিয়া লোককে বশীভূত করিতে পারি না, আর ইনি এক কড়া কড়ি না দিয়া এত লোককে যে বশীভূত করিয়াছেন; ইনি যে দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক তাহাতে কোন

সংশয় নাই।" এই বলিয়া এই নবীন সন্ন্যাসী যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে হরিনাম প্রচার করেন, কর্ম্মচারীদিগকে এই আদেশ প্রদান করিলেন।

রূপ-সনাতন দুই সহোদর নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন। সৈয়দ হুসেন সা, ইঁহাদের দুই ভ্রাতার দুইটি যাবনিক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। রূপের নাম হইয়াছিল দবির খাঁন ও সনাতনের সাকার মল্লিক। ইঁহারা সাধারণতঃ এই দুই যাবনিক নামেই নবাব-সরকারে অভিহিত হইতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রূপ-সনাতন অনেক দিন হইতেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। এখন রামকেলিতে তাঁহার আগমনে ইঁহাদের মনে আর আনন্দের সীমা ছিল না; যাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারা অতুল বিভবের মধ্যে হরিপ্রেমানুরাগী হইয়া জীবন কাটাইতেছিলেন, আজ তাঁহাদের জীবন-পথের সেই পথপ্রদর্শককে নিকটে পাইয়া, তাঁহার দর্শন লাভে পরমানন্দ লাভ করিবেন বলিয়া, দুই ভ্রাতায় গভীর নিশীথ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য বহুদিন হইতেই তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন —তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকেই দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, তোমাদিগকে দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব!" সেই গভীর নিশীথ সময়ে ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। রূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যের অপরাপর শিষ্যদিগের চরণ স্পর্শ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। চৈতন্য তাঁহাদিগের দবির খাঁন ও সাকার মল্লিকের পরিবর্ত্তে "রূপ-সনাতন" নামকরণ করিয়া সকলকে বলিলেন, "আজ হইতে তোমরা সকলেই এই নামে ইঁহাদিগকে ডাকিবে।"

ভক্তেরা আবার হরিনামের মধুর রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। সৈয়দ্ হুসেন সার দুই প্রধান কর্ম্মচারী আজ বিশেষভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

যে অনল তাঁহাদের হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন ও তাঁহার উপদেশে সে অগ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এখন সংসার-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিরূপে গৌর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা দিন-যামিনী যাপন করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহাদিগের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিল।

গৌর যেখানেই যাইতেন, সেইখানেই বহু জনতা হইত। রামকেলিতে আগমনাবধি তাঁহার দর্শন লাভের জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। গৌর একটু নির্জ্জনতা লাভ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরিনামামৃত রসে প্রাণ শীতল করিবেন, গমনকালে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার আরাধ্য দেবতার মোহন মূর্ত্তি দর্শনে চিত্তকে ভাবরসে নিমগ্ন করিবেন—এই তাঁহার বাসনা; কিন্তু শত শত লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিলে তাঁহার সে বাসনা কিরূপে পূর্ণ হইবে? এইজন্য তিনি সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন—তিনি বৃন্দাবন না যাইয়া, পুনরায় নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রূপ প্রথমেই বিষয়ের মোহজাল ছিন্ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করিয়া ফেলিলেন, এবং চৈতন্যদেবের অনুসন্ধানে এক ভৃত্য প্রেরণ করিলেন। যখন শুনিলেন, তিনি পুনরায় বৃন্দাবনদর্শনমানসে আবার সেই দিকেই গমন করিয়াছেন, তখন রূপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং যাইবার সময় সনাতনকে একখানি পত্রদ্বারা সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন।

রূপ চলিয়া গেলেন। এদিকে সনাতনও ঐ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী, পাতসার দক্ষিণ হস্ত। সনাতন দেখিলেন, তিনি যদি আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া হুসেন সার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন না; তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। সনাতন রাজকার্য্যে না গিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া, গৃহে বসিয়া, পণ্ডিতদিগের সহিত ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের আলোচনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর সনাতনের অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট বৈদ্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বৈদ্য সনাতনের কোন প্রকার পীড়ার লক্ষণ না দেখিয়া, পাতসার নিকট তাহা জ্ঞাপন করিলেন। হুসেন সা কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে রূপ বিষয়-কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়াছেন; সনাতনেরও কার্য্যের প্রতি উদাসীনতা! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাতসার উপস্থিতিতে সনাতন ও অন্যান্য সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন। হুসেন সা বলিলেন, "সনাতন! তোমার কোন অসুখ হয় নাই, অথচ তুমি কার্য্যে না গিয়া গৃহে বসিয়া সময় কাটাইতেছ; তোমা ভিন্ন আমার কাজকর্ম্ম ভালরূপ চলিতে পারে না; তোমার এক ভাই ত গোপনে চোরের মত চলিয়া গেল, তোমার কি অভিপ্রায় বলিতে পার?"

সনাতনের মন কি আর এ সংসারে আছে—তিনি বিষয়ের অতীত হইয়াছেন; লোক-ভয় চলিয়া গিয়াছে। তিনি নির্ভয়চিত্তে বলিলেন, "রাজন্! আমার দ্বারা আপনার কার্য্য চলিবে না, আমার আশা পরিত্যাগ করুন।" সৈয়দ হুসেন সা তখন কোন যুদ্ধ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সুপণ্ডিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন সনাতনকে লইয়া অন্যত্র যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। এ অবস্থায়

তাঁহার কর্ম্ম-পরিত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং সনাতনকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সে আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। পাতসা সনাতনকে বন্দিদশায় রাখিয়া, বিদেশে সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে রূপ, সনাতনের কারারুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—'শ্রীচৈতন্যের সহবাসে তিনি অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এবং তাঁহার হরিভক্তিবিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার ও নবজীবন লাভের পথ উন্মুক্ত হইতেছে।' রূপ সেই পত্রে আরো লিখিয়াছেন যে,—'তিনি আসিবার সময় মুদীর হস্তে দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছেন, কারাউন্মোচনের জন্য আবশ্যক হইলে ঐ টাকা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।' রাজবন্দী সনাতনের হস্তে ভ্রাতার চিঠি উপস্থিত হইল। সনাতন রূপের পত্র পাঠে চৈতন্যের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, বন্ধন-পাশ হইতে উন্মুক্ত হইবার জন্য বিধিমতে যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, মিঞা সাহেব! তুমি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত; কোন ব্যক্তির উপকার করিলে, অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। মিঞা সাহেব! আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি, কিন্তু এখন আমাকে মুক্ত করিয়া তুমি পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ কর। আর সেজন্য আমি তোমায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি।" কারারক্ষক সনাতনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিলে, আমাকে পাতসার নিকট বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে

হইবে।” সনাতন তদুত্তরে বলিলেন, “রাজা প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, তিনি সমরক্ষেত্র হইতে জীবন লইয়া প্রত্যাগত হইবেন, কিনা সন্দেহস্থল; আর যদিও তোমাকে ইহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি বলিবে যে, স্নানের সময় গঙ্গার গভীর জলে প্রবেশ করিয়া তিনি আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন।” সনাতন জানিতেন, অর্থের জন্য মানুষ বহুল স্থলে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকে; তিনি সেজন্য মুদীর নিকট হইতে সাত সহস্র মুদ্রা আনাইয়া কারাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিলেন। মিঞা সাহেব এবার আর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, সানন্দচিত্তে টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন, এবং গভীর রজনীতে রাজমন্ত্রীর সংকল্পসিদ্ধির জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহাকে জাহ্নবীর পরপারে লইয়া গেলেন। সনাতন প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বৃক্ষলতাদিপূর্ণ বনের ভিতর দিয়া, গৌরসুন্দরের মধুর সহবাস লাভ করিবার জন্য ধাবিত হইতে লাগিলেন। যাইবার সময় ঈশান নামক একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইলেন। সনাতন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতে পাতরা নামক এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভূয়া নামক এক দস্যু তাহার কয়েকটি অনুচরের সহিত বাস করিত। সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে কোন পথিক উপস্থিত হইলে, তাহার নিকট কোন অর্থ আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য এই ভূয়ার একজন গণক ছিল। সনাতন ঈশানের সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে, দস্যুপতি গণকের দ্বারা গণাইয়া জানিলেন, ঈশানের হস্তে আটটি মোহর আছে। গণনার ফল শ্রবণ করিয়া ভূয়ার মনে খুব আনন্দ হইল, এবং সে নবাগত ব্যক্তিদিগের বিশেষরূপে আতিথ্য-সৎকারে প্রবৃত্ত হইল। ভূয়ার যত্ন দেখিয়া সনাতনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ঈশানকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নিকট কি কোন অর্থ আছে?” ঈশান বলিল, “আমার নিকট সাতটি মোহর আছে।” সনাতন তাহার নিকট হইতে

মুদ্রা কয়েকটি লইয়া দস্যুর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে এই জঙ্গল পার হইয়া যাইবার সহায়তা কর।" দস্যু একটু হাস্য করিয়া বলিল, "আটটি মোহরের স্থানে সাতটি পাইলাম"—এই বলিয়া, সে সনাতনের সঙ্গে একটি লোক দিয়া, তাঁহাকে জঙ্গল অতিক্রম করিয়া দিতে বলিল। লোকটি সনাতনকে লইয়া জঙ্গল ও পাহাড় পার করিয়া লইয়া গিয়া পথ দেখাইয়া দিল। সনাতন ঈশানকে সঙ্গে লইয়া চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কি আর অধিক মোহর আছে?" ঈশান বলিল, "তাহার নিকট আর একটি মোহর আছে।" সনাতন তখন তাহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এ কাল যবন কেন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ? তোমাকে আর আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না, আমি একাকীই গমন করিব, তুমি ফিরিয়া যাও।" ঈশান সনাতনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

সনাতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে হাজিপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিযাপনের মানসে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হাজিপুরে হুসেন সার কর্ম্মচারীরা বাস করিতেন। সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত সে সময় ঘোটকের মূল্যস্বরূপ তিনলক্ষ টাকা দিল্লীর পাতসাকে দিবার জন্য বাহির হইয়া হাজিপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দূর হইতে হরিনামের মধুর রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। স্বর শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে উহা সনাতনের কণ্ঠস্বর। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখেন, যথার্থ, সনাতনই বটে। কৌপীন পরিধেয়, গাত্র বস্ত্রহীন। শ্যালকের অবস্থা দেখিয়া শ্রীকান্তের প্রাণে বড় কষ্ট হইল। তিনি তাঁহাকে সুখে রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে শীত নিবারণের জন্য তিনি তাঁহাকে একখানি শাল প্রদান করিলেন, কিন্তু সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন

না। অবশেষে শ্রীকান্তের বিশেষ অনুরোধে সনাতন একখানি ভোট-কম্বল গ্রহণ করিলেন। সনাতন হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব তথায় চন্দ্রশেখর নামক একজন ভক্তের বাড়ীতে বাস করিতেন। সনাতন দীনের বেশে, চন্দ্রশেখরের বাটীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং গৌরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে। এই নবাগত বৈষ্ণবকে ভিতরে আনিবার জন্য, গৌর চন্দ্রশেখরকে আদেশ করিলেন, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীনহীন কাঙ্গালীর বেশে দন্তে তৃণগুচ্ছ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে না করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া চৈতন্যকে বলিলেন, "কৈ, বহির্দেশে ত কোন বৈষ্ণব দেখিলাম না।" চৈতন্য বলিলেন "উঁহাকেই ডাকিয়া আন।" চন্দ্রশেখর আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যদেব সনাতনকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের চক্ষের জলে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। সনাতন চৈতন্যের চরণ ধরিয়া নিজের দীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌর, ভক্তের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "সনাতন! দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দীনতা দেখিয়া আমার বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সনাতন উপবেশন করিলে, তিনি কিরূপে বিষয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিলেন, সকলই শ্রবণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজ-মন্ত্রীর যথার্থ বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে। তখন তিনি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরাইয়া দাও।" চন্দ্রশেখর তাঁহাকে

ক্ষৌর করাইয়া, গঙ্গাস্নান করাইয়া, একখানি নূতন বস্ত্র পরিধানের জন্য প্রদান করিলেন। সনাতন তাহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন; চন্দ্রশেখর আর কি করেন, অগত্যা তাঁহার একখানি পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন; সনাতন তাহা দুইখণ্ড করিয়া, এক অংশ পরিধান করিলেন আর অপরাংশ বহির্ব্বাসরূপে ব্যবহার করিলেন। সৈয়দ হুসেন সার প্রধান কর্ম্মচারী আজ বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া যথারীতি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন—প্রকাশ্যে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন! চৈতন্যের শিষ্যেরা মাধুকরী ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বারাণসীর কোন ব্রাহ্মণ সনাতনকে আপনার বাটীতে নিত্য ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু সনাতন তাহাতে প্রস্তুত না হইয়া মাধুকরী ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি তদবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীকান্তপ্রদত্ত ভোটকম্বলখানি তখন পর্য্যন্ত তাঁহার গাত্রে ছিল। শ্রীচৈতন্য পুনঃপুনঃ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তদুপরি প্রভুর বারংবার দৃষ্টি নিপতিত হওয়াতে, সনাতন বুঝিলেন, প্রভুর উহা ভাল লাগিতেছে না; তিনি উহা পরিত্যাগের বাসনায় বাহিরে গমন করিলেন; গিয়া দেখেন, এক দরিদ্র ব্যক্তি রৌদ্রে একখানি জীর্ণ কন্থা শুকাইতে দিয়াছে। সনাতন সেই দরিদ্র ব্যক্তির সহিত আপনার ভোটকম্বলের বিনিময়ে তাহার জীর্ণ কন্থাখানি গায়ে দিয়া গৌরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সনাতনের গাত্রে ছিন্ন কন্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, "ভাল বৈদ্য কি রোগের শেষ রাখে? সুকোমল ভোট কম্বল গায়ে দিয়া কি বৈরাগ্য সাধন হয়? হরিরস-পানে প্রাণমনকে পূর্ণ করিতে হইলে, সংসারের সকল বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইতে হয়।"

"অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটখান আগে চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে
মনে কিছু যুকতি করিলা॥
ভোটকম্বলখানি, এক যে বৈষ্ণব জানি
তারে দিয়া তার কন্থাখানি
পরিবর্ত্তন করি নিল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লইল শ্লাঘা মানি॥
সেই কন্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল।
প্রভু বলে তাহা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
আলিঙ্গন উঠিয়া করিল॥
প্রভু কহে সনাতন কৃষ্ণ যে রতন ধন
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ গেহ দার বিষয় বাসনা আর,
সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়॥"

বারাণসী ধামে শ্রীচৈতন্য দুইমাসকাল সনাতনকে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া বলিলেন, "সনাতন, তুমি বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভক্তিগ্রন্থ রচনা কর।" সনাতন সে বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জানাইলে গৌর বলিলেন, "তুমি যখন লিখিতে আরম্ভ করিবে, শ্রীহরি তোমার অন্তরে শক্তি প্রদান করিবেন।" সনাতন গৌরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিয়া মাধুকরী ব্রত ধারণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং এক বৃক্ষতলে বসিয়া, ভক্তিতত্ত্বরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এখানে তাঁহার জীবনসংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন সনাতন যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার চরণে একটি সুন্দর পদার্থ সংলগ্ন হইল। সনাতন দেখিলেন, উহা স্পর্শমণি। যিনি অগাধ ধনরত্ন পশ্চাতে ফেলিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট স্পর্শমণি ও পথের সামান্য লোষ্ট্রখণ্ড উভয়ই সমতুল্য। সনাতন এই

বহুমূল্য পদার্থ যত্নে রক্ষা করা দূরে থাকুক, তিনি উহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন। একবার মনে করিলেন, কোন দরিদ্র ভিক্ষুককে উহা প্রদান করিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া, একটা খাপরার মধ্যে পুরিয়া তিনি উহা পথের এক পার্শ্বে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সে বিষয়ের অনুসন্ধানও করিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকর নামক স্থানে জীবন নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বড় দরিদ্র ছিলেন। জীবন আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের রাজ্যে নিয়মই এই, মানুষ যে-বিষয়ের জন্য সতত চিন্তা করে, যে-বিষয় লাভ করিবার জন্য সাধনা করে, অনেক স্থলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবন বহু সাধনার ফলে সিদ্ধি লাভ করিলেন। তাঁহার ইষ্ট দেবতা স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "জীবন! বৃন্দাবনে এক সন্ন্যাসী ভক্ত বাস করেন, তাঁহার নিকট স্পর্শমণি আছে, তুমি তাঁহার নিকট উহা প্রার্থনা করিলে তোমাকে তিনি তাহা দান করিবেন।" জীবন স্বপ্নযোগে এ সুখ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং সনাতনের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সনাতনের স্পর্শমণির কথা কিছুই মনে ছিল না, এইজন্য ব্রাহ্মণের স্বপ্নের তাৎপর্য্য প্রথমে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না; তৎপর উহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। জাহ্নবীর জলে স্নানার্থ গমনের সময় তিনি যে-স্থলে স্পর্শমণি পাইয়া মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লইয়া তিনি সেই স্থলে গমন করিলেন। সনাতন সেই ব্রাহ্মণকে তর্জ্জনী সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আমি স্নান করিয়াছি, আর উহা স্পর্শ করিব না, তুমি এই স্থানের মাটি খুঁড়িলেই উহা প্রাপ্ত হইবে।"

ব্রাহ্মণ মাটি খুঁড়িয়া দেখিলেন, নয়নমুগ্ধকর পৃথিবীর দুঃখদারিদ্র্যনিবারক সেই স্পর্শমণি তথায় বিরাজ করিতেছে। তিনি উহা প্রাপ্ত হইয়া সনাতনকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং তদীয় চরণে প্রণত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

ভক্ত সাধুদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত বহু লোকের হৃদয়ে আমূল পরিবর্ত্তনের সঞ্চার করিয়া থাকে। দরিদ্র জীবন সনাতনের নিকট হইতে স্পর্শমণি লইয়া যাইতে যাইতে তাঁহার মনে এক চিন্তা-তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যে-বস্তু লাভের জন্য এত লালায়িত সেই বস্তু গৃহে রাখা দূরে থাকুক, সনাতন স্পর্শ করিতেও ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। তবে ইহা অপেক্ষা এমন কি বস্তু সংসারে আছে, যাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষ এমন অনায়াসলব্ধ স্পর্শমণি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে? সনাতন নিশ্চয়ই সেই বস্তু পাইয়াছেন, না পাইলে দূরে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী ঘুরাইয়া, কি তিনি এত উপেক্ষার সহিত উহা আমাকে দেখাইয়া দিতেন। এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার আর দেশে যাওয়া হইল না। তিনি বটেশ্বর গ্রাম হইতে পুনরায় বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট উপনীত হইয়া হৃদয়ের অবস্থা জানাইলেন, এবং তাঁহার চরণ আলিঙ্গন পূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন।

"ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥
* * *
তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব।
বিনমূল্যে তাঁর পায় বিক্রীত হইব॥"

জীবন বলিলেন, "প্রভো! আমি অতি অধম, কৃষ্ণপ্রেম-ধনে আমাকে ধনী কর। আমি তোমার চরণ আশ্রয় করিলাম।" সনাতন ব্রাহ্মণের

ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণধন লাভ করা বড় কঠিন কার্য্য, তুমি ঘরে গিয়া কৃষ্ণ নাম কর। তবে যদি তুমি স্পর্শমণির মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে অনাসক্তির পথ আশ্রয় করিয়া, সেই মধুর কৃষ্ণ-প্রেমে প্রাণকে আপ্লুত করিতে পারিবে।" মানকরবাসী জীবনের অন্তঃস্তল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—সনাতনের এই কথায় তাঁহার ভাববিগলিত প্রাণ আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তস্থিত বহু সাধনের স্পর্শমণি তৎক্ষণাৎ খরপ্রবাহিতা যমুনার জলে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন।

"এতশুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে।
টান মারি ফেলি দিল যমুনামাঝারে॥"

সনাতন গোস্বামী তখন বুঝিলেন যে, জীবনের হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমলাভের জন্য যথার্থই ব্যাকুল হইয়াছে। তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। জীবনকে আপন বক্ষে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। তদবধি জীবনের বংশাবলী বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন।

এদিকে রূপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে লইয়া প্রয়াগে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন, গৌর সহস্রলোকপরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সে ভাব-তরঙ্গর ঢেউ লাগিয়া, বহু লোকের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে, হরিপ্রেমরসে মজাইয়া তুলিতেছে। রূপ ও বল্লভ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া এ অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বহু জনতা ঠেলিয়া, গৌরের চরণে পতিত হইলেন। গৌরচন্দ্র রূপের হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া তাঁহাকে সনাতনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ সনাতনের বন্দিদশার কথা প্রকাশ করিলে, গৌর যেন ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে সনাতনের কারামুক্তির কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "সনাতন শীঘ্রই কারামুক্ত হইবে, এবং আর কিছুদিন পরে সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।"

"প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন॥
অচিরাত আমা সহ হইবে মিলন॥"

প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমের নিকট শ্রীচৈতন্য বাস করিতেন। রূপ ও বল্লভ তাঁহার বাসস্থানের নিকটেই আপনাদিগের বাসা গ্রহণ করিলেন। ত্রিবেণীর পরপারে বল্লভ ভট্ট নামে একজন পরম বৈষ্ণব বাস করিতেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, গৌর তাঁহার সহিত রূপ ও বল্লভের পরিচয় করিয়া দিলেন। ভট্ট তাঁহাদিগের বিনয় ও ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তাঁহারা যে যথার্থ ভক্ত তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব এখানে দশদিন রূপকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রূপ শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহার প্রাণে ভক্তির উৎস আরো উৎসারিত হইয়া উঠিল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অমৃতময় উপদেশ সকল অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া হরিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

প্রয়াগে কয়দিবস অবস্থানানন্তর শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাইবার মনস্থ করিয়া রূপকে বৃন্দাবন দর্শনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রূপ গোস্বামী বৃন্দাবন অবস্থানকালে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে সঙ্গে লইয়া গৌড় দেশে যাত্রা করেন। যাইতে যাইতে পথে উহার কড়চা লিখিয়া রাখিতেন। অবশেষে তাঁহারা গৌড় দেশে উপনীত হইলেন। কিন্তু এখানে উপস্থিত হইবার পর, বল্লভ জ্বরবিকারে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রূপ তৎপর নবদ্বীপে আগমন করিয়া শুনিলেন, ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহাদিগের জীবন-পথের গুরু ও নেতা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শনোদ্দেশে নীলাচল যাত্রা করিয়াছেন। রূপ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও নীলাচলে

যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখন তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এইজন্য পথে চলিতে চলিতে নাটকের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং কোন সরাইয়ে উপস্থিত হইলে মনঃকল্পিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি পুস্তকখানি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও দ্বারকালীলা এই দুইখণ্ডে সমাপ্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কোন পান্থশালায় রজনীতে নিদ্রাভিভূত হইলে, তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, সত্যভামা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি নাটকখানি দুইখণ্ডে না করিয়া, এক খণ্ডেই সমাপ্ত করিবে।" রূপ ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিয়া নাটকখানি সেইভাবেই সম্পূর্ণ করিলেন।

রূপ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া, হরিদাসের আশ্রমেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গৌর প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার আশ্রমে গমন করিতেন। চৈতন্যদেব হরিদাসের আশ্রমে গমন করিলে, রূপও তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, কিন্তু তিনি রূপকে ভালরূপ দেখিতে পান নাই; হরিদাস বলিলেন, "রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন", তখন গৌর, "কেও রূপ এসেছ" বলিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। রূপ শ্রীচৈতন্যকে নাটক রচনার বিষয় সমস্ত অবগত করিলে, তিনি উহাতে আনন্দের সহিত অনুমতি দান করিলেন; এবং স্বপ্নদৃষ্ট সত্যভামার আদেশানুসারেই কার্য্য করিতে বলিলেন। রূপ সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। একদিন হরিদাসের আশ্রমে বসিয়া রূপ নাটক লিখিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, রূপ বসিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন। রূপের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। চৈতন্য লেখা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার রচিত কবিতাটি পাঠ করিলেন। কবিতাটি পাঠ করিয়া তিনি রূপের রচনাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত থাকিতে বলিলেন।

তখন রথোৎসবের সময়। সেজন্য গৌড় দেশ হইতে অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। গৌর রূপ-

গোস্বামীর সহিত প্রসিদ্ধ ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলেন। রূপও ভক্তগণের সহিত পরিচয়ের সময় আপনার স্বাভাবিক বিনয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

একদিন গৌর রায় রামানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া হরিদাসের আশ্রমে রূপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গৌর ও রায় রামানন্দ প্রভৃতিকে দেখিয়া, হরিদাস ও রূপ গোস্বামী যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

ভক্তেরা রূপের নাটক রচনা শ্রবণার্থই আগমন করিয়াছিলেন। গৌর রূপকে তাঁহার রচনা পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি লজ্জাবশত উহা পাঠ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন। গৌর বলিলেন, "লজ্জা কি, পাঠ কর!" রূপ, বিদগ্ধ ও ললিতমাধব হইতে কিছু কিছু অংশ পাঠ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার মধুর ও চিত্তবিমোহন রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সুপণ্ডিত রসজ্ঞ রায় রামানন্দ রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপ তাঁহার নাটকের মধ্যে কোন কোন স্থলে শ্রীচৈতন্যের গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া, গৌর তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু রায় রামানন্দ রূপের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গৌরকে বলিলেন, "রূপ তোমার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই।" গৌর ও তদীয় ভক্তবৃন্দ রূপের কবিতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌর রূপকে বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভক্তি শাস্ত্র রচনা ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে বলেন।

সনাতন বৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ডের বন্য পথের মধ্য দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে রক্ত ও পুঁয নির্গত হইতে লাগিল। দেহের তাদৃশ অবস্থা লইয়া তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া হরিদাসের আশ্রমে গমন করিলেন। ভক্ত হরিদাস তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। সনাতনের

মনে হইয়াছিল রথযাত্রার সময় তিনি রথচক্রের নিম্নে আপনার দেহ স্থাপন করিয়া চিরদিনের জন্য সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। হরিদাস সনাতনের মনের এই সংকল্পের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইল তখন কথা-প্রসঙ্গে তিনি হরিদাসের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, "সনাতন! যদি দেহ ত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে আমি বহুবার জীবন ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতাম; শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়।"

হরিদাসের আশ্রমে যখন সনাতনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন, কিন্তু সনাতন তাঁহার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইতে না চাহিয়া, পশ্চাদ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "প্রভো! আমি অতি নীচ, তাহাতে আমার সমস্ত গাত্র কণ্ডুতে পূর্ণ! প্রভো, এ অস্পৃশ্য পাপীকে স্পর্শ করিবেন না।" যিনি অকাতরে কত কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তিনি কি আর তাঁহার ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি প্রেমভরে সনাতনকে জড়াইয়া ধরিলেন। কথিত আছে, গৌরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া তিনি রোগমুক্ত হইয়া দিব্যকান্তি লাভ করিয়াছিলেন। সনাতন এইরূপে কিছুকাল নীলাচলে বাস করিয়া সৎসঙ্গে ও সদালাপে জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন গৌর যমেশ্বরটোটা নামক স্থানে গমন করিয়া সনাতনকে ডাকিয়া পাঠান। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে সাগর-তটস্থ প্রত্যেক বালুকণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছিল। যমেশ্বরটোটা যাইবার দুইটি পথ। একটি বৃক্ষশাখা-সমাকীর্ণ ছায়াযুক্ত সুশীতল; অপরটি উত্তপ্ত বালুকারাশিপূর্ণ। সনাতন গৌরের আহ্বানে সাগর-তটের উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন; বালুকারাশির জলন্ত অগ্নিবৎ উত্তাপে সনাতনের পদদ্বয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু

গৌর-দর্শনের আনন্দের তুলনায় তিনি এ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিলেন না। তিনি গৌরসমীপে উপস্থিত হইলে, গৌর, সনাতনকে ছায়াযুক্ত সিংহ-দ্বারের পথে না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সনাতন বলিলেন, "প্রভো! আমি সামান্য নীচ, অধম; আমি সিংহদ্বারের পথে আসিবার যোগ্য নই।" সনাতনের মধুর বাক্যে গৌর কণ্ডুরোগগ্রস্ত সনাতনকে প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিলেন।

রথোৎসব শেষ হইলে, গৌর সনাতনকে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে আদেশ করেন। সনাতনও গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিহগ-কূজিত নির্জ্জন বন ও উপবনের মধ্য দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে রূপ গোস্বামীও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। উভয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রে যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি গভীর ভগবদ্‌ভক্তি ছিল। এইজন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভক্তিগ্রন্থ-রচনায় ও লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধারের জন্য প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রভুর আদেশক্রমে গ্রন্থ রচনায় ও ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী, "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, মথুরা-মাহাত্ম্য, হংসদূত" প্রভৃতি গ্রন্থ ও সনাতন গোস্বামী, "ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস, রসামৃত-সিন্ধু" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র জীব গোস্বামী। ইনি ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিদ্যায় বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। জীব বাল্যকাল হইতে খুল্লতাত রূপ গোস্বামীর নিকট থাকিয়া ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন। ইনি কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই। যখন রূপ ও সনাতন

বৃন্দাবনে গিয়া অবস্থিতি করেন, তখন বল্লভও তাঁহাদের নিকট অবিস্থিতি করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। জীব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াই তাঁহার যশঃ বৈষ্ণবসমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। জীবও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে ষট্‌সন্দর্ভ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

"কথোক দিবস ব্যাজে বিশেষ কথন।
শুনিয়া খেদিত হৈলা শ্রীল সনাতন॥
রূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥
শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥
গোসাঞি কহেন তবে কেন নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহ বুঝিলা হৃদয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি মিলে ছল ছল আঁখি॥
শ্রীজীবগোসাঞি কৃতার্থ মানিয়া।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া॥" (ভক্তমাল।)

রূপ সনাতনের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহাদের সঙ্গে বিচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। বিনয়ের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রূপ-সনাতন তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনাদের পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। জীব গোস্বামী সে-সময় যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। অবশেষে দিগ্বিজয়ী, পণ্ডিতবর জীবের সহিতও বিচারার্থ যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রূপ-সনাতন আমার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া এই আমায় জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন।" জীব গোস্বামী বুঝিলেন, দিগ্বিজয়ী আমার খুল্লতাতগণের গভীর পাণ্ডিত্য ও তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব বিনয়ের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। জীব বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, আমি ত সামান্য, আপনি আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন।"

বিচারার্থী দিগ্বিজয়ীও তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচারে জীবই জয়ী হইলেন।

জীব দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, রূপ সমস্ত শ্রবণ করিয়া জীবের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন বিদ্যার অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে? তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, আজ হইতে আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।" রূপ, বোধ হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিরহঙ্কারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য, এই শিক্ষা দিবার জন্যই জীবের প্রতি এই শাস্তি বিধান করিলেন। রূপ তাঁহার আর মুখ দর্শন করিবেন না, এ-বাক্য জীবের প্রাণকে যেন তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি যমুনার তটে গমন করিলেন, আর মনে করিলেন যে, 'জীবন আর রাখিব না; অন্ন-জল গ্রহণ না করিয়া এ-দেহ ত্যাগ করিব।' সনাতন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর প্রতি রূপের এতাদৃশ কঠোর ব্যবস্থার কথা যখন শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি রূপের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন, "জীবের প্রতি বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?" রূপ বলিলেন, "জীবের প্রতি দয়া ব্যবহারই বৈষ্ণবের প্রধান কর্ত্তব্য।" তখন সনাতন বলিলেন, "তবে তুমি জীবের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার কেন করিতেছ?" জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া রূপ তৎক্ষণাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে আপনার নিকটে থাকিবার অনুমতি দান করিলেন। জীবও বিনয়াবনত মস্তকে রূপের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণিপাত করিলেন।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পরলোক গমনের পর জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য ও স্বার্থত্যাগ দর্শন করিয়া বহুলোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বর্ত্তমান ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকট সপ্তগ্রাম নামে এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। বিপুল বাণিজ্যের জন্য এ দেশে বহুলোকের সমাগম হইত। এই সমৃদ্ধিশালী নগরে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই প্রসিদ্ধ ধনী বাস করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় গৌড়াধিপতি সৈয়দ হুসেন সার কর-সংগ্রাহক ছিলেন। সপ্তগ্রাম অঞ্চল হইতে বাৎসরিক বিশ লক্ষ টাকা কর সংগ্রহ করিয়া, ইঁহারা বার লক্ষ টাকা রাজাকে প্রদান করিতেন, অবশিষ্ট আট লক্ষ টাকা ইঁহারা গ্রহণ করিতেন। ইঁহাদের সত্য-নিষ্ঠায় ও কার্য্য-দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়াধিপতি ইঁহাদিগকে মজুমদার উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আট লক্ষ টাকা, এখনকার তুলনায় আশী লক্ষ টাকার ন্যূন নহে।

হিরণ্য দাস অপুত্রক ছিলেন। কেবল গোবর্দ্ধন দাসের রঘুনাথ নামে একটি পুত্র ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনীর গৃহে, ইনি অতি আদরেই লালিতপালিত হইতেন। বিশেষতঃ পিতৃব্যের কোন সন্তান না হওয়াতে রঘুনাথ তাঁহারও বিশেষ স্নেহের সামগ্রী হইয়াছিলেন। এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যেও রঘুনাথের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মানুরাগ ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন দাস তাঁহাকে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগের দ্বারা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। বালক রঘুনাথ অতি মনোযোগের সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যজ্জীবনে তাঁহার গ্রন্থাদি রচনায় প্রকাশ

পাইয়াছিল। সেই সময় ভক্ত হরিদাস হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে বাস করিতেন। সাধুরা চুম্বক পাথরের ন্যায় মানবকে তাঁহাদিগের দিকে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের চিত্তকে ভগবৎ-প্রেমরসে অভিষিক্ত করিয়া ফেলেন। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র, বলরাম আচার্য্য ভবনে শিক্ষার্থ গমন করিয়া, হরিদাসের সৌম্যমূর্ত্তি, তাঁহার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ ও তাঁহার চিত্ত বিমোহন ভগবন্নিষ্ঠা দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সে-সময় জ্ঞান ও ভক্তির স্রোত যেন গঙ্গা যমুনার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। হরিভক্তির মধুর-ভাবে তাঁহার প্রাণ যেন পূর্ণ হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ সান্নিধ্যে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের কথা রঘুনাথ ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখন শান্তিপুরে তাঁহার আগমনের কথা শ্রবণ করিয়া, রঘুনাথ তাঁহার দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি শান্তিপুর যাইবার জন্য পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন। তিনি পুত্রকে যথার্থ জমিদারের পুত্রের ন্যায়ই তথায় প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথ পাল্কিতে আরোহণ করিলেন; সঙ্গে দ্বারবান্ ও অনেক দ্রব্য-সম্ভার লইয়া, বেহারারা তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল। রঘুনাথ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি রঘুনাথকে দেখিয়া বুঝিলেন, শীঘ্রই তাঁহার বিষয়-বন্ধন মুক্ত হইবে; তবুও তিনি এই যুবাকে অনাসক্তভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দান করিলেন। গৌরের ভক্তি-ভাব দর্শনে রঘুনাথের হৃদয়ে ভক্তি-ভাব আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীচৈতন্যের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু বাটীতে ফিরিলে কি হইবে, তিনি হৃদয়-মন সকলই তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের

পথ অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথের আর সংসারে মন নাই, সে মন এখন বিহঙ্গমের ন্যায় চিদানন্দ আকাশে বিচরণ করিতেছে। গৃহে আসিয়া গৌরচন্দ্রের সহবাস লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, তিনি আর কিছুতেই গৃহে স্থির থাকিতে চান না ; গোবর্দ্ধন দাস, পুত্রের গৃহত্যাগের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, পাঁচজন পাইক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পলায়নের চেষ্টা রোধ করিতে যত্নবান হইলেন। গোবর্দ্ধন দাস ইতঃপূর্ব্বেই পুত্রকে এক পরমাসুন্দরী নারীর সহিত পরিণীত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় রঘুনাথের দিন যাইতেছে, এমন সময় তিনি শুনিলেন যে, চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করিয়াছেন। এ সংবাদে নীলগিরি গমন করিয়া তাঁহার চরণ দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তিনি এই সময়েই পলায়ন করিতেন, কিন্তু কোন বৈষয়িক কারণে তাঁহাকে আবদ্ধ হইয়া এ-সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু যে প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়াছে—সংসারের কোন বস্তুই তাঁহার সে পিপাসা চরিতার্থ করিতে সমর্থ নহে। তিনি সুযোগ পাইলেই ব্যাকুল হৃদয়ে গোপনে নীলগিরি অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুনঃপুনঃ পাইকেরা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেন। রঘুনাথকে অনেকে পাগল মনে করিয়া গোবর্দ্ধন দাসকে বলিল, "তোমার পুত্র পাগল হইয়াছে, তুমি উহাকে বাঁধিয়া রাখ।" অবশেষে রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করা হইল। রঘুনাথ এ অবস্থায় হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবার জন্য "হা গৌরাঙ্গ !" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন যদিও পুত্রকে রক্ষকদিগের দ্বারা আটক করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেন, তথাপি তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে, যে আকর্ষণে তাঁহার পুত্র আকৃষ্ট হইয়াছেন, সে পথে কোন বিঘ্ন বিপত্তি অবশেষে দাঁড়াইতে পারিবে না। সে-জন্য তিনি বলিলেন, "এমন সুন্দরী

স্ত্রী ও এত ধন-সম্পত্তি যাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না, সামান্য দড়ির বন্ধনে তাহাকে আর কি আবদ্ধ করিব।"

"এ হেন ঐশ্বর্য্যে আর এ যুবতী নারী।
হেন রজ্জু ছিড়িয়াছে তারে পরিহরি॥"
"পট্ট রজ্জু দিয়া কি বান্ধিয়া রাখা যায়।
হেন বৃথা বান্ধ খুলিয়া দেহ হায় হায়॥"

গৌরাঙ্গের আদেশে সে সময় নিত্যানন্দ পাণিহাটি গ্রামে লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। বন্ধন উন্মুক্ত হইয়া রঘুনাথ পাণিহাটি গ্রামে নিত্যানন্দের নিকট গমন করিলেন। সুচতুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার মনের ভাব সকল বুঝিয়া বলিলেন, "এখন ধরা পড়িয়াছ আর কোথায় পালাইবে?" এই বলিয়া তিনি রঘুনাথকে দধি চিড়ার উৎসব করিতে বলিলেন। ধনবানের সন্তান রঘুনাথ দাস এই কথা শুনিবামাত্র ভৃত্যদিগকে তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ দধি, চিড়া, রম্ভা, চিনি, সন্দেশ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে আনিয়া তথায় স্থাপিত করিল। নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ এই মহোৎসবে আসিয়া, আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন। পাণিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিত নামে এক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি বাস করিতেন, এই দিন নিত্যানন্দ সশিষ্যে তাঁহার ভবনে সায়ংকালে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সেখানে ভক্তেরা নামকীর্ত্তনাদি করিলেন, রঘুনাথ দাসও তথায় উপস্থিত থাকিয়া, হরিভক্তদের কীর্ত্তন শ্রবণে বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলেন। রঘুনাথ দাস এই উপলক্ষে নিত্যানন্দের সেবার জন্য তাঁহার ভৃত্যের হস্তে একশত টাকা ও সাত তোলা স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। রাঘব পণ্ডিতকেও কিছু টাকা ও দুই তোলা স্বর্ণ দান করেন।

এই সকল ঘটনায় রঘুনাথের হৃদয়ে ভক্তিধারা আরো প্রবলতররূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নদীর উচ্ছ্বাস যেমন বেগে অনন্ত নীলাম্বুর দিকেই প্রবাহিত হয়, রঘুনাথের মনও সেইভাবে তাঁহার উপাস্য দেবতার

দিকেই প্রধাবিত হইতে লাগিল। চিড়ামহোৎসবের পর রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি আর অন্তঃপুরে পত্নীর নিকট না থাকিয়া, বহির্দ্দেশে শয়ন করিয়া থাকিতেন; বিষয়ে এখন তাঁহার স্পৃহা নাই—তাঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য, ও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্ত এখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় মানুষ কি আর গৃহে থাকিতে পারে? তিনি পলায়নের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে প্রহরিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অহর্নিশি পাহারা দিতেছে। রঘুনাথকে ইহাদিগের হস্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তিনি দেখিলেন যাওয়া বড় সহজ নহে, যদি ভগবান তাঁহার সংকল্পের সহায় হন, তবেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঘুনাথের মনের বাসনা পূর্ণ হইবার সময় আসিল। একদিন নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, প্রহরীরা সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। দূরে যদুনন্দন আচার্য্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যদুনন্দন রঘুনাথের গুরু। প্রায় প্রতিদিনই যদুনন্দন উষাকালে উপস্থিত হইলে, রঘুনাথ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া থাকেন। আজও রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। আজ যদুনন্দন কোন বিষয়ের অভিলাষ জানাইবার জন্য রঘুনাথের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ নিকটে আসিলে যদুনন্দন বলিলেন যে, তাঁহার বাটীতে দেব সেবার জন্য যে পুরোহিত আসেন, তিনি কয়েকদিন আসেন নাই। পূজার ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি যেন সেই ব্রাহ্মণকে পূজার জন্য আগমন করিতে অনুরোধ করেন।

এই বলিয়া যদুনন্দন রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ভবনের দিকে যাইতে লাগিলেন। রঘুনাথ বলিলেন, তিনি পুরোহিতকে বলিবেন যাহাতে তিনি আপনার গৃহে নিত্য গমন করিয়া পূজা করিয়া আসিবেন। যদুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। রঘুনাথ ভাবিলেন, এমন সুযোগ আর হইবে না ; এই মনে করিয়া তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—কেহই নাই।

রঘুনাথ যখন গোপনে গৃহ হইতে পলায়ন করেন, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নীলাচলে যাইবার সময়। রঘুনাথ ভাবিলেন রাজপথে গমন করিলে, যাত্রীদিগের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা ; অন্য পথ ধরাই শ্রেয়ঃ। এই মনে করিয়া তিনি বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে এক গোয়ালার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তথায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া, সমস্ত রজনী তথায় যাপন করার পর প্রাতে আবার বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

এদিকে যামিনী অবসান হইয়া আসিলে রঘুনাথের খোঁজ পড়িল। যদুনন্দন বলিলেন, "আমার দেব সেবার জন্য পুরোহিত পাঠাইয়া দিব বলিয়া কল্য বাটীর দিকে গমন করিয়াছিল।" তখন আর রঘুনাথের পলায়ন সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। গোবর্দ্ধন দাস প্রভৃতি সকলেই জানিতেন যে, এ সময় রথোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-দর্শনের জন্য বৈষ্ণবেরা নীলাচলে গমন করিয়া থাকেন। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যখন নীলাচলে গমন করিতেন, তখন শিবানন্দ সেন তাঁহাদের অভিভাবক স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এই জন্য শিবানন্দের নামে এক খানি পত্র দিয়া তিনি দশজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। অনুসন্ধানকারীরা দ্রুতপদে গমন করিয়া, ঝাঁকরা নামক স্থানে শিবানন্দপ্রমুখ নীলাচল-

যাত্রীদিগকে দর্শন করিলেন'। শিবানন্দ পত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন যে, রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে আগমন করেন নাই। প্রেরিত লোকেরা নিরাশ হইয়া, বাটীতে এই দুঃসংবাদ আনয়ন করিলেন। ক্রন্দনের রোলে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। পিতা ও পিতৃব্য শোকে নিমগ্ন হইলেন। জননী প্রাণসম এক-মাত্র পুত্রের জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন। যুবতী পত্নী স্বামীর আশায় একবারে নিরাশ হইয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনেরাও রঘুনাথের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এমন ধন-শালীর সন্তান কিরূপে সন্ন্যাসী হইল, অনেকে তাহা ভাবিয়াও অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিল!

এদিকে রঘুনাথ চৈতন্য-চরণ দেখিবার জন্য মনের আবেগে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনিদ্রা, অনাহার ও পথের বিবিধ কষ্টের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। এইরূপে দ্বাদশ দিবসের পর তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন। এই দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তিনি তিনদিন মাত্র রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষোত্তমে রঘুনাথ যখন উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন গৌর স্বরূপ দামোদর, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি ভক্তদিগের সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। মুকুন্দ দত্ত রঘুনাথকে দেখিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "এই যে রঘুনাথ আসিল।" গৌরও রঘুনাথকে দেখিয়া, 'এস এস' বলিয়া, প্রেমা-লিঙ্গন দিয়া বসিতে বলিলেন। রঘুনাথ গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিলেন। গৌর বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের কৃপার তুল্য সংসারে আর কোন শক্তিই বলবান নহে। তাঁহারই কৃপা তোমাকে বিষয়রূপ ঘৃণিত পদার্থ হইতে উদ্ধার করিল।" শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করিয়া পরমভক্ত

রঘুনাথ বলিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বুঝি না; তোমার কৃপাই আমার পরম ভরসা বলিয়া জানি।" তৎপর গৌর তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে তাঁহারা যদিও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের সেবা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন, তাঁহারা এখনও পুরীষের কীটসম বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ দেখিলেন, পথশ্রান্তিতে রঘুনাথের মুখ মলিন ও শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন, "তুমি রঘুর যত্নের ভার গ্রহণ করিয়া, আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি রঘুনাথ দাসের হস্ত ধরিয়া, স্বরূপের হস্তে সেই হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমারই হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি সর্ব্ব বিষয়ে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।" স্বরূপ প্রভুর বাক্য অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা।" রঘুনাথ তৎপর সমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে, স্বরূপ জগন্নাথের বিবিধ প্রসাদান্ন আনাইয়া, রঘুনাথের সেবার ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ পাঁচদিন স্বরূপের কুটীরে ভোজন করিয়া ভাবিলেন, এইরূপ সুখাদ্য, রসনার তৃপ্তিকর বস্তু আহার করিলে, 'বৈরাগী' হওয়া যায় না। এই ভাব তাঁহার মনে উদিত হইবামাত্র, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রতিদিন জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া, সিংহদ্বারে অন্যান্য ভিক্ষার্থীদিগের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন। সিংহদ্বারে যাহারা ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হয়, অনেকে কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে। ধনবানের সন্তান রঘুনাথ দাসও জগন্নাথের আরতি দর্শন করিয়া, ঐ সকল ভিক্ষার্থীদিগের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা লাভের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু লোকে রঘুনাথের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে অধিকতররূপে বিবিধ বস্তু প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। রঘুনাথ দেখিলেন, এখানেও নিস্তার নাই,—লোকের চক্ষু তাঁহার উপর পড়িয়াছে। সামান্য ভিক্ষা লাভ করিয়া, কেবল জীবনধারণ করিবেন,

এই তাঁহার অভিপ্রায়, কিন্তু এখানে তাঁহার সে সঙ্কল্পের ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। যে সুখাদ্যের ভয়ে, তিনি সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, সেই সুখাদ্য এখানেও!—তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। সে-জন্য তিনি সিংহদ্বারের ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন।

রঘুনাথ প্রাণের পিপাসা নিবারণার্থ 'বৈরাগী' হইয়াছেন। কিরূপে সে পিপাসা নিবারিত হইবে, এইজন্য তিনি গৌরাঙ্গদেবের উপদেশ লাভের জন্য ইচ্ছুক হইয়া, স্বরূপকে জানাইলেন। স্বরূপ গৌরের নিকট রঘুনাথের বাসনা জ্ঞাপন করিলে, গৌর বলিলেন, "আমি স্বরূপের হস্তেই তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি, তিনি সাধনতত্ত্ব বিষয়ে আমাপেক্ষা বিশেষ পারদর্শী; তবে আমার উপদেশ যদি কিছু শুনিতে চাও, তাহা হইলে, আমি সংক্ষেপে তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে,—গ্রাম্য কথা শুনিবে না, গ্রাম্য কথা বলিবে না; আর ভাল খাইবে না ও ভাল পরিবে না। নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দান করিবে, এবং হৃদয় মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অনুক্ষণ ধ্যান করিবে।"

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"

ভক্ত রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতজ্ঞতা-ভরে, তদীয় চরণে প্রণত হইলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথের পরিচয় হইলে, বিনয়ী রঘুনাথ সকলের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। রঘুনাথের গৃহত্যাগের পর তাঁহার পিতা তাঁহার অন্বেষণের জন্য শিবানন্দ সেনের নিকট দশজন লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাঁহার নিকট হইতে, তাঁহার পুত্রের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া, কিরূপ নিরাশ হইয়া,

সপ্তগ্রামাভিমুখে গমন করিল, সে-সমস্ত বিষয় তাঁহারা রঘুনাথের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। রঘুনাথ নীরবে সকলই শুনিলেন।

চারিমাস শেষ হইয়া আসিলে, গৌড়ীয় ভক্তগণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দেশে উপস্থিত হইলে, গোবর্দ্ধন দাস শিবানন্দ সেনের নিকট পুত্রের খবর লইবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথের নীলাচল গমন ও তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের বিষয় সমস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। পুত্রের কঠোর বৈরাগ্য ও পরিত্যক্ত অন্ন-গ্রহণে জীবিকা নির্ব্বাহের কথা শ্রবণ করিয়া, গোবর্দ্ধনের ও তদীয় পরিবারস্থ সকলেরই প্রাণ দুঃখে ও কষ্টে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কত লোক যাঁহার দানে, আবাসে ও অন্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, আজ তাঁহার পুত্র দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন! এ চিন্তা যে শেলের ন্যায় গোবর্দ্ধনের মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুত্র ইচ্ছা করিলে, তিনি তাঁহাকে রাজপুত্রের ন্যায়ই পুরুষোত্তম তীর্থে রাখিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি জানিতেন, রঘুনাথ ভক্তি-পথের পথিক—তিনি বিষয়-বিরাগী। তথাপি গোবর্দ্ধন দাস, কয়েকজন লোকদ্বারা চারিশত মুদ্রা ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার নীলাদ্রিতে রঘুনাথের নিকট প্রেরণ করেন। রঘুনাথ, পিতা ক্ষুণ্ন হইবেন মনে করিয়া, মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া, লোকদিগকে বিদায় দিলেন।

রঘুনাথ মুদ্রা লইয়া কি করিবেন? তিনি স্থির করিলেন, এই অর্থের দ্বারা গৌরচন্দ্রের সেবা করিবেন। এইজন্য মাসে দুইদিন করিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। গৌর রঘুনাথের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মাসে দুইদিন করিয়া, তাঁহার কুটীরে আসিয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। এই নিমন্ত্রণে মাসে আটপণ কড়ি ব্যয় হইত। কিন্তু কিছুদিন পরে রঘুনাথের মনে, এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল, তাঁহার মনে হইল, বিষয়ীর অর্থে প্রভুকে ভোজন করান উচিত নহে,

ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে তেমন তৃপ্তি হয় না। রঘুনাথ তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে গৌর যখন রঘুনাথের নিকট তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধের কারণ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছে,—যেহেতু বিষয়ীর অন্ন খাইলে, মন ক্লিষ্ট হয়—মন মলিন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনার বিঘ্ন উপস্থিত হয়।"

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে, মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এতদিন রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া, ভিক্ষা করিতেন, কিন্তু বহু ধনশালীর সন্তান রঘুনাথ ভিক্ষা করিতেছেন দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অনেক সুখাদ্য প্রদান করিতেন, রঘুনাথ দেখিলেন, ইহাতেও অক্ষুণ্ণরূপে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করা যায় না, তিনি সে-জন্য সিংহদ্বারে আর দণ্ডায়মান না থাকিয়া ছত্রে গিয়া, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

গৌর রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিতেন। তিনি তাঁহার দুইটি প্রিয় বস্তু রঘুনাথকে দান করেন, গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা। এই দুইটি দ্রব্য শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আনিয়া তাঁহাকে দান করেন। গৌর গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা রাধাকৃষ্ণ স্মরণের প্রধান উপায় মনে করিয়া, এই দুইটি বস্তু অতি আদরের সহিত রক্ষা করিতেন; কিন্তু গৌর রঘুনাথের প্রতি এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার এই দুইটি প্রিয়বস্তু তাঁহাকে দান করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিলাম, তুমি ভক্তির সহিত উঁহাদের সেবা করিবে।" রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের আদেশানুসারে পূজার কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এতদিন রঘুনাথের হৃদয়ে যে বৈরাগ্যানল প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল,

তাহা দিন দিন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রঘুনাথ সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া ছত্রে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন, এখন তাহাও পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যে-সকল প্রসাদান্ন পচিয়া যাইত পসারিরা তাহা নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিত, তৈলঙ্গ গাভীরাও অনেক সময় তাহা খাইত না, রঘুনাথ রাত্রিকালে সেই পরিত্যক্ত ভাত গৃহে আনিয়া জল দিয়া ধৌত করিতেন, এবং তাহার মধ্যে যে গুলি একটু শক্ত থাকিত সেই-গুলি বাছিয়া বাছিয়া একত্র করিতেন, এবং একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাই আহার করিতেন। গৌর রঘুনাথের আহারের ব্যবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া একদিন কুটীরে আগমন করিয়া বলেন, "রঘুনাথ, শুনেছি, তুমি রাত্রিতে কি সুন্দর জিনিষ খাও, আমাকে দাও না," পরে তিনি রঘুনাথের অন্নগ্রাস লইয়া সাগ্রহে ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন। দ্বিতীয় গ্রাস মুখে দিতেই স্বরূপ তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "প্রভো! এ ভোজ্য তোমার উপযুক্ত নয়।" গৌর বলিলেন, "আমি নিত্য কত সুন্দর সুন্দর প্রসাদান্ন খাই, কিন্তু এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি আর কখনও খাই নাই।"

"প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদ না পাই॥"

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের মধুর সহবাসে, ভক্তদিগের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গে, শ্রীভগবানের পদ-ধ্যানে ও নাম কীর্ত্তনে ষোড়শ বৎসরকাল নীলাচলে অতিবাহিত করেন। শ্রীচৈতন্য যখন প্রেমোন্মত্তভাবে দিনযামিনী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার দেহরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। এই জন্য তিনি গৌর-জীবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ও তাঁহার অমিয়মাখা কথা শ্রবণ করিতে পাইতেন। গৌরের তিরোভাবের পর রঘুনাথ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বরূপের দেহান্ত হইলে তিনি নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। ইঁহাদের বিচ্ছেদে তিনি এতই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের

শিখরদেশ হইতে নিম্নে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিল। কিন্তু রূপ সনাতন তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে তিনি রাধাকুণ্ডের ধারে বসিয়া কঠোর সাধনায় রত হইয়াছিলেন। অন্ন জল ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সামান্য 'মাঠা' খাইয়া জীবন-ধারণ করিতেন। এইরূপে তিনি সমস্ত দিনই নাম-জপ ও নাম-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতেন। রাত্রিতে চারিদণ্ড মাত্র নিদ্রা যাইতেন। রঘুনাথ প্রতিদিনই এক লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন ও কয়েক দণ্ড শ্রীচৈতন্যের গুণাবলী চিন্তা করিতেন।

যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঃ—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না ছিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নিবেদন।"

রঘুনাথ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন ধামে অবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইনি ইঁহার গুরু রঘুনাথ দাসের নিকট হইতেই গৌরাঙ্গ-চরিত্রের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাকন্দী নামক গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পল্লীটি গঙ্গা-তীরবর্ত্তী ছিল বলিয়া, ইহাকে সুন্দর বলিয়াই বোধ হইত। চাকন্দী নবদ্বীপ হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল। নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান ক্ষেত্র হইলেও, চাকন্দীতে অধ্যাপকগণ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। এজন্য অন্যান্য স্থান হইতে অনেক শিক্ষার্থী এখানে আগমন করিয়া শিক্ষালাভ করিত। গঙ্গাধর নিজগ্রামেই উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন, এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে দক্ষতা লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হন।

মানব-মনের গতি অতিবিচিত্র। কেহ বা বাল্যে অসৎ-পথ অবলম্বন করে, আর কেহ বা ধর্ম্মের পথ—পবিত্রতার পথ অবলম্বন করিয়া, জীবনকে মধুময় করিতে যত্নবান হয়। যে সময় গঙ্গাধর চতুষ্পাঠীর ছাত্র সে সময়, ছাত্রেরা প্রায়ই জ্ঞানের অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া, অপরকে আপনা অপেক্ষা শিক্ষাতে হীন মনে করিত—এবং ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিত। কিন্তু গঙ্গাধরের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মানুগত হইয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের যশঃ-সৌরভে যখন চারিদিক আমোদিত হইতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য নবদ্বীপ যাইবার বাসনা করেন; কিন্তু ছাত্রেরা গৌরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারিত না, সে-জন্য তাহারা তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় নাই।

কিন্তু মানব-মনের স্বাভাবিক বাসনা কে রোধ করিতে পারে? গৌর গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক নূতন ভাবে মত্ত হইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন,—তাঁহার নামকীর্ত্তনে নবদ্বীপে প্রেমের বন্যা বহিতে লাগিল। গঙ্গাধর এই লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন; যে গৌরের প্রতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনের অনুরাগ প্রধাবিত হইয়াছিল, সে অনুরাগ আরো বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই ভক্ত-চূড়ামণিকে দেখিবার জন্য, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু পথে শুনিতে পাইলেন, গৌর সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবার জন্য কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিয়াছেন। এ-সংবাদে তাঁহার প্রাণ গৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি মনের আবেগে কাটোয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এ-দিকে গৌরকে দেখিবার জন্য কেশব ভারতীর আশ্রম বহু লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গাধর তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্ষৌরকার শচীমাতার সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। কেশব ভারতী বহুসংখ্যক নর-নারীর ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন, এবং দীক্ষাকালে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর স্বচক্ষে এই দৃশ্য দর্শন করিলেন। যাঁহার দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল, আজ তিনি বৃদ্ধা জননী ও প্রাণসমা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইলেন,—এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণের ভিতর এক আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন; এবং আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে চেতনা লাভ করিলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চাকন্দীতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহার চৈতন্যানুরাগ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। অনেকে বলিতে লাগিল, চৈতন্যের প্রতি যখন ইঁহার এত অনুরাগ তখন ইনি যথার্থই

চৈতন্যের দাস। এই হইতে তিনি গঙ্গাধর নামের পরিবর্ত্তে চৈতন্য-দাস বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন।

চৈতন্যদাস ইতঃপূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া—এতদিন তাঁহাদিগের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। সেজন্য চৈতন্যদাস মনে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিতেন না। লক্ষ্মীপ্রিয়ার পুত্র হইবার বয়স অতীত হইয়াছিল। চৈতন্যদাস ভগবৎ-প্রেমেতেই সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু হঠাৎ একবার তাঁহার হৃদয়ে পুত্রলাভ কামনা জাগরিত হইয়া উঠিল। সে-সময় মহাত্মা শ্রীচৈতন্য দেশ-ভ্রমণানন্তর নীলাচলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। চৈতন্যদাস শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার মানসে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে লইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। চৈতন্যদাস পুরুষোত্তমে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে—গৌর, চৈতন্যদাসের মনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আপনার ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকিয়া বলেন, "তুমি চৈতন্যদাসকে বলিও, সে যে কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে। তাহার সন্তানের মধ্যে আমার প্রেম সঞ্চারিত হইয়া, তাহার আত্মাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে।" চৈতন্যদাস এই আশাপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মীপ্রিয়াসহ শ্রীক্ষেত্র হইতে গৌড়া-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদাস প্রথমতঃ যাজিগ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। বলরাম দাস লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা, জামাতা ও কন্যার আগমনে পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহারা কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া চাকন্দীতে প্রত্যাগত হইলেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্ভবতী হইলেন। বলরাম দাস এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অনেক দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদাস অতি নিরীহ লোক ছিলেন, তাঁহাকে সকলে অত্যন্ত ভালবাসিত ; লক্ষ্মীপ্রিয়ার সন্তান-সম্ভাবনা জানিয়া

গ্রামের অন্যান্য অনেক লোকও এ-সময় তাঁহার বাটীতে অনেক দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিল।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপ্রিয়া এক সুলক্ষণযুক্ত সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রতিবেশীরা আগমন করিয়া চৈতন্য দাসের গৃহ মঙ্গলধ্বনিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণগণ মধুর-কণ্ঠে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য সকলে মিলিয়া মঙ্গলগাথা গান করিতে লাগিল। লক্ষ্মীপ্রিয়া সন্তানের মুখচন্দ্র দেখিয়া যেন আনন্দে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইলে চৈতন্যদাস পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণের অনুষ্ঠান করিলেন। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অনেক আত্মীয় ও বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন, এবং তাঁহাদের আনন্দ-কলরবে চৈতন্যদাসের কুটীর মুখরিত হইয়া উঠিল। এই অনুষ্ঠানে পুত্রের নাম হইল শ্রীনিবাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীপ্রিয়া ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। তাঁহার স্নেহের পুত্র যখন আধ আধ স্বরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি শ্রীনিবাসকে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যদিগের নাম শ্লোকচ্ছলে শিখাইতে আরম্ভ করিলেন, সন্তানও অস্পষ্টস্বরে তাহা বলিতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীনিবাস পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে, গঙ্গাধর তাঁহার হাতে খড়ি দিয়া উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিলেন। মহাপুরুষদিগের জীবনে বাল্যকাল হইতেই অনেক বিষয়ে সাধারণ বালক অপেক্ষা নানা বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীনিবাসের শিক্ষা আরম্ভ হইল, কিন্তু এই শৈশবাবস্থায় তাঁহার জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উপনয়নের সময় কয়েক দিন

পাঠ বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু তৃতীয় দিবসে শ্রীনিবাসের ইহা সহ্য হইল না, তিনি পাঠের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিবাসের শিক্ষাদাতা আসিয়া যখন শুনিলেন, শ্রীনিবাস পাঠ বন্ধ হওয়াতে ক্রন্দন করিতেছে, তখন তিনি বুঝিলেন শ্রীনিবাস ভবিষ্যতে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবে।

"বিদ্যা বিষয়ে বালকের এত অভিলাষ।
বিদ্যাতে প্রধান বুঝি হবেন শ্রীনিবাস॥"

অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির গুণে শ্রীনিবাস অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা সকলেই করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনিবাস কেবল যে জ্ঞানালোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন তাহা নহে, তিনি বৈষ্ণবদিগের নিকট গমন করিয়া, ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় ও শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরদিগের জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। বালকেরা বাল্যাবস্থায় মাতাপিতার যেরূপ আচরণ দর্শন করে প্রায় তদনুসারেই তাহাদিগের জীবন গঠিত হইয়া থাকে। শ্রীনিবাসের পিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের একান্ত অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের মধুময় দৃষ্টান্তও শ্রীনিবাসকে বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের পথে নীত করিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার দেহের রূপলাবণ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—জ্ঞানের জ্যোতিঃতে হৃদয় জ্যোতিষ্মান হইল; ভগবৎ ভক্তিতে আত্মা মধুময় হইতে লাগিল। সকল গুণের সমাবেশে শ্রীনিবাস সকলের চিত্ত আকর্ষণের বিষয় হইয়া উঠিলেন, সকলের চক্ষুই তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল। সকলেই মনে করিতে লাগিল শ্রীনিবাস সামান্য মানব নহেন, ইনি অসামান্য পুরুষ। লোকে বলিতে লাগিল :—

"বহুদিন হৈতে বাস হইল এথাই।
এমন বালক মোরা কভু দেখি নাই॥"

শ্রীনিবাস বাল্যকালেই ভক্তি পথের পথিক হইলেন। তিনি একদিন

যাজিগ্রামে যাইতেছেন, এমন সময়ে কাটোয়া-নিবাসী শ্রীনরহরি সরকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নরহরি সরকার বৈষ্ণব সমাজে "সরকার ঠাকুর" বলিয়াই পরিচিত এবং সংক্ষেপোক্তিতে "সাকার ঠাকুর"ও কথিত হইতেন। শ্রীনিবাসও তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। সরকার ঠাকুরও শ্রীনিবাসের প্রতিভা ও ভগবৎ-ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, আজ শুভক্ষণে পরস্পরের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ের হৃদয়েই আনন্দোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শ্রীনিবাস তাঁহার চরণে প্রণত হইলে সরকার ঠাকুর তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্রীনিবাস বিনয়-সহকারে আপনার দীনতা প্রকাশ করিলে সরকার ঠাকুর নানাপ্রকার মধুর বাক্যে তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার করিলেন, এবং তাঁহার আত্মাকে আরো ভগবৎ-মুখী করিয়া তুলিলেন। • •

সরকার ঠাকুরের সহিত দেখা হইবার পর শ্রীনিবাসের হৃদয়ের ভাব আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া চৈতন্য-দাসকে শ্রীচৈতন্য-লীলার বিষয় বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পিতা যাঁহার নাম শ্রবণে মত্ত হইয়া উঠেন, তাঁহার বিষয় শুনিবার জন্য সন্তান জিজ্ঞাসু হইতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। তিনি সেই প্রেমিক-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরগণের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন,—বলিলেন :—

"না ধরয়ে অস্ত্র না মারয়ে কারো প্রাণে।
উদ্ধার করয়ে সে দুর্লভ প্রেমদানে॥
ওরে বাপু শ্রীনিবাস কি বলিব তোরে।
ডুবিনু সে গোরারূপ অমিয়া পাথারে॥"

শ্রীনিবাসও পিতার মুখ হইতে গৌরের চিত্ত-বিমোহন লীলার কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে অচৈতন্য-প্রায় হইয়া পড়িলেন।

পিতাপুত্রে এইরূপে মধুর ভক্তি ও ভক্তদিগের চরিত-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে চৈতন্যদাস জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া কাঁদিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন, শ্রীনিবাসের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাঁহার নয়ন হইতে বিষাদের বারি বহিতে লাগিল। সুবুদ্ধি শ্রীনিবাস, পিতার বিচ্ছেদ-শোকে সন্তপ্ত হইয়াও জননীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে পিতার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীনিবাস ইতঃপূর্ব্বেই যাজিগ্রামস্থ তাঁহার মাতামহ বলরামাচার্য্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। চৈতন্যদাসের পরলোক গমনের পর তিনি মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে গমন করিয়া বলরামাচার্য্যের ভবনে বাস করেন। শ্রীনিবাস তখন তরুণবয়স্ক যুবাপুরুষ, কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুরাগের কথা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যাজিগ্রামে গমন করিলে, গ্রামস্থ সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীনিবাসও তথায় গমন করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভক্তি ও ভক্তচরিত-প্রসঙ্গে সময় ক্ষেপণ করিয়া আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

যিনি তৎকালে ভক্তির প্রভাবে বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিতেছিলেন, সেই গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই মোহনমূর্ত্তি একবার দর্শন করিয়া, জীবন শীতল করিবেন,—এই উদ্দেশ্যে তিনি, সরকার ঠাকুর প্রভৃতি চৈতন্যানুগত ভক্তদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় সরকার ঠাকুর তাঁহার পথের সঙ্গি-স্বরূপ একজন লোক দিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস এই লোক সঙ্গে লইয়া গন্তব্য-স্থানে যাত্রা করিতে লাগিলেন। আনন্দমনে পথে চলিতেছেন এমন সময় এক হৃদয়-বিদারক সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। যাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করিবার জন্য

তিনি উৎসুক-হৃদয়ে গমন করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদৃশ্য হইয়াছেন।—চৈতন্যের সংগোপনের কথা শ্রবণমাত্র তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে, চেতনা-লাভ করিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া পুনরায় ভূমিতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই সৌম্যমূর্ত্তি যুবাপুরুষের ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া, দর্শকদিগের হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হইতে লাগিল, অনেকের চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল,—

"মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বারবার।
নেত্র ধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ বিলাপ ও রোদনে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাসমাগমে হৃদয়ে অশান্তির অনল যেন আরো প্রবলতর হইয়া উঠিল, তিনি মনে করিলেন, যখন আর এ-জীবনে শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভ ঘটিবে না, তখন এ-দেহ বিসর্জ্জন করাই ভাল। শ্রান্ত দেহে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি শয়ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য, স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে বলেন, "দুঃখ দূর করিয়া শীঘ্র নীলাচল গমন কর। সেখানে গদাধর প্রভৃতি ভক্তেরা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" শ্রীনিবাসের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি দুঃখের মধ্যেও প্রাণে একটু সান্ত্বনা লাভ করিলেন। রজনী প্রভাত হইলেই তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে পথ ফুরাইয়া আসিল। তিনি পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, গৌর অভাবে সকলেরই প্রাণ বিষাদে পূর্ণ। তিনি গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করাতে এক ব্যক্তি বলিল,

"পণ্ডিত গোস্বামী গৌর-বিচ্ছেদে জীবন্মৃতের ন্যায় বাস করিতেছেন।"—এই বলিয়া, সে-ব্যক্তি শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া, পণ্ডিত গদাধরের আশ্রম দেখাইয়া দিলেন। গদাধর সমুদ্রের উপকূলে একটি সুন্দর উদ্যান-মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীনিবাস তথায় যাইয়া দেখিলেন, গদাধর বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অনবরত বারিধারা বহিয়া যাইতেছে। শ্রীনিবাস তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। উদ্যানের এক পার্শ্বে থাকিয়া, দিন অতিবাহিত করিলেন। পরদিন সমুদ্রে স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করিয়া, চৈতন্যানুগত-প্রাণ ও পরম ভক্ত পণ্ডিত গদাধরের কুটীর-দ্বারে উপনীত হইলেন্ এবং অশ্রুসিক্ত-নয়নে শ্রীচৈতন্যের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যের নাম শ্রবণমাত্র পণ্ডিত গদাধরের শরীরে যেন তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া এক নববলের সঞ্চার করিয়া দিল—তাঁহার শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তির বারি পতিত হইল; তিনি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "কে তুমি এমন মধুর নাম উচ্চারণ করিলে, আমার প্রাণ যে জুড়াইয়া গেল।" এই বলিয়া, তিনি শ্রীনিবাসকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কি নাম তোমার বাপু কহ দেখি শুনি।
শুনিলাম তোমার মুখে কি অপূর্ব্ব বাণী।"

পণ্ডিত গদাধর শ্রীনিবাসকে স্নেহালিঙ্গন দান করিয়া, বুঝিলেন, এই যুবক সামান্য নহে। পরে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "বাপু! তোমারই বিষয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তোমার কথাতে তাহা সকলই মিলিয়া গেল। তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ আজ শীতল হইল।" এই বলিয়া, তিনি একজন লোক সঙ্গে দিয়া শ্রীনিবাসকে নীলাচলের ভক্তবৃন্দ দর্শন করাইয়া আনিতে বলিলেন। শ্রীনিবাস তাহার সহিত বহির্গত হইয়া, সার্ব্বভৌমাচার্য্য, রায়

রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তদিগকে দর্শন করিয়া, হরিদাসের সমাধিস্থলে উপনীত হইলেন। হরিদাসের নামানুরাগ ও তাঁহার অপূর্ব্ব ও মধুর জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীনিবাস ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল, তিনি আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"হা হা প্রভু হরিদাস বলিতে বলিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥"

শ্রীনিবাস নীলাচলের নানা স্থান দর্শন ও ভক্তদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে, গদাধর শ্রীনিবাসকে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে বলিলেন। শ্রীনিবাস আনন্দ-সহকারে উহা ভক্ষণ করিলেন। আহার শেষ হইলে গদাধর বলিলেন, "মহাপ্রভু তোমাকে ভাগবত পড়াইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, আর এক কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তুমি বৃন্দাবনে গমন করিয়া, রূপ-সনাতন-বিরচিত ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়া, গৌড়ে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমার নিকট যে ভাগবত গ্রন্থখানি আছে, অশ্রুজলে তাহার অনেক অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি সরকার ঠাকুরকে একখানি চিঠি দিতেছি, তুমি তাহা লইয়া, ত্বরায় গৌড় দেশে গমন কর; তিনি তোমাকে একখানি নূতন ভাগবত প্রদান করিবেন। আমি আর অধিক দিন জীবিত থাকিব না; তুমি পুস্তকখানি লইয়া, আবার ত্বরায় এখানে আগমন করিবে। শ্রীনিবাস আর কালবিলম্ব করিলেন না, গদাধরের পত্রখানি লইয়া, গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন।

শ্রীনিবাস গৌড়দেশে আগমনপূর্ব্বক শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া, গদাধর পণ্ডিতের চিঠি প্রদান করিলেন। গৌরের তিরোভাবে শ্রীক্ষেত্র যে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা শ্রীনিবাস সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। গৌর যে অদৃশ্য হইয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গদেশে

প্রচারিত হইয়াছিল। গৌরের জন্য সরকার ঠাকুর ও শ্রীনিবাস উভয়েই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া, ভাগবত অধ্যয়নের জন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন।

শ্রীনিবাস পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, গদাধর পণ্ডিত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ-সংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি নীলাচল-পথে আর অগ্রসর না হইয়া, গৌড়াভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আসিতে আসিতে আবার শুনিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য ও নিতানন্দ ভবধাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেই গঙ্গাধরের পরলোক-গমনের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তৎপর এই দুইজন প্রসিদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের নেতাদিগের দেহান্তের কথা শ্রবণে তিনি শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন,—বক্ষে করাঘাত ও মস্তকের কেশ ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

"কেশ ছিঁড়ি হস্তাঘাত করয়ে মাথায়।
কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শুনি পাষাণ মিলায়॥"

এইরূপ ক্রন্দন ও বিলাপে সমস্ত রজনী যাপন করিয়া, শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের নিকট উপনীত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীনিবাস কিছুদিন শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের নিকট বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও লীলাভূমি দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে গমন করিলে গৌরের তিরোভাব ও তাঁহার লীলার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল—অশ্রুবারিতে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল।

গৌরাঙ্গ-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের পর, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেন। বাটীর অভ্যন্তরে বাস করিতেন, অন্য পুরুষের মুখদর্শন করিতেন না। কয়েকজন

তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। তিনি হরিনাম-জপে ও তাঁহার দেবতুল্য স্বামীর গুণানুকীর্ত্তনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া, দিবাবসানে সামান্য মাত্র তণ্ডুল রন্ধন করিয়া, আপনার ইষ্ট দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া, আহার করিতেন। গৌরভক্ত শ্রীনিবাস নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদত্ত হইল। কথিত আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার আগমনের পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীনিবাসের গুণাবলী উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার আগমন বার্ত্তা তাঁহার নিকট বিদিত করেন। পণ্ডিত দামোদরের প্রতি গৌর শচীদেবীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, শচীদেবীর পরলোক গমনের পর পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরও তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুমতিক্রমে শ্রীনিবাসকে গৌর-ভবনে আনা হইলে, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণের উদ্দেশে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে তাঁহাকে দর্শন করেন এবং বাৎসল্যভাবে দাসীদিগের দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, তাঁহাকে আপন ভবনের বহির্ব্বাটীতে কয়েকদিন অবস্থিতি করিতে বলেন। তৎপর বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে শান্তিপুর ও খড়দহ দর্শনার্থ গমন করিতে বলেন। শ্রীনিবাস সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া, অদ্বৈতের বাসস্থান শান্তিপুর ও নিত্যানন্দের প্রচারক্ষেত্র খড়দহে গমন করেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী শ্রীনিবাসকে অতি সমাদরে আপন ভবনে রাখিয়া, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইয়া ছিলেন। শ্রীনিবাস সীতাদেবীর চরণে প্রণত হইয়া, তদীয় আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক খড়দহে গমন করিলেন এবং নিত্যানন্দের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। শ্রীনিবাস উপস্থিত হইলে, নিত্যানন্দের পত্নীদ্বয় এবং নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র, তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে বাটীতে রাখিয়া, আহারাদি করাইয়াছিলেন। তিনি তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, তাঁহাদিগের চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামীর

ভবনে গমন করেন। সেখানেও গোস্বামী ও তদীয় পত্নী মালিনী দেবীর বিশেষ যত্ন লাভ করেন। তথা হইতে বিদায়গ্রহণকালে অভিরাম গোস্বামী বলিলেন, "শ্রীনিবাস! শীঘ্র বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া, গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর। আর সে পুণ্যভূমিতে তুমি রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি পরম ভক্তদিগের দর্শনলাভ করিয়া সুখী হইবে। শ্রীচৈতন্য করুণা করিয়া, তোমার দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন—তাঁহারই করুণায় তুমি গৌড়দেশে ভক্তিধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইবে।"

শ্রীনিবাস তৎপর মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কাটোয়ায় গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা স্মরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তৎপর নিত্যা-নন্দের জন্মস্থান একচক্রা, তৎপর গয়া, তৎপর প্রয়াগ ও অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান সকল দর্শন করিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। কিন্তু তিনি এখানে এক নিদারুণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন; শুনিলেন, সনাতন গোস্বামী ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ সংবাদে তিনি অত্যন্ত কাতর-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। পরে আবার রঘুনাথ দাস ও রূপ গোস্বামীরও পরলোক গমনের কথা শ্রবণ করিলেন। এক শোকানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে, এ-সংবাদে সে-অনল আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি এই সকল নিদারুণ শোক বক্ষে ধারণ করিয়া, বৃন্দাবনধামে উপনীত হইয়া পণ্ডিতাগ্র-গণ্য শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। জীব গোস্বামী তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন, "গতকল্য রাত্রে তোমার আগমন আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি।" তৎপর তিনি তাঁহাকে গোপাল ভট্টের নিকট লইয়া গেলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা বলেন, গোপাল গোস্বামীও পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন-যোগে বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস ভট্ট গোস্বামীর চরণে প্রণত হইলে,

তিনিও তাঁহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আজ তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। আমি বহুদিন হইতে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। মহাপ্রভু তোমার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি রাখিয়া দিয়াছি।" শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পত্র দর্শন করিয়া ভাবে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চেতনা হইলে, কিয়ৎকাল পরে জীব গোস্বামী তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং পরদিবস ভট্টগোস্বামীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহাও নির্দ্ধারিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষার দিন জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে ভট্ট গোস্বামীর নিকট উপস্থিত করিলে, গোস্বামী যথারীতি শ্রীনিবাসের দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দীক্ষার দিন বহু-সংখ্যক ভক্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দীক্ষান্তে শ্রীনিবাস ভট্ট গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর চরণ-যুগল বন্দনা করিয়া সমাগত সকলকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীজীব-গোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রূপ ও সনাতন গোস্বামী-রচিত ও অন্যান্য ভক্তি-গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের যশঃ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। এখানে অবস্থানকালে ভক্ত নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহারা তিনজনে ভক্তিতত্ত্বা-লোচনায় ও নাম-কীর্ত্তনাদিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিলেন। গ্রন্থ না হইলে ভক্তি-ধর্ম্ম কিরূপে প্রচারিত হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি রূপ-সনাতন বিরচিত, স্বরচিত ও

অন্যান্য গ্রন্থ দিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। রাসোৎসব উপলক্ষ্যে একদিন বহুজনাকীর্ণ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পাণ্ডিত্য ও তাঁহার ভক্তিভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের শ্রীনিবাসই উপযুক্ত পাত্র, এই জন্য তাঁহার সহিত পুস্তক দিয়া, তাঁহাকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিতে বাসনা করিয়াছি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া, নরোত্তম ও শ্যামানন্দও গমন করিবেন। আপনাদের অনুমতি হইলেই তাঁহাদিগের সহিত ভক্তিগ্রন্থ দিয়া তাঁহাদিগকে তথায় প্রেরণের ব্যবস্থা করি।" সকলেই অতি আনন্দের সহিত এই বাক্য অনুমোদন করিলেন।

জীব গোস্বামী বহুসংখ্যক গ্রন্থ উত্তমরূপে মোমজামে মুড়িয়া একটি বৃহৎ পেটরার মধ্যে রাখিয়া সকলের সম্মুখে উহা চাবিদ্বারা বন্ধ করিলেন এবং পেটরাটি একখানি গরুর গাড়ীর উপর স্থাপন করিলেন। গাঁড়ীর প্রহরি-রূপে দশজন অস্ত্রধারী লোক গমন করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সব প্রস্তুত হইলে হরিধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইতে লাগিল। শকট-চালক প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া শকট চালাইতে আরম্ভ করিল। গৌড়-যাত্রীত্রয়ও অশ্রুবারি ফেলিতে ফেলিতে শকটের সহিত গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের কোন স্থানে নির্ম্মল নির্ঝরিণী কুলকুল্-রবে বহিয়া যাইতেছে, কোন স্থানে পর্ব্বতসকল তরুকুঞ্জে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে, কোন স্থানে ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষসকল

নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহার ভিতর হইতে বিহগকুল সুস্বরে আপন মনে গান করিয়া যেন সুধা ঢালিয়া দিতেছে। প্রকৃতির এ সকল রমণীয় দৃশ্য দর্শনে তাঁহাদিগের ভক্তি-প্রবণ হৃদয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়িত —ভগবৎ প্রেমের লহরী যেন হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত। তাঁহারা এইরূপে চলিতে চলিতে নানা দেশ ও নানা নগর অতিক্রম করিয়া, গৌড়দেশে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুর গ্রামে উপনীত হইলেন। রক্ষকসহ পুস্তকের শকটও উপস্থিত হইল। সেই সময়ে বীরহাম্বির নামে এক পরাক্রান্ত রাজা বনবিষ্ণুপুরে বাস করিতেন। লঘুচিত্ততার জন্য রাজ্যমধ্যে তিনি কখন কখন দস্যুবৃত্তির উৎসাহ দেওয়াকে অপকর্ম্ম মনে করিতেন না। বহুসংখ্যক দস্যু তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া লোকের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আনিত।

বিষ্ণুপুরে পুস্তকসহ গাড়ী পৌছিলে বীরহাম্বিরের নিকট এই সমাচার গেল যে, কোন ধনী লোক রত্নপূর্ণ সিন্ধুক লইয়া গমন করিতেছে—আর তাহাদিগের মধ্যে পনর জনের অধিক লোক নাই। রাজা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলস্থ দুইশত দস্যুকে এই রত্নপূর্ণ সিন্ধুক লুণ্ঠন করিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। দস্যুরা রাজার আদেশ শুনিবামাত্র চীৎকার করিয়া গরুর গাড়ী জঙ্গলের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু রাজার আদেশে কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিল না। দস্যুদিগের চীৎকারে শ্রীনিবাস প্রভৃতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; উঠিয়া দেখেন দস্যুরা গাড়ী ও পুস্তক লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুঃখেতে শ্রীনিবাসের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি বৃন্দাবনবাসী গাড়ীর রক্ষকদিগের দ্বারা শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট এই দুর্ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বাড়ীতে প্রেরণ করিয়া বলিলেন, "যদি পুস্তক না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমি আর গৃহে ফিরিব না।"

তিনি এইরূপে বিষণ্ণমনে বনবিষ্ণুপুরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান; একদিন তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, কৃষ্ণদাস

নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমারের 'সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে সামান্য লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল, পরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া যায়। ইহার সহিত শ্রীনিবাস রাজা বীরহাম্বিরের সভায় গমন করিতে প্রয়াসী হইলে, কৃষ্ণদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। রাজার সভায় ভাগবত পাঠ হইত এবং রাজা তাহা শ্রবণ করিতেন। কৃষ্ণদাস যখন শ্রীনিবাসকে লইয়া রাজসভায় গেল, তখন এক ব্রাহ্মণ ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস ছিন্ন মলিন বসন-পরিধেয় হইয়া সভার এক পার্শ্বে স্থির হইয়া বসিলেন। কিন্তু ভাগবত ব্যাখ্যাতার ভুল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না; তিনি তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিলেন। রাজ-পণ্ডিত প্রথমতঃ, শ্রীনিবাসকে মলিন ছিন্নবস্ত্র-পরিধেয় সামান্য লোক বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস পুনরায় তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিলে, পাঠক ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "কে-রে একটা সামান্য বামুন, আমার ব্যাখ্যায় ভুল দেখায়?" বীরহাম্বির তখন শ্রীনিবাসকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। শ্রীনিবাস যখন পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সকলে তাঁহার সুমধুর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। রাজার দুনয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। সভা-পণ্ডিত ভাগবত-পাঠক দরিদ্র শ্রীনিবাসের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার নিকট আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রাজা অবশেষে তাঁহার বন বিষ্ণুপুরে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীনিবাস আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। অপহৃত-গ্রন্থের বিষয় যখন তিনি শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিবাসের চরণে পড়িয়া বলিলেন, "আমিই সেই দস্যু, আপনার একখানি পুস্তকও নষ্ট হয় নাই।" এই বলিয়া যে গৃহে গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুক ছিল, রাজা সেই গৃহে শ্রীনিবাসকে লইয়া গেলেন। শ্রীনিবাস দেখিলেন সবই

ঠিক আছে, কিছুই নষ্ট হয় নাই। যাহার জন্য তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল—আহার নিদ্রা চলিয়া গিয়াছিল—আজ জীব গোস্বামী প্রদত্ত সেই সকল রত্ন অটুট রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া গ্রন্থরাজির নিকট প্রণত হইলেন।

রাজা শ্রীনিবাসকে থাকিবার স্থান দান করিয়া, তাঁহার সেবার আয়োজন করিয়া দিলেন, এবং ভক্তি-সহকারে তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পাঠ শ্রবণের সময় তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। শুষ্ক মরুসম-প্রাণ মধুর ভক্তিরসে গলিয়া যাইতে লাগিল। দিন কয়েক পরে তিনি সস্ত্রীক শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দস্যু-দলপতি রাজা বীরহাম্বির ভক্তি পথের পথিক হইলেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বনবিষ্ণুপুর হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে সন্তানের মুখচন্দ্র দর্শনে জননীর প্রাণ আনন্দে ভাসিতে লাগিল। আচার্য্য গৃহে বাস করিয়া, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও ভক্তদিগের সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের পাণ্ডিত্য ও ভগবৎ-ভক্তিতে লোকে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ তাঁহার নিকট আসিয়া ভক্তি-তত্ত্বালোচনায় ও নাম-কীর্ত্তনে অনেক সময় যাপন করিতেন।

কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস-জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনিবাস মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। জননীর পরলোক গমনের পর, শ্রীখণ্ড নিবাসী সাকার ঠাকুরের অনুরোধে তিনি

দারপরিগ্রহ করেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৪৯ বৎসর। আচার্য্য ধর্ম্মানুগত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভবনে যিনি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তিনিই অতি সমাদরে পরিগৃহীত হইতেন। এইরূপে কিছুকাল সংসারে বাস করিয়া পুনরায় তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। তখন তাঁহার দীক্ষাগুরু গোপাল ভট্ট ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। জীব গোস্বামী এ-সময় তাঁহার স্বরচিত আরো কয়েকখানি পুস্তক তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীনিবাস কিছুকাল বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়া যাজিগ্রামে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ আপন জীবনের কার্য্যে রত হইলেন। তাঁহারই প্রভাবে ভক্তি-শাস্ত্রের মর্ম্ম লোকে বুঝিতে সমর্থ হইল। তিনি বৈষ্ণবদিগের উৎসবে গমন করিয়া ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া লোকের চিত্ত মুগ্ধ করিতেন। একদিকে গভীর পাণ্ডিত্য অপরদিকে ভগবন্নিষ্ঠা, এই দুইটী মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত করিয়াছিল। তিনিই তৎকালে গৌড়দেশে বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণীরূপে বহুসংখ্যক লোককে ভক্তি-পথের পথিক করিয়াছিলেন। এখানে অবস্থান-কালীন তিনি সুবিখ্যাত রামচন্দ্র কবিরাজকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সুপণ্ডিত অথচ ঘোর তার্কিক ছিলেন, কিন্তু শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্যের নিকট তিনি পরাভব স্বীকার করেন। রামচন্দ্র আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণানন্তর তাঁহারই অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গেই সর্ব্বদা বাস করিতেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য গুরুর আদেশে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহও করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারে বাস করিয়া, তিনি মুক্তজীবের ন্যায়ই বাস করিতেন। যৌবনের ভক্তিভাব, ইহাতে কিছুই ম্লান হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনি ভক্ত-সংসারী হইয়া, লোককে সংসার-ধর্ম্ম পালনেরও

আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীনিবাস এইরূপে গৌড়দেশে সকলের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, হরিনাম গ্রহণে মধুময় জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি গভীর অনুরাগবশতঃ যাজিগ্রামে রাজমহিষীসহ আচার্য্যের সাক্ষাৎ-লাভ করিতে আসেন, এবং নিজ পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিবাসের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। আচার্য্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে, ভগবান তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। রাজা বনবিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাসের বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক প্রকারে তাঁহাকে অর্থ ও সম্পত্তি দানে সাহায্য করিয়াছিলেন। আচার্য্য অনেক সময় বিষ্ণুপুরে রাজপ্রদত্ত ভবনে বাস করিয়া রাজার সঙ্গে ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গে ও নাম-কীর্ত্তনে সময় ক্ষেপণ করিতেন।

বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের প্রধান চিত্তাকর্ষণের স্থান। শ্রীনিবাস বৃদ্ধ বয়সে তথায় পুনরায় গমন করিলেন। আর গৌড়ে ফিরিলেন না। তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার পিতা চৈতন্য দাসকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যে পুত্র হইবে, তাহাতে আমার ভাব প্রকট থাকিবে।" শ্রীনিবাসের জীবনে বহুল পরিমাণে তাহাই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনিই বঙ্গদেশে রূপ সনাতন, ও জীব গোস্বামী কৃত গ্রন্থাদির গভীর তাৎপর্য্য বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া; শুষ্ক জ্ঞানাভিমানীদিগকে ভক্তিপরায়ণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের ভক্তি-ধর্ম্ম তিনিই পাণ্ডিত্য-সহকারে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—আর ভক্তির কোমল ও মধুর ভাবে সাধারণ লোকের চিত্ত হরিনাম-রসে সিক্ত করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

নরোত্তম দাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রামপুর-বোয়ালিয়ার অন্তর্গত পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী খেতরি গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামে একজন কায়স্থ রাজা বাস করিতেন, তাঁহাদিগের উপাধি ছিল, মজুমদার। রাজা কৃষ্ণানন্দের পত্নী নারায়ণী। বৈষ্ণব লেখকেরা বলেন, যেমন শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীচৈতন্যের আকর্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি ইঁহারাও নিত্যানন্দের শুভ আশীর্ব্বাদে এক সন্তান লাভ করেন। ইঁহার নাম নরোত্তম। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্মগ্রহণে মাতাপিতার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া, ভাবাবেগে কৃষ্ণানন্দের চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। সন্তানের জন্মোপলক্ষে রাজা সকলকে যথাযোগ্য দান করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন করিলেন। নবকুমারের জন্মোপলক্ষ্যে খেতরি নগরে সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ মহা সমারোহের সহিত পুত্রের নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কোন দৈবজ্ঞ রাজকুমারের মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বলিলেন, "এই শিশুর নাম নরোত্তম রাখা হউক।"

> "তথা এক দৈবজ্ঞ পরম ভাগ্যবান্।
> শিশু সন্দর্শনেতে নির্ম্মল হইল জ্ঞান॥
> রাজ আজ্ঞামতে দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণ।
> কহিল ইহার যোগ্য নাম নরোত্তম॥"

উপযুক্ত বয়সে রাজা কৃষ্ণানন্দ নরোত্তমের হাতে খড়ি দিলেন। রাজকুমারের শিক্ষা আরম্ভ হইল। তাঁহার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক

সকল নিযুক্ত হইলেন। নরোত্তম যেমন দেখিতে সুন্দর ছিলেন, তেমনি তাঁহার বুদ্ধিও প্রখর ছিল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্য ও ব্যাকরণাদিতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিলেন। সকলেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

"নরোত্তমের চেষ্টা দেখি বিজ্ঞজন।
পরস্পর নিভৃতে কহয়ে গুণগান॥
কেহ কহে ইহা দেব অংশে অবতরে।
নহিলে কি মনুষ্য এমন শক্তি ধরে॥"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তম নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যিনি ভবিষ্যতে জীবনের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রভাবে যে জনসাধারণের চিত্ত মুগ্ধ করিবেন, সুকুমার বাল্যকাল হইতে সে ভাব তাঁহার হৃদয়ে সূচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ কুমারের বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কায়স্থ-পরিবারের সুন্দরী কন্যা অন্বেষণ করিবার জন্য কর্ম্ম-চারীদিগকে আদেশ করিলেন। কিন্তু নরোত্তমের প্রাণ-বিহঙ্গ রাজপদ এবং ঐশ্বর্য্যের সকল সুখের অতীত স্থানে—চিদানন্দ আকাশে বিচরণ করিতেছে। তিনি নিভৃতে হরিনাম কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। পাঠাবস্থায় তিনি গৌর ও তদীয় পার্ষদ-বর্গের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে-জন্য সর্ব্বদাই গৌর-লীলা-কথনে, ও অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ প্রভৃতির মধুর কার্য্যাবলী-প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এই সকল ভক্তদিগের প্রভাব এরূপ ভাবে তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল, যে তিনি বিবাহ ব্যাপারে একান্ত বীতরাগ—এই মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও বিবাহে অনিচ্ছা দর্শনে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। চিত্তের এইরূপ অবস্থায়, মানব সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, নরোত্তম পাছে সেই পথই অবলম্বন করে, সেজন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল। নরোত্তম

ইতোমধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নাম শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন; এখন তাঁহার দর্শন লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নরোত্তম সংসার হইতে পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শুধু সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাজবাটীর প্রহরীরা তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, বন্দীপ্রায় করিয়াছিল। কিন্তু নরোত্তমের মন বিষাদে পূর্ণ; তিনি হৃদয়ে শক্তি ও শান্তি লাভ করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় ভক্তদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেন। যথা নরোত্তম-বিলাসে;—

"নরোত্তম বন্দিপ্রায়, চিন্তে মনে মনে।
না দেখি উপায়, গৃহ ছাড়িব কেমনে॥
ঐছে চিন্তি চিত্তবৃত্তি না করে প্রকাশ।
কি হবে গৌরাঙ্গ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
নিতাই অদ্বৈত বলি, চারিদিকে ধায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধরণী লোটায়॥"

সেই সময় খেতরিগ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসও কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন। তিনি নরোত্তমের নিকট আসিলে নরোত্তম তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিতেন। কৃষ্ণদাস আসন গ্রহণ করিয়া গৌর-লীলা ও অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তদিগের জীবনের মধুময় কার্য্যসকল উত্থাপন করিতেন; এই সকল কথা শ্রবণে নরোত্তম দাসের ভাব-প্রবণ হৃদয় ভাবরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তিনি কৃষ্ণদাসের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "আরো বল, শুনিয়া প্রাণ জুড়াইয়া যাক্।"

কৃষ্ণদাস যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিতেন তাঁহারা আর ইহলোকে নাই। গৌর অপ্রকট হইয়াছেন; হরিদাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতিও ইহলোকাতীত। তখন নরোত্তম তাঁহাদের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন।

নরোত্তম যে ইহলোকে গৌর ও তদীয় ভক্তদিগের দর্শনে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন, এই চিন্তায় তাঁহার বক্ষঃ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; রাজভোগে তৃপ্তি নাই, বিষয়-বৈভবের মধ্যে শান্তি নাই, তাঁহার হৃদয়-পটে সততই গৌর-লীলার মনোহর ছবি উদিত হইয়া তাঁহাকে ভাবে বিভোর করিয়া রাখিত। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতির বৈরাগ্য-প্রণোদিত জীবনই তাঁহার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। গোপনে সংসার ত্যাগেই তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। মনের এইরূপ অবস্থায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। একদিন রজনীতে তিনি নিদ্রাবশে স্বপ্নে গৌরকে তাঁহার নিকটে আসিতে দেখিলেন। তাঁহার চিত্ত-বিমোহন রূপ, চাঁচর কেশ, কর্ণে কুণ্ডল, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষঃস্থল কণ্ঠে মনোহর মণিহার, পরিধানে ত্রিকচ্ছ বসন, পদযুগলে অতি মনোহর নূপুর। নরোত্তম কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে যেন লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন ও প্রভুর প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইলেন,—"সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর এবং শীঘ্র বৃন্দাবন গমন করিয়া, লোকনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।" এই বলিয়া গৌরমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলে, নরোত্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নরোত্তম আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না ; সুযোগ বুঝিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তাঁহার পলায়নের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা-রাণী শ্রবণ করিলেন যে তাঁহাদিগের একমাত্র পুত্র নরু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও তদীয় পত্নী পুত্র-শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। জননী "নরু নরু" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজকুমার মনের আনন্দে আপনার গম্যস্থানের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পাহারে বা অনাহারে দুরন্ত দুর্গম-পথে চলিতে চলিতে তাঁহার চরণে এক ব্রণ দেখা দিল। তিনি চলিতে অসমর্থ

হইয়া এক বৃক্ষতলে অচেতনপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন, ক্রমে একটু সুস্থ হইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বয়স এখন ষোড়শ বৎসর। যিনি স্বেচ্ছায় কত সুখে সংসারে বাস করিতে পারিতেন, তিনি আজ সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দীন-হীন কাঙ্গালের ন্যায় বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন!

নরোত্তম যাইতে যাইতে বারানসীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য এখানে চন্দ্রশেখরের বাটীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। নরোত্তম সে বাটী দর্শন করিলেন। তখন সেখানে একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করিতে-ছিলেন। নরোত্তম তৎপর সেখান হইতে প্রয়াগ ও তথা হইতে মথুরায় গমন করিলেন। তাঁহার চলচ্ছক্তি ক্রমে রহিত হইয়া পড়িল, শরীরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহার চিত্ত আনন্দে পূর্ণ। তিনি বৃন্দাবনে সাধুদিগের দর্শনে জীবন শীতল করিবেন, হৃদয়ে আরো বল লাভ করিবেন, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। কিন্তু চলিতে না পারিয়া বিশ্রাম-ঘাটে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিলেন। যেন তারের খবরের ন্যায় শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট নরোত্তমের পৌছানর খবর উপস্থিত হইল, তিনি নরোত্তমকে আপনার কুঞ্জে লইয়া আসিলেন। নরোত্তম গোস্বামীর চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। পথক্লান্তে ও অনাহারে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, জীব গোস্বামী তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক আপন কুঞ্জে স্থান দান করিয়া, অতি স্নেহ-সহকারে তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া তাঁহার শরীর সুস্থ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার কয়েকদিন গোস্বামীর কুঞ্জে অবস্থিতি করিয়া, একটু সুস্থ হইলে, জীব গোস্বামী তাঁহাকে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলেন।

এখানে ভক্ত লোকনাথ গোস্বামীর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পদ্মনাভ, মাতার নাম সীতা। লোকনাথ

ইঁহাদিগের একমাত্র পুত্র। লোকনাথ বাল্যকাল হইতে উপযুক্তরূপে শিক্ষা-লাভ করিয়া তরুণ যৌবনে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। পাঠা-বস্থায় তিনি শুনিলেন, যে গৌর নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্ত্তনে লোকের মন মাতাইয়া তুলিতেছেন। গৌরের ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সংসারের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাতাপিতা পুত্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকনাথ বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে পদ্মনাভ ও সীতাদেবীর মনে আরো চিন্তার উদয় হইল,---সন্তান বোধ হয় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন! কার্য্যেও তাহাই ঘটিল, লোকনাথের মন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমানন দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি একদিন নিশীথ-সময়ে নিদ্রিত মাতাপিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। তালখড়ি হইতে নবদ্বীপ প্রায় দুইদিনের পথ। লোক-নাথ গৌরোদ্দেশে ধাবিত হইয়া সকল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে উপনীত হইলেন ও নবদ্বীপে গৌর-ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। গৌর লোকনাথকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। লোকনাথ প্রভুর বাটীতে চারিমাস কাল অবস্থিতি করিলেন। তিনি এই কয়েকদিবস আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। তৎপর গৌর তাঁহার নিকট নিভৃতে বসিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "লোকনাথ, আমি আর দিন কয়েক পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, তুমি বৃন্দাবন গমন কর।" সেই স্থানে গৌরের শিষ্য ভূগর্ভ ছিলেন, তিনিও বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গৌরকে বলিলেন, "প্রভো! আমিও লোকনাথের সহিত বৃন্দাবন যাইতে চাই, যদি আপনার অনুমতি হয় তাহা হইলে যাইতে পারি।" গৌর ভূগর্ভের ইচ্ছায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। লোকনাথ ও ভূগর্ভ দুই একদিন পরেই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। দুর্গম পথ বাহিয়া উভয়ে চলিতে লাগিলেন।

কখন আহার জুটিতেছে, কখনও বা আহার জুটিতেছে না, তবুও সে-ক্লেশকে তাঁহারা ক্লেশ বলিয়াই অনুভব করিতেছেন না। হরিপ্রেমানন্দে তাঁহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বৃন্দাবনে যখন উপস্থিত হইলেন তখন বৃন্দাবনের অবস্থা এখনকার মত নহে। চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ। তাঁহারা বৃন্দাবনে গমন করিয়া অরণ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তীর্থ-স্থানের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ব্রজবাসীরা ক্রমে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা এই দুই অল্পবয়স্ক যুবকদ্বয়ের ব্যাকুলতা ও ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে অবাক্ হইয়া গেল। উভয়ের চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতেছে, উভয়েই কৃষ্ণ বিরহে আকুল। ব্রজবাসীরা এই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে তাহারা সেই গৌড়ীয় যুবকদ্বয়ের জন্য নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য ইঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরে, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রঘুনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বৃন্দাবনে গমন করিয়া, বৃন্দাবনের শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন ও বহুবিধ ভক্তিশাস্ত্র রচনা করেন। ক্রমে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার হইল, নানা স্থানে নানা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে বহু ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। এ সকলের মূল শ্রীগৌরাঙ্গ। সে-কথা আর এখানে বলিবার আবশ্যক নাই।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞানুসারে চিরঘাটে আপনাদিগের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, হরিনাম সাধনে ও হরিনাম কীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। আহার জুটিলে খাইতেন, নতুবা অনাহারেই দিন কাটাইতেন।

লোকনাথ এই জনকোলাহলশূন্য স্থানে সাধন ভজনে রত হইলেন, ভাবিলেন, যখন সকলই পরিত্যাগ করিলাম তখন এ জীবনে আর কাহাকেও শিষ্য করিব না। একাকীই কৃষ্ণ-আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিব।

জীব গোস্বামী যখন নরোত্তমকে লোকনাথের নিকট লইয়া গেলেন, তখন তিনি সনাতন ও রূপের বিচ্ছেদে অধীর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহার হৃদয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি মৌনভাবে আপন নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া রহিয়াছেন। জীব গোস্বামী নরোত্তমের পরিচয় প্রদান করিলে, লোকনাথের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ক্ষরিতে লাগিল। নরোত্তম ভক্তের চরণে প্রণিপাত করিলে, তিনি সন্ন্যাসী যুবক রাজকুমারকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। অল্প সময় পরে জীব গোস্বামী আপন আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে—নরোত্তম প্রায় একবৎসরকাল তথায় বাস করিয়া তাঁহার অলক্ষিতে মলমূত্রাদির মোচন করিয়াও সমুদয়রূপে সেবা করিয়াছিলেন। পরে তিনি জানিতে পারিয়া নরোত্তমের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তাঁহার বৃন্দাবন আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নরোত্তম বলিলেন, "প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণই আমার এখানে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" লোকনাথ জীবনে কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, এই সংকল্পেই নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। লোকনাথ নরোত্তমকে আপনার সংকল্পের বিষয় জ্ঞাত করিলেন; কিন্তু নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনি চরণে স্থান না দিলে আমি আর কোথায় যাইব।" নরোত্তমের ভাব দেখিয়া লোকনাথের হৃদয় গলিয়া গেল, —তাঁহার সংকল্প ভাঙ্গিয়া গেল; তবে তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিবেন কি না, সেই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নের বিষয় এই যে, তিনি আজীবন কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণে বিষয় বিমুখ হইয়া এবং মৎস্য, মাংস আহার না করিয়াও থাকিতে পারিবেন কি না? নরোত্তম লোকনাথের প্রত্যেক প্রশ্নটিতেই নিজের অভিমত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "প্রভুর আশীর্ব্বাদে আমি সকল গুলিই জীবনে পালন করিতে যত্নবান থাকিব। অপনার কৃপায় সকলই সম্ভব হইবে।"

লোকনাথ বহুদিনের সংকল্প পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া, নরোত্তমকে

দীক্ষা দানে স্বীকৃত হইলেন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দীক্ষা দানের দিন নিরূপিত হইল। জীব গোস্বামীর নিকট এ সংবাদ পৌছিল। গোস্বামী নরোত্তমের দীক্ষা-কালে উপস্থিত হইবার জন্য, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। দীক্ষার দিনে প্রাতঃকালে জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহামান্য ভক্তেরা সকলে বৃক্ষালতাদিপূর্ণ রমণীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। সমাগত ভক্তদিগের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্যও আগমন করিয়াছিলেন। লোকনাথ দীক্ষার্থীকে যমুনায় স্নান করাইয়া আনিলেন, পরে স্বকীয় আসন পরিগ্রহ করিলে জীব গোস্বামী নরোত্তমকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনে সুশোভিত করিয়া গুরুর সমীপে উপস্থিত করিলেন। লোকনাথ স্তব পাঠান্তে নরোত্তমকে যথারীতি, দীক্ষা দান করিলেন। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে হরি-ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজকুমার কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, সমাগত ভক্তবৃন্দের চরণে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দের পুত্র সকলের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, চিরদিনের জন্য, ভক্তি ও বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দীক্ষাকার্য্য শেষ হইলে শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে লইয়া আপন আশ্রমে গমন করিলেন। এখানে তিনি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষাদান করেন। বৃন্দাবনেই সংস্কৃত ভাষায় রাশী রাশী ভক্তিগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। জীব গোস্বামী এই তিনজনকে রীতিমত শিক্ষা দান করিয়া, বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনীতে তাহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে "আচার্য্য ঠাকুর" ও নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রদান করেন। বিষ্ণুপুরে

গ্রন্থ চুরি হইলে, "আচার্য্য ঠাকুর" গ্রন্থ না পাইলে আর জীবন রাখিব না—এই বলিয়া, তিনি ঠাকুর মহাশয়কে ও শ্যামানন্দকে গৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বে ইঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া খেতরির দিকে যাত্রা করেন। আচার্য্য ঠাকুর গ্রন্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন।

ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ একান্ত ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, পদ্মা পার হইয়া খেতরি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া খেতরির লোকেরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিল, অনেকে ছুটিয়া গিয়া, শোকার্ত্ত কৃষ্ণানন্দকে পুত্রের আগমন সংবাদ দান করিল। নরোত্তম ফিরিয়া আসিয়াছে, এ সংবাদ পাইবামাত্র রাজা ও রাণী, উভয়ে বাটীর দ্বারদেশে ছুটিয়া আসিলেন। ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত হইয়া মাতাপিতার চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহারাও কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ঠাকুর মহাশয় এখন আর রাজপুত্র নহেন; তিনি সন্ন্যাসী—ভক্তি পথের পথিক। ঠাকুর মহাশয় মাতাপিতাকে বলিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সন্ন্যাস-ধর্ম্মানুসারে সংসারে প্রবেশ করা নিষেধ। তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবার সময় যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাও মাতাপিতার গোচর করিলেন। তাঁহারা সন্তানের এ কথা শুনিয়া, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে তাঁহাদের অনুরোধে ঠাকুর মহাশয় বাটীর নিকটেই বাস করিতে সম্মত হইলেন। সন্তানের এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা যে তাঁহাদের একমাত্র পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবেন, ইহাতেই তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী রাজকুমারকে দেখিবার জন্য বহুলোক সমাগত হইল। রাজকুমার নরোত্তমের শরীর শীর্ণ; পরিধানে কৌপীন! এ-দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই প্রাণ বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। নরোত্তম সংসারের সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি

দিলেন দেখিয়া, রাজা কৃষ্ণানন্দ, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় পদ্মাতীরে বৃক্ষলতাদিপূর্ণ একটি কুটীরে শ্যামানন্দের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সাধন-ভজন ও হরিগুণ-কীর্ত্তনেই তাঁহাদিগের দিন অতিবাহিত হইত। ঠাকুর মহাশয় মাতাপিতার সন্তোষের জন্য প্রতিদিন তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া দেখা দিয়া আসিতেন। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দের উপর উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পিত হইয়াছিল। শ্যামানন্দ এ ভার সম্যক্‌রূপে পালন করিবার জন্য উৎকলে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ এক-প্রাণ ও এক-মন হইয়া বাস করিতেছিলেন। উৎকলে যাইবার পূর্ব্বে উভয়ে ভক্তিপ্রসঙ্গাদিতে রজনী যাপন করিলেন। প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের পাথেয় দিয়া দুইজন লোক সঙ্গে দিলেন। যুবরাজ সন্তোষ দত্ত ও ঠাকুর মহাশয় পদ্মাতীর পর্য্যন্ত শ্যামানন্দের সঙ্গে গমন করিলেন। বিষাদ-অন্তরে শ্যামানন্দ নৌকায় আরোহণ করিলেন। যাইবার সময় ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দকে পৌঁছানর সংবাদ দিতে বলিলেন।

ভক্তেরা তীর্থ দর্শন করিতে বড় ভালবাসেন। শ্যামানন্দ যাইবার পথে নবদ্বীপ, শান্তিপুর—শ্রীগৌরাঙ্গের ও অদ্বৈতাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র দর্শন করিয়া, ধারেন্দায় উপনীত হইলেন এবং সমভিব্যাহারী লোকদিগকে প্রত্যাবৃত্তের সংবাদ-সহ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। ভক্ত শ্যামানন্দ উৎকলে উপনীত হইয়া, উৎসাহের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্যামানন্দ উৎকলে যাত্রা করিলে, ঠাকুর মহাশয়ের তীর্থ-যাত্রার বাসনা হইল, তিনি মাতাপিতার নিকট আপনার মনের বাসনা নিবেদন

করিলেন। যদিও পুত্রের অদর্শনে তাঁহাদের মনে ক্লেশ হয়, তথাপি অনুমতি না দিয়া, থাকিতে পারিলেন না। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া, তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের লীলাক্ষেত্র দর্শনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও লীলাভূমি দর্শনের জন্য নবদ্বীপধামে গমন করিলেন। নবদ্বীপে মায়াপুর ধামে প্রবেশ করিয়া, তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রভুর বাসগৃহ কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে, ব্রাহ্মণও ঠাকুর মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বৃদ্ধ যখন শুনিলেন যে ইনিই নরোত্তম ঠাকুর, তখন তিনি দুই বাহু প্রসারিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাপু! আমার নাম শুক্লাম্বর! প্রভুর সঙ্গোপনের পর মনের বেদনা বক্ষে ধারণ করিয়া জীবিত রহিয়াছি।" তৎপর তিনি ঠাকুরের হস্ত ধরিয়া, প্রভুর বাটীতে লইয়া গেলেন। যাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিতেছে, সেই প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রুধারা বহিয়া যাইতে লাগিল। তিনি প্রভুর বাসগৃহ প্রভৃতি দর্শন করিলেন এবং "হা গৌরাঙ্গ, হা বিষ্ণুপ্রিয়া" বলিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। এখানে গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নরোত্তমের নাম ইতঃপূর্ব্বেই চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় কয়েকদিন নবদ্বীপে অবস্থিতি করিয়া, শান্তিপুর গমন করেন, তথায় অদ্বৈতাচার্য্যের বাসভবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া গঙ্গা পার হইয়া সপ্তগ্রামে গমন করেন। তৎপর তথা হইতে খড়দহে গমন করিলেন। এখানে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী ও তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র তাঁহাকে অতি সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, বাটীতে স্থান দান করেন; এবং যে কয়দিন ঠাকুর মহাশয় তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অতি আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহারাদি করাইয়াছিলেন। এখান হইতে ঠাকুর মহাশয় খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রবীণ বৈষ্ণব অভিরাম গোস্বামীকে দর্শন ও তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে যাত্রা করিলেন।

পথে চলিতে চলিতে যে স্থানে নিত্যানন্দ গৌরের দণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন, সে স্থান দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নরোত্তমের বৃন্দাবন গমন ও গ্রন্থ-চুরির কথা ইতঃপূর্ব্বেই নীলাচলে প্রচারিত হইয়াছিল। রাজপুত্র নরোত্তম অতুল বিষয়-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এ সংবাদে সকলেরই প্রাণে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। এখন নরোত্তম নীলাচলে উপস্থিত হইলে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঠাকুর মহাশয় প্রথমে গোপীনাথ আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। গোপীনাথ বৃদ্ধ হইয়াছেন। নরোত্তম আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। হৃদয়পটে বহুবিধ স্মৃতির উদয় হইয়া উভয়েরই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য তাঁহাকে জগন্নাথের মন্দিরে লইয়া গেলেন। জগন্নাথ দর্শনান্তে গোপীনাথ তাঁহাকে নিজ ভবনে আনিলেন। স্নান করিয়া জগন্নাথের প্রসাদ ভোজনান্তে তিনি ঠাকুর মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া কাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া গেলেন। গৌর শেষে অষ্টাদশবর্ষ কাল নীলাচলে মিশ্র-ভবনে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে স্থানে কলাপাতের শয্যায় শয়ন করিতেন, যে কন্থা গাত্রে দিয়া শীত নিবারণ করিতেন, যে খড়ম পায়ে দিতেন ইত্যাদি,—ঠাকুর মহাশয় সেই সকলই মিশ্র ভবনে দর্শন করিয়া ভাবে গদগদ হইতে লাগিলেন।

সমুদ্রতীরস্থ গদাধরের আশ্রমে ঠাকুর মহাশয় গমন করিলেন। গোপীনাথ বিগ্রহের গৃহ ও মহাপ্রভু যে স্থানে বসিয়া ভাগবত শ্রবণ করিতেন, ঠাকুর মহাশয় সকলই দর্শন করিলেন। দর্শন কালে তিনি 'হা গদাধর,' বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে ঠাকুর কয়েক দিন শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া নৃসিংহপুরে শ্যামানন্দের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্যামানন্দ যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন শ্যামানন্দের যশঃসৌরভ উৎকলের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে ভাবে নাম কীর্ত্তনে লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্খ সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্যে ও অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

সুবর্ণরেখাতীরস্থ রয়নী গ্রামের রাজা অচ্যুতানন্দের রসিকানন্দ ও মুরারি নামে দুই পুত্র শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা রাজপুত্র ও অত্যন্ত প্রভাবশালী। শ্যামানন্দ জাতিতে সদ্‌গোপ কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণও ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনে নৃসিংহপুরে যেন এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী রাজকুমার—ঠাকুর মহাশয়কে দেখিবার জন্য বহুলোক আগমন করিতে লাগিল। তাঁহার শুভাগমনে তিন চারিদিন ধরিয়া মহোৎসব হইয়াছিল। ভক্তদিগের প্রাণ ভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল—অভক্তজনও নব-জীবন লাভ করিয়া-হরিনামামৃত পান করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় যখন শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্যামানন্দের নিকট গমন করেন, তখন শ্রীক্ষেত্রের লোকেরা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই নিবেদন করেন, যেন শ্যামানন্দ একবার শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দকে নীলাচলবাসীদিগের এই অনুরোধ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি যেন শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া পরে বন্ধু-বান্ধবসহ খেতরিতে তাঁহার ভবনে গমন করেন। শ্যামানন্দসহ কয়েকদিন বাস করিয়া, ঠাকুর মহাশয় গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে আগমন করিলেন। সরকার ঠাকুরের পুত্র রঘুনন্দন, ঠাকুর মহাশয়কে দূর হইতে দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; এবং আপনার বাহুপাশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় রঘুনন্দনের চরণে প্রণত হইলেন। তৎপর সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত হইয়া তদীয় চরণে সভক্তিক প্রণাম

করিলেন। সরকার ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, এবং বলিলেন, "দীর্ঘজীবি হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর, প্রভু তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।"

"শ্রীঠাকুর নরোত্তম পানে নিরখিয়া।
নেত্রজলে সিঞ্চে স্নেহাবেশে আলিঙ্গিয়া।
"প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিবে তোমার।
হইয়া চিরায়ু ভক্তি করিবা প্রচার।''—ভক্তিরত্নাকর।

কিছুক্ষণ পরে রঘুনন্দন তাঁহাকে গৌর-প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীখণ্ডের বহু লোক আসিয়া গৌর-প্রসঙ্গে সে স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঠাকুর মহাশয়ও গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি দর্শনে পরম ভক্তের ভাবে তথায় লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন তৎপর ঠাকুর মহাশয়কে আপন ভবনে আনিলেন। সরকার ঠাকুর বলিলেন, "নরোত্তম, তুমি যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সহিত দেখা করিয়া গৃহে যাইবে। তিনি তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন।" ঠাকুর মহাশয় পর দিন তথা হইতে যাজিগ্রামে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় যখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি শিষ্যদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেছিলেন। সেই বনবিষ্ণুপুরে পুস্তক চুরির পর হইতে নরোত্তমের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইল তিনি তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। নরোত্তম ভক্তিপূর্ব্বক আচার্য্য ঠাকুরের চরণে প্রণত হইলেন। আচার্য্য ঠাকর ব্যাসাচার্য্যের সহিত নরোত্তম ঠাকুরের পরিচয় করিয়া দিলেন। ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যকে খেতরিতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপনের বাসনা অবগত করাইলে, আচার্য্য ঠাকুর তদ্বিষয়ে অনেক উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহার আয়োজন কর, সংবাদ পাইলেই আমি সদলে গমন করিব।" পরে তিনি কাটোয়ায় গমন করিলেন। কাটোয়া

ভারতের একটি প্রধান তীর্থস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর মহাশয় তথায় আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষা-স্থল কেশব ভারতীর আশ্রম দর্শন করিলেন, এবং ভাবাবেশে তথায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কাটোয়া হইতে তিনি নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচাকা গ্রাম দর্শন করিয়া নিজ গ্রাম খেতরিতে উপনীত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিলে কৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "বাবা আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাকে এক একবার দেখিলেও আমাদের প্রাণ জুড়াইয়া যায়। আমরা যতদিন জীবিত থাকিব তুমি আর আমাদের ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইও না।" নরোত্তম সন্ন্যাসী হইলেও পিতার এই স্নেহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি আর আপনাদের ছাড়িয়া তীর্থ-স্থানে যাইব না।" ঠাকুর মহাশয় তৎপর আপনার ভজন-কুটীরে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর মহাশয় যখন শ্রীখণ্ডে গমন করেন তখন গৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার প্রাণে ঐরূপ মূর্ত্তি খেতরিতে স্থাপনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আরও এক প্রবাদ আছে,—গৌর, ঠাকুর মহাশয়ের স্বপ্নাবস্থায় স্ব-প্রকাশ হইয়া বলেন, "বিপ্রদাসের ধান্য-গোলার মধ্যে আমার যুগলমূর্ত্তি আছে, তুমি তাহা আনিয়া স্থাপন করিবে।" যাহাই হউক, ঠাকুর মহাশয় বিগ্রহ স্থাপনের বাসনায় কৃতসংকল্প হইয়া পিতাকে আপনার সংকল্পের কথা জ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণানন্দ পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন যে, বিগ্রহ স্থাপনের জন্য তিনি খেতরিতে এরূপ উৎসবের আয়োজন করিবেন, যেরূপ আর কখন গৌড়দেশে কেহই দেখে নাই। যুবরাজ সন্তোষ দত্তও ঠাকুর মহাশয়ের শুভ-সংকল্পের কথা শ্রবণ করিয়া খুব উৎসাহিত হইলেন, এবং এক মহোৎসবের আয়োজনের জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর তখন বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী; এই মহৎ-ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হইয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ না করিলে আর কে করিবে? ঠাকুর মহাশয় শুনিলেন,—আচার্য্য ঠাকুর বুধরিতে বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। এদিকে রাজবাটী হইতে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল; ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য মহাশয়কে আনিবার জন্য বুধরিতে গমন করিলেন। বুধরি গ্রামে তিনি উপস্থিত হইলে, তাঁহার আগমন বার্ত্তা আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। আচার্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য ব্যাসাচার্য্য ও রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। দুইজনে তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া, আচার্য্য-ভবনে আনয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরস্পর কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হইলে, ঠাকুর মহাশয় বিগ্রহ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহোৎসবের আয়োজনের কথা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, "আপনি গমন করিয়া, এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিবেন।" আচার্য্য ঠাকুর বিগ্রহ-স্থাপনের প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি যে এই মহোৎসবে যাইয়া, পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। ফাগুন-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি উপলক্ষে বিগ্রহ স্থাপিত হইবে, ইহাই স্থির হইল। আচার্য্য নরোত্তম ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি অগ্রে ব্যাসাচার্য্যকে লইয়া গমন কর, আমি ও রামচন্দ্র প্রভৃতি অপর কয়েকজন কয়েকদিন পরে গমন করিব। গৌড়ের ও উৎকলের সমস্ত স্থানে গৌর-ভক্তদিগের নিকট পত্র প্রেরিত হইবে স্থির হইল। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস সুললিত সংস্কৃত পদ্যে পত্র রচনা করিলেন। বড় বড় মহান্তদিগের নামের ফর্দ্দ হইল, এবং পত্রে ইহাও লেখা হইল যে, সকলের নাম জানা না থাকায়, সকলের নিকট পত্র প্রেরিত হইল না। এইজন্য প্রত্যেকেই যেন গৌর-ভক্তদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে করিয়া আগমন করেন।

পরদিন প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় ব্যাসাচার্য্যের সঙ্গে খেতরি-যাত্রা

করিলেন। মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিতদিগের থাকিবার জন্য খেতরির চারিদিকে গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। আচার্য্য ঠাকুরের জন্য একটি নির্জ্জন স্থানে গৃহ নির্ম্মিত হইল। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া গেল। শত শত খোল-করতালের বাদ্যের জন্য ব্যবস্থা করা হইল। বিগ্রহ স্থাপনের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইল। সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সমাধানের জন্য, বহুলোক নিয়োজিত হইল। কৃষ্ণানন্দ ও সন্তোষ দত্ত এই মহোৎসবের জন্য বহুল অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উৎসবের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই নানাস্থান হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুরের পত্নী জাহ্নবা দেবী, চৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি বহু গৌর-ভক্ত সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন। ক্রমে শত শত মহান্তেরা আগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ ও সন্তোষ দত্ত সকলেরই থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতে, সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইয়া, খেতরি পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

মহোৎসবের দিন উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে সুবিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ-তলে, মহান্তদের স্নানান্তে তাঁহাদিগকে লইয়া কৃষ্ণানন্দ দত্ত নূতন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। সকলের গলে পুষ্পমাল্য প্রদান ও ললাটে চন্দন লেপিয়া দেওয়া হইল। শত শত নূতন খোল করতাল সভার মধ্যে রক্ষিত হইল। আচার্য্য ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়া ও চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে চন্দ্রাতপ-তলে আগমন করিলেন। পূর্ব্ব

হইতেই স্থির হইয়াছিল, ইনিই বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। আচার্য্যতদনুসারে সকলের সমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধিকার মোহন-মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। হরিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল; আনন্দ-কলরবে খেতরির আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এইবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। নরোত্তম বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া করতাল হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদকেরা মৃদঙ্গ লইয়া, তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মধুর স্বরে ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তিনি ভাব-মুগ্ধ হইয়া, নূতন পদাবলীসহ সুতানে কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সেরূপ শ্রাব্য পদাবলী—সেরূপ মধুর স্বর কেহ কখন শুনে নাই। ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তনে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কীর্ত্তনের মধুর ভাবে পাষণ্ডসম প্রাণও বিগলিত হইয়া গেল। ঠাকুর মহাশয়ের এই নব-রচিত কীর্ত্তনের নাম "গড়াণহাটি কীর্ত্তন" হইল। কারণ উহা গড়াণহাটি পরগণার মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ক্রমে ভাবের উচ্ছ্বাসে সকলে যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর মহাশয়ের মুখে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তনীয়াদিগের সঙ্গে করতালি দিয়া, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রের ভাব দেখিয়া তিনি তাঁহাকে নর-লোকের অতীত মনে করিতে লাগিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ সন্তানের মুখপানে তাকাইতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পড়িয়া, বলিতে লাগিলেন,—"বাপু! তুমি আমার কুল পবিত্র করিলে।"

কৃষ্ণানন্দ মজুমদার স্বগণ সহিতে।
সকলে পড়য়ে ভূমে কান্দিতে কান্দিতে॥

*　*　*　*

ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখপানে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে ধরিঞা চরণে॥

পবিত্র করিলা বাপু স্বগণ সহিতে।
হেন সুখ কে দেখিল জন্মি পৃথিবীতে॥
বৃন্দাবন সমসুখ হৈল মোর ঘর।
মোর যতগণ নরোত্তমের কিঙ্কর॥"

কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে এক একবার গৃহে গমন করিয়া, বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া, কীর্ত্তনের স্থানে আনিয়া, সেগুলি সকলের সমক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাঁহার ইচ্ছা কৃপাপূর্ব্বক লউন—এই তাঁহার বিনীত নিবেদন।

"যখন কীর্ত্তনে সব লাগিলেন দিতে।
ঘর হইতে আনি দেয় যে পড়য়ে হাতে॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে-দিন সায়ংকালে বিগ্রহের আরতির সময় আবার সকলে মিলিত হইলেন। সংকীর্ত্তনাদিতে কিছুকাল অতীত হইলে পর সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন। এইরূপে আর দুই দিবস সকল মহান্তেরা খেতরিতে অবস্থিতি করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। যাইবার সময়ও পাত্র-নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণানন্দ সকলকে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি যথাযোগ্য বস্তু দান করিয়াছিলেন। পদ্মার তীরে শত শত নৌকা তাঁহাদিগকে পার করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিদায়কালে কৃষ্ণানন্দ ও যুবরাজ সন্তোষ দত্ত সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে আচার্য্য ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ খেতরিতে রহিয়া গেলেন।

এই মহোৎসবের হিল্লোলে বহু লোকের প্রাণ শীতল হইয়াছিল। অনেকের পাষাণসম হৃদয় সংকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে বিগলিত হইয়াছিল। কত শত দুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে নরোত্তমের চরণে পতিত হইয়া, তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। ঠাকুর

মহাশয়, অতি দীনভাবে সকলকে ভগবৎ-নাম-কীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গ এবং বৈষ্ণবের সম্মান করিতে উপদেশ দিলেন, যথা নরোত্তম বিলাসে,—

"নিরন্তর সাধু-সঙ্গ কর সর্ব্বজন।
অতি দীন হইয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
বৈষ্ণবের স্থানে সদা হৈবে সাবধান।
যেন কোনমতে কার নহে অসম্মান ॥"

এই মহোৎসবের প্রভাবে শত শত ব্যক্তি নব-জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া, ভক্তি ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। উৎসবের সমাচার দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল—নরোত্তমের গুণাবলী সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

আচার্য্য ঠাকুর, রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয় একসঙ্গে হরিকথা-প্রসঙ্গে ও হরিগুণ-কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য ঠাকুরের জন্য, পূর্ব্বেই স্বতন্ত্র এক আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি সেই স্থানেই বাস করিতেন। একমাস পরে, আচার্য্য যাজিগ্রামে গমন করিলেন। কেবল রামচন্দ্র রহিয়া গেলেন।

ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত বাস করিয়া, ক্রমে উভয়ে এক-প্রাণ ও এক-আত্মা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা একসঙ্গে সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শন করেন, কখন করতালি দিয়া একসঙ্গে নৃত্য করেন। সমস্ত দিন তাঁহারা হরিকথা-প্রসঙ্গে, হরিগুণ-কীর্ত্তনে ও ভাগবতাদি পাঠে যাপন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় চিরকুমার, কিন্তু রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহিত। তথাপি রামচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন না।—

"রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়।
শয়ন ভক্ষণ স্নান একস্থানে হয় ॥
নিরবধি কৃষ্ণলীলা কথন বিচার।
দিন রাত্রি নাহি জানে হেন প্রীতি যার।"

রামচন্দ্র আর গৃহে গমন করেন না। তাঁহার পত্নী রত্নমালা ঠাকুর

মহাশয়কে একখানি পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, তাঁহার স্বামী ঠাকুর মহাশয়ের নিকট থাকুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তিনি এক একবার স্বগৃহে আগমন করেন এই তাঁহার প্রার্থনা। কোমল-হৃদয় নরোত্তম রত্নমালার এই পত্র পাঠ করিয়া, রামচন্দ্রকে বাড়ী যাইতে অনুরোধ করেন। কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না, তিনি বাড়ীতে গমন করিলেন। রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময় তাঁহার মনে হইল, আমি সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি, আর ঠাকুর মহাশয় তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন—এই চিন্তা মনে উদয় হইবামাত্রই তিনি শয্যা-ত্যাগ করিয়া খেতরিতে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া বিগ্রহের মন্দিরের ঝাঁটা লইয়া ঝাঁট্ দিতে লাগিলেন এবং এক এক বার নিজ পৃষ্ঠে ঝাঁটা মারিতে লাগিলেন। প্রাতে ঠাকুর মহাশয় আসিয়া দেখেন রামচন্দ্র স্বহস্তে প্রাঙ্গণে ঝাঁট দিতেছেন এবং গৃহে গিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া নিজ পৃষ্ঠদেশে সেই ঝাঁটায় আঘাত করিতেছেন। ঠাকুর মহাশয় তখন তাঁহাকে এই কার্য্যে নিবৃত্ত করিয়া ভজন-কুটীরে লইয়া আসিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সে-সময় শাক্ত-ধর্ম্মই অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় অনেকেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলরাম মিশ্রও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সে-সময় শিবানন্দ সেন নামে এক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গয়েসপুর গ্রামে বাস করিতেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। দুর্গোৎসবের সময় হরিরাম ও রামকৃষ্ণ দেবতার বলির নিমিত্ত ছাগ ও মহিষ ক্রয় করিতে পদ্মা পার হইয়া খেতরিতে আগমন করেন। তাঁহারা নৌকাযোগে তীরে উপস্থিত হইলেই ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র উভয়ে স্নান করিবার জন্য পদ্মার ঘাটে গমন করেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র উভয়ে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা

করিতেছিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্রদ্বয় ইঁহাদের আলোচনা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে ইঁহারা নরোত্তম ও রামচন্দ্র। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয়ও ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া দিলেন। তখন হরিরাম ও রামকৃষ্ণ পরাভব স্বীকার করিলেন এবং ছাগাদি ক্রয় না করিয়া ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের ভজন-কুটীরে গমন করিলেন।

ভক্তদিগের জীবনের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। শিবানন্দের পুত্রেরা দেখিলেন যে ইঁহারা কেবল পণ্ডিত নহেন—ইঁহারা পরম ভাগবত। তখন ইঁহাদিগের মধুর ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সে-দিন সেইখানে অবস্থিতি করিলেন। রজনীতে শয়ন করিয়া দুইভাই পরস্পর এই আলোচনা করিতে লাগিলেন যে শুধু ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেই মানব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এমন নহে, শূদ্র যদি ভগবদ্ভক্ত হয় তবে তিনিও প্রকৃত ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন। নরোত্তম দাস শূদ্র-কুলে জন্মিলে কি হইবে?—গুণে ও কর্ম্মে ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। আর ইঁহাদিগের পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। এই সকল আলোচনা করিয়া তাঁহারা ইঁহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণে কৃতসংকল্প লইলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদিগের মনের অন্ধকার দূর হইয়া গেল। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের পদতলে দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র তাঁহাদিগের জীবনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষাদানে সম্মত হইলেন। হরিরাম রামচন্দ্রের নিকট এবং রামকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই দুই দীক্ষাগুরু তাঁহাদিগের প্রাণে নব-শক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্ম-জীবন দান করিলেন। দীক্ষান্তে তাঁহারা ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অত্যন্ত প্রবল, জাতিভেদ প্রথার বন্ধনে

লোকের হৃদয় আবদ্ধ, সে-সময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা সামান্য ব্যাপার নহে! গয়েসপুরের শিবানন্দ সেনের পুত্রদ্বয় কায়স্থ ও বৈদ্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে চারিদিকে তীব্র আন্দোলন চলিল। শিবানন্দ সেনের নিকটও এই সমাচার উপস্থিত হইল। শ্রবণমাত্র তাঁহার নিকট ইহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! কিছুদিন পরে পুত্রদ্বয় বাটীতে গমন করিয়া পিতৃ-চরণে প্রণত হইলে, পিতা ক্রোধে অধীর হইয়া "দূর দূর" বলিয়া তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনা করিলেন। পুত্রদ্বয় বিনীতভাবে পিতার নিকট ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ভগবদ্ভক্তেরাই যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকারী,—ইহা বিশেষরূপে ব্যক্ত করিলে, পিতা বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য তৎকালীন মথুরা নগরের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আনয়ন করিলেন। মুরারিও বিচারে পরাস্ত হইলেন, এবং ইহাতে এতই লজ্জিত হইয়াছিলেন যে, সেই অবধি তিনি আর দেশে গমন করেন নাই। দিগ্বিজয়ী মুরারিও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় হরিনাম ঘোষণায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

"পরাভব হয়ে দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণব-মহিমা কহি মোর সাধ্য নাই॥
এত কহি দ্রব্য সব কৈল বিতরণ।
লজ্জাহেতু দেশে পুন না কৈল গমন॥
ভিক্ষা ধর্ম্ম আশ্রয় করিল সেইক্ষণে।
"মুরারি তৃতীয় পন্থা" কহে সর্ব্বজনে॥"

হরিরাম ও রামকৃষ্ণ কায়স্থবংশ-সম্ভূত ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে, চারিদিকে এই ঘটনা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যদিও সকল শ্রেণীর লোক ঠাকুর মহাশয়কে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত তবু প্রচলিত প্রথার উপর নরোত্তম ঠাকুরের হস্তক্ষেপ দেখিয়া, ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতি রূঢ়-বাক্য প্রয়োগ

করিতে বিরত হন নাই। কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "তুমি সাধু পুরুষ আছ থাক; নিজ সাধন-ভজন কর, কিন্তু কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিবার তোমার কি অধিকার আছে?" পরমভক্ত বিনয়ের অবতারস্বরূপ নরোত্তম ঠাকুর মস্তক পাতিয়া সকলের কটু-বাক্য সহ্য করিতেন। ভক্তির রস-মাধুরীতে মানুষের প্রাণ যখন পূর্ণ হইয়া উঠে তখন সে কি আর সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে? জ্ঞান ও ধনের গর্ব্ব এবং জাতি-কুল-মান পরিত্যাগ করিয়া সেই রসের আধার পরমেশ্বরের দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথীর তটবর্ত্তী বালুচরের নিকটে গাম্ভিলা গ্রামে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। তৎকালে ভাগবতে ইঁহার তুল্য কাহারও অধিকার ছিল না। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন। তিনি যখন শুনিলেন যে সুপণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয়, হরিনারায়ণ ও রামকৃষ্ণ কায়স্থ নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি ঐ কার্য্য দোষাবহ বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অপ্রীতিকর অভিমত প্রকাশ করিতেও বিরত হন নাই।

একদিন ঘটনাক্রমে হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত গাম্ভীলাগ্রামে গঙ্গানারায়ণের সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গানারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়কে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তোমরা সুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া কায়স্থের নিকট কিরূপে মন্ত্র গ্রহণ করিলে—তোমরা অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।" হরিরাম ও রামকৃষ্ণ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, যে ব্যক্তি যথার্থ ভবগদ্ভক্ত তিনিও যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

ইঁহাদিগের মধুর ব্যবহার দর্শন ও কথা শ্রবণ করিয়া গঙ্গানারায়ণের কেমন এক ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় ও ভক্তিতত্ত্বের কথায় প্রায় সমস্ত রজনী যাপন করিলেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি বৃথা জ্ঞানের অহঙ্কার করি। আমার জীবন কি শুষ্ক ও নীরস ? এই যে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ—ইঁহাদের জীবন কি মধুময়! যে জিনিষে মানুষকে এত বিনয়ী করে ; হৃদয়কে কোমল ও মধুময় করে সেই ভক্তি কি পরম পদার্থ! আবার যে ব্যক্তির প্রভাবে ইঁহারা ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়াছেন সেই নরোত্তম ঠাকুর কত বড় ভক্ত! —এই সকল চিন্তা করিতে করিতে পণ্ডিতবর গঙ্গানারায়ণের চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইবেন, এই স্থির করিলেন। তাঁহার প্রাণে ধিক্কার আসিল, যথা নরোত্তম বিলাসে ঃ—

> "ধিক্ ধিক্ কিবা ফল এ ছার জীবনে।
> গোঙাইলু জন্ম বৃথা কৃষ্ণ ভক্তি বিনে॥
> ওহে নরোত্তম প্রভু দেহ ভক্তি ধন।
> তুয়া পাদপদ্মে মুঞি লইলুঁ স্মরণ॥"

রাত্রি প্রভাত হইল। গঙ্গানারায়ণ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাইবার জন্য হরিরাম ও রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা গঙ্গারামকে লইয়া খেতরিতে গমন করিলেন। গঙ্গারাম ঠাকুর মহাশয়ের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমি অতি অহঙ্কারী, আজ আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দীক্ষাদানে আমাকে উদ্ধার করুন। ঠাকুর মহাশয় এত বড় পণ্ডিতের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গানারায়ণকে বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার

করিয়া, তাঁহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য গঙ্গানারায়ণ নব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নব-জীবন লাভ করিলেন।

গঙ্গানারায়ণ ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অতি নিবিষ্ট-চিত্তে ভক্তি-শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভক্তি-শাস্ত্রেও বিশেষ অধিকার লাভ করিলেন। একদিকে গভীর পাণ্ডিত্য, অপরদিকে মধুময় ভক্তি—এই উভয়ের সমাবেশে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়া উঠিল; তিনি এক নূতন মানুষ হইয়া উঠিলেন। গঙ্গানারায়ণের দীক্ষাও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিস্তারের অনেক সহায়তা করিয়াছিল। পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক 'চক্রবর্ত্তী ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর—কুলীন ব্রাহ্মণ—গঙ্গানারায়ণের কায়স্থ সমীপে দীক্ষা-গ্রহণের কথা চারিদিকে যেন প্রবল স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইল। ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী অধিকতররূপে কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং নরোত্তম ঠাকুরের এ অধিকার নষ্ট করিবার জন্য বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পক্কপল্লীবাসী রাজা নরসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা রাজার নিকট বলিলেন—"নরোত্তম কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছেন, তাঁহার এ প্রভাব খর্ব্ব করিতে না পারিলে দেশ উৎসন্ন যাইবে। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িবে; আপনি রাজা, ধর্ম্ম রক্ষাই আপনার প্রধান কার্য্য; অতএব ইহার প্রতিবিধান করিয়া দেশে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান হউন, এই আমাদের প্রার্থনা।"

রাজা নরসিংহ ঠাকুর মহাশয়ের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু কি করেন, ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি কয়েকজন অধ্যাপক ও তাঁহাদিগের ছাত্র সঙ্গে করিয়া খেতরির নিকটবর্ত্তী কুমারপুর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নরসিংহের আগমন—বার্ত্তা খেতরির চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িল। ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই সমাচার পঁহুছিল যে রাজা নরসিংহ পণ্ডিতবর্গ লইয়া শাস্ত্র বিচার করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। ঠাকুর-মহাশয় এ সংবাদে কিছু ভীত হইয়া পড়িলেন, কারণ বৃথা তর্ক করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, আর এরূপ তর্কে সময় নষ্ট হইবে এবং তাঁহার সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হইবে। রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের মনের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, "আপনি ইহার জন্য কিছু চিন্তা করিবেন না, ইহার উপায় আমরা বিধান করিতেছি।" তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে, রামচন্দ্র বারুই ও গঙ্গানারায়ণ কুম্ভকার সাজিয়া বাজারে বসিবেন, কারণ ছাত্রগণ পান ও হাঁড়ি কিনিতে আসিলে তাঁহারা ক্রেতাদিগের সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিবেন, তাহা হইলে উঁহারা বুঝিবেন—যে স্থলের হাটের বিক্রেতারাও সংস্কৃত কথা বলে, সে স্থলে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত বিচার করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। এই স্থির করিয়া রামচন্দ্র পান লইয়া ও গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ি লইয়া বাজারে বসিলেন। কুমারপুর হইতে অধ্যাপকদিগের ছাত্রেরা পান ক্রয় করিতে আসিলে, রামচন্দ্র সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলিলেন, হাঁড়ি-বিক্রেতা গঙ্গানারায়ণও ক্রেতার সহিত সেইরূপ করিলেন। ছাত্রবর্গ পান ও হাঁড়ি বিক্রেতাদিগের সংস্কৃত-ভাষার জ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং ছুটিয়া গিয়া এ-সমাচার অধ্যাপকদিগকে জ্ঞাত করিলেন। প্রথমে পণ্ডিতগণ এ-কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই পরে ছাত্রদের অনুরোধে রাজার বড় বড় অধ্যাপকেরা সকলে বাজারে সমবেত হইলেই পান ও হাঁড়ি বিক্রেতার সহিত শাস্ত্রালোচনা হইতে লাগিল। প্রথমে পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের গভীর জ্ঞানের বিষয় বুঝিতে সমর্থ হন নাই, পরে আলোচনা করিতে করিতে পান ও হাঁড়ি বিক্রেতার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং বিচারেও পরাস্ত

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজা নরসিংহ এ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বগণ-সহ খেতরিতে গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ সকলকে বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করিলেন, রাজা নরসিংহ ঠাকুর মহাশয়ের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কর্ণে মন্ত্র-দান করিলেন।

দীক্ষা গ্রহনান্তে রাজা নরসিংহ খেতরিতেই বাস করিতে লাগিলেন, আর গৃহে ফিরিলেন না। তাঁহার পত্নী রূপমালা স্বামীর জীবনের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের কথা শ্রবণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া খেতরিতে আগমন করিলেন। তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় ভগবৎ-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

"রাজা নরসিংহের ঘরণী রূপমালা।
অতি পতিব্রতা লজ্জাবতী সে সুশীলা॥
তাঁর ভক্তি রীতি দেখি আনন্দ হৃদয়।
করিলেন মন্ত্র প্রদান মহাশয়॥
রূপমালা মনে বহু বাড়িল আনন্দ।
করিলেন লক্ষ নাম গ্রহণ নিবন্ধ॥"

রাজমহলের রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায় ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। চাঁদরায়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানেরা ভীত হইত। তিনি বহু লোককে কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী হইয়া জীবনকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলেন। নরোত্তমের কৃপায় তিনি জীবনের অসৎ কার্য্যসকল পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন কোন কোন দুষ্ট-বুদ্ধি রাজা প্রায় লুণ্ঠনাদির দ্বারা আপনাদিগের

রাজকোষ অর্থে পূর্ণ করিতেন,—বাহুবলের দ্বারা অপরের রাজত্ব অধিকার করিয়া, আপনাদিগের রাজত্ব ও বিস্তার করিতেন। নরোত্তম এইরূপ ক্ষমতাশালী, ঐশ্বর্য্যমত্ত রাজাদিগকে হরিনামের মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া,—তাঁহাদিগের জীবনের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক বিরুদ্ধ আন্দোলন ক্রমে থামিয়া গেল। চির-প্রচলিত সামাজিক প্রথার উপরে সত্যের ও ভক্তির জয় ঘোষিত হইল। ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী হইলে, মানুষ যে কত শক্তি ধারণ করিতে পারে লোকে নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে খেতরিতে তীর্থস্থানের ন্যায় লোকের সমাগম হইতে লাগিল। পাঠ-কীর্ত্তন প্রভৃতিতে উহা সর্ব্বদা মুঞ্জরিত হইয়া থাকিত, খেতুরি নিত্যোৎসবপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঠাকুর মহাশয়ের বৃদ্ধ মাতা-পিতা ক্রমে ক্রমে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুত্র যথারীতি তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

উচ্চ সাধকেরা যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু হইয়া আত্মার কল্যাণের জন্য সতত নির্জ্জনতা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ক্রমে খেতরি যখন জন-কোলাহলে পূর্ণ হইতে লাগিল তখন ঠাকুর মহাশয় নিজ গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বৃক্ষলতাদি পরিবেষ্টিত নির্জ্জন স্থলে দুইটি কুটীর নির্ম্মিত হইল। নাম হইল—'ভজন-স্থান।' ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র দুইটী প্রকোষ্ঠে দুইজনে বাস করিয়া, ধ্যান, ভজন ও সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু উভয়ের পৃথক কুটীর হইলেও দুই ভক্তে অনেক সময় এক কুটীরে বসিয়া, নাম-কীর্ত্তনাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই ভজন-স্থলে বসিয়াই নরোত্তম ঠাকুর অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যেমন মহাভক্ত তেমনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার পদাবলী লোকের প্রাণে যেন সুধা ঢালিয়া

দেয়। তাঁহার প্রার্থনামালা এক অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া, অসংখ্য বঙ্গবাসীর কণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

ঠাকুর মহাশয় এইরূপে জীবন কাটাইতেছেন, এমন সময় আচার্য্য ঠাকুরের একখানি চিঠি তাঁহার হাতে আসিল। চিঠির মর্ম্ম এই যে তিনি বৃন্দাবন যাইতে অভিলাষ করিয়াছেন, যদি রামচন্দ্র তাঁহার সঙ্গী হন্, তাহা হইলে ভাল হয়, নতুবা তিনি একাকী যাইতে সাহস করেন না। ঠাকুর মহাশয়, চিঠিখানি পাঠ করিয়া, রামচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন, আচার্য্য ঠাকুর তাঁহার গুরু। রামচন্দ্র গুরুদেবের পত্র লইয়া মস্তকে স্পর্শ করতঃ উহা পাঠ করিলেন, পাঠান্তে তাঁহার বদনমণ্ডল যেন মেঘাবৃত হইয়া পড়িল। ঠাকুর মহাশয়কে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এই চিন্তাতে হৃদয়ে যেন শেল-বিদ্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় অবশেষে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন তুমি তাঁহার সঙ্গে গমন কর।" অবশেষে রামচন্দ্রের বৃন্দাবন গমনই স্থির হইল। যাইবার সময় গৌরাঙ্গ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উভয়ে মিলিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, রামচন্দ্র তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সহিত বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন।

যাঁহারা একত্র এক-মন ও এক-প্রাণ হইয়া বাস করিতেছিলেন পরস্পরের বিচ্ছেদে তাঁহাদের উভয়ের প্রাণে যে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। রামচন্দ্রকে বিদায় দিয়া ঠাকুর মহাশয়, আপনার কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এখন হইতে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি কাহারও সঙ্গে প্রায় আর কথা বলিতেন না। নীরবে সাধন-ভজনে ও সময়ে সময়ে গ্রন্থ রচনায় দিন অতিবাহিত করিতেন। গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন লোক সর্ব্বদা তাঁহার সেবার জন্য কুটীরের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন; কিন্তু পাছে তাঁহার ভজনের কোন ব্যাঘাত হয়, সেজন্য কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না।

ঠাকুর মহাশয় পরম বৈরাগী হইলেও রামচন্দ্রের বিচ্ছেদে তাঁহার প্রাণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছিল। হইবারই কথা; যাঁহার সহিত তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গে দিনযামিনী যাপন করিতেন, সে-সুখ হইতে তিনি যে আজ বঞ্চিত!

দশম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বা আচার্য্য ঠাকুর আর কেহই আইসেন না; ক্রমে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন নরোত্তম ঠাকুর রামচন্দ্রের ফিরিবার আশায় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্রের বিচ্ছেদে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। তিনি সে সময় যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:—

"রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ
তাঁর সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গে হয় যেন,
নরোত্তম তবে হবে ধন্য॥"

ঠাকুর মহাশয় মনের এইরূপ অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন, এমন সময় শুনিলেন, রামচন্দ্র বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ-হেন নিদারুণ সংবাদে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে:—

"ঠাকুর মহাশয় স্থির হইতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ওহে রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি।
এত কহি কণ্ঠ রুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে তনু ত্যাগ করেন। ঠাকুর মহাশয় উভয়ের

শোকে তাঁহার পদাবলীর মধ্যে আপনার মনের দুঃখ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল।
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণে রামচন্দ্র ছিলা, সে-হ সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
তটযুগ দয়া কর মোরে ;
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস রামচন্দ্র যাঁর দাস
পুনঃ নাকি মিলিব আমারে॥
না দেখিয়ে সে না মুখ বিদরিয়া যায় বুক
বিষ-শরে কুরঙ্গিনী হেন।
আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
নরোত্তমের হেন দশা কেন॥"

পদাবলীর আর এক স্থল এই ঃ—

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীনিবাস, গদাধর,
নরহরি, মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ, দামোদর, হরিদাস, বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শীলা,
তাহা মুঞি না পাই দেখিতে।
তখন না হল জন্ম, না বুঝিনু সেই মর্ম্ম,
এই শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব, লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, কৈল কি মধুর কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥

সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আঁধল হইল এ না আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল,
দুঃখে জিউ করে আন্‌চান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্! ধিক্! নরোত্তম দাস॥"

এই সকল প্রিয়জনের বিরহে, ঠাকুর মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি একদিন গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে গৌরচন্দ্রের উদ্দেশে সকলের জন্য শুভ-কামনা করিলেন এবং তৎপর গঙ্গানারায়ণের বাটী গাম্ভিলা গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, শিষ্যেরা তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। সে-দিন পথিমধ্যে বুধরি গ্রামে পদকর্ত্তা রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজের বাটীতে রাত্রকালে তিনি অবস্থিতি করেন ও তথায় নামকীর্ত্তনাদিতে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন গাম্ভীলায় গঙ্গানারায়ণের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের দর্শন লাভের জন্য, অনেক লোক আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এখন আর তাঁহাদের সে ভাব নাই। সকলেই তাঁহার দেব-দুর্ল্লভ জীবনের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন।

বেলা হইয়া আসিল, ঠাকুর মহাশয়, রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় জাহ্নবীর জলে আপনার দেহ অর্দ্ধ-নিমজ্জিত করিয়া, শিষ্যদ্বয়কে নিজ গাত্র-মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণ গুরুদেবের অঙ্গ-মার্জ্জনে প্রবৃত্ত

হইলে, ঠাকুর মহাশয় হরিনাম লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল—নরোত্তম চিরদিনের জন্য ভবধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন! কার্ত্তিক মাস; কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিল। গঙ্গানারায়ণ কাঁদিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এ-বার্ত্তা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র নরনারীর চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল,—সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের জন্য হাহাকার করিতে লাগিল।

গঙ্গানারায়ণ গাম্ভীলায় মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। তৎপর খেতরিতে উৎসব। নরোত্তমের এই শ্রাদ্ধোৎসবে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ গায়ক-শিষ্যেরা তাঁহার রচিত মধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া, সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল,—"এমন উৎসব আর আমরা কখনও দেখি নাই।" যথা নরোত্তম বিলাসে :—

"য়েছে মহোৎসব হৈল খেতরি গ্রামেতে।
সহস্রেক মুখেও তা' না পারি বর্ণিতে॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে যে হইল চমৎকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার॥"

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে খেতরিতে মেলা হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোক এই মেলাতে সমবেত হয়। নরোত্তম ঠাকুরের গুণাবলী কীর্ত্তনই এই মহামেলার প্রাণ। তাই নরোত্তম-বিলাস-প্রণেতা নরহরি দাস, বলিতেন,—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
যাঁর গুণ শুনি পাষাণ বিদরে॥"

গোপাল ভট্ট ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী; কথিত আছে, রামানুজাচার্য্য এখানে শ্রীরঙ্গ নাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রের অনতিদূরে বলংগণ্ডী নামক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহার নাম শ্রীবেঙ্কট ভট্ট। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, ইনি লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণের সময়, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া, শ্রীরঙ্গদেবের নিকট নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় বেঙ্কট ভট্ট তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তির প্রভাব দর্শন করিয়া, ভট্ট মোহিত হইয়া গেলেন। তিনি এই সুন্দর যুবাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া, আপন ভবনে আসিলেন এবং সপরিবারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য তথায় চারিমাস কাল বাস করিয়া, হরি-নাম-কীর্ত্তনাদিতে দিন অতিবাহিত করেন।

ইঁহারা তিন ভ্রাতা; ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ। বেঙ্কট ভট্টের পুত্রের নাম গোপাল। যখন শ্রীচৈতন্য বেঙ্কট ভট্টের গৃহে গমন করেন, তখন গোপালের বয়স প্রায় ১২ বৎসর। গোপাল শ্রীচৈতন্যের মধুময় জীবন দর্শনে তাঁহার দিকে বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন। বেঙ্কট পুত্রের এই ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। গোপালও প্রহৃষ্ট-চিত্তে নবীন সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

"বেঙ্কটের বালক গোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম॥
তাঁর পিতা সুচরিত্র তাঁহারে জানিয়া।
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া॥
চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে।
কহিলে না হয় অতি তাহার বিস্তারে॥"

শ্রীচৈতন্য চারিমাস বেঙ্কট ভট্টের গৃহে বাস করিয়া, গোপালের সেবায় তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের পরিচয় পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য গোপালের তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ের জন্য তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন। যে মধুর নামে শ্রীচৈতন্য বিভোর থাকিতেন— তিনি গোপালকেও সেই মহামন্ত্র হরিনামে দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার প্রাণে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

তিনি একদিন বেঙ্কটকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার এই পুত্র গোপালকে ভাল করিয়া শিক্ষা দান করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিবে; কদাচ বিবাহ দিবে না। শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিয়াছিলেন যে, গোপাল সামান্য বালক নহেন, তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

"গোপাল ভট্ট নাম এই তোমার কুমার।
মোর অতি কৃপা হয় উপর ইহার॥
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিভা নাহি দিবে ইহা কহিয়ে তোমারে॥"

শ্রীচৈতন্য বেঙ্কটের গৃহে চারিমাস বাস করিয়া বিদায় লইবার সময়, তিনি গোপালকে বলিলেন, "তোমার পিতামাতার পরলোক গমনের পর বৃন্দাবন গমন করিয়া, রূপ ও সনাতনের নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিবে, ও সাধন-ভজনাদিতে জীবন অতিবাহিত করিবে।" তিনি গোপালের পিতাকেও বলিলেন, "তুমি গোপালকে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিবে।"

শ্রীচৈতন্যের বিদায়ের সময় ভট্ট পরিবারের সকলে অশ্রুবারি ফেলিতে

ফেলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার চরণধূলি মস্তকে লইলেন। গৌর-বিচ্ছেদে সকলেই বিষণ্ণ-হৃদয়ে কয়েকদিন যাপন করিয়াছিলেন।

গোপাল বাল্যকাল হইতেই উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। গোপাল ভট্ট বুদ্ধি ও তর্কশক্তি দ্বারা বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে ভক্তিপথাবলম্বী করেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অবস্থিতিকালে তিনি অনেককে হরিপ্রেমের সাধক করিয়াছিলেন। তিনি চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া, পিতামাতার সেবা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও নাম-কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কালের আহ্বানে তাঁহার পিতামাতা সংসার হইতে অপসৃত হইলেন। গোপাল যথাক্রমে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এখন তাঁহার শ্রীচৈতন্যের আদেশ পালনের সময় উপস্থিত হইল। তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইলে, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী তাঁহাকে বিশেষ যত্নসহকারে গ্রহণ করেন। সনাতন গোস্বামী গোপালের আগমন বার্ত্তা মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করেন। তিনি এ সংবাদে অত্যন্ত প্রীত হইয়া, গোপালের জন্য আপনার বসিবার আসন ও ডোর প্রেরণ করেন। গোপাল সেই আসনে উপবেশন করিয়া ও ডোর মস্তকে বাঁধিয়া আপন ইষ্টদেবতার অর্চ্চনায় রত থাকিতেন।

তিনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া, সনাতন গোস্বামীর আদেশে হরিভক্তি-বিলাস নামক গ্রন্থের সঙ্কলন ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য যতদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি অনুগত শিষ্যের ন্যায় ভট্ট গোস্বামীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেঙ্কট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীধামে বাস করিতেন। ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। তৎকালে ইনি ভারতে বেদান্ত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কাশীধামের সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে নেতাস্বরূপ মনে করিয়া, তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। প্রকাশানন্দ শঙ্করাচার্য্যের পথাবলম্বী হইয়া অদ্বৈত-মত প্রচার করিতেন। ভক্তিধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোনপ্রকার আস্থা ছিল না। ভক্তদিগের ক্রন্দন ও নৃত্যকে তিনি উপ-হাসের চক্ষেই দর্শন করিতেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যের কার্য্যাদির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিতেন," "লোকটা ভণ্ড, বোধ হয় কোন যাদু-মন্ত্র জানে, তাই শীঘ্র লোক গুলাকে আপনার বশীভূত করিয়া ফেলে। যথা ভক্তমালে,—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করীভাষ্য মতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রমাণ্য।
আপনাকে মানে ইষ্ট ব্রহ্মেতে অভিন্ন॥
মায়াবাদী ঈশ্বরের স্বরূপ শকতি।
যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম মতি॥
ভক্ত যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥"

শ্রীচৈতন্য যখন কাশীধামে আগমন করেন, তখন প্রকাশানন্দ বলেন, "চৈতন্যের ভাবকালী (ভক্তি-ধর্ম্ম) এখানে বিক্রয় হইবে না।" প্রভু এই কথা শ্রবণ করিয়া একটু হাসিয়া বলেন, "যদি ভাবকালী বিক্রয় না হয় তাহা হইলে উহা দান করিয়া যাইব।" গৌর কাশীধামে গমন করিয়া অধিকাংশ সময় নির্জ্জনেই বাস করিয়া আপনার সাধন-ভজনেই রত থাকিতেন। প্রকাশানন্দ

চৈতন্যের সঙ্গে বিচারপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করেন। তিনি, প্রকাশানন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম—এই কথা লোককে বলিয়া দিলেন। যথাসময়ে শ্রীচৈতন্য সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। সভা-গৃহ বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রভু উপস্থিত হইলে, প্রকাশানন্দ তাঁহাকে আপনার নিকট বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সৌম্য মুখ-শ্রী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহার সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হইল। শ্রীচৈতন্য এই বিচারে জয়লাভ করিলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ ও তদীয় শিষ্যবর্গ শ্রীচৈতন্যের যুক্তিতে, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রকাশানন্দ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সামান্য মানব নহেন,—ইনি শ্রীভগবানেরই স্বরূপ বিশেষ। ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমাচার্য্য যখন চৈতন্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নরলোকের অতীত বলিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন, তখন প্রকাশানন্দের মনেও শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

প্রকাশানন্দ প্রভুর শরণাগত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার শিষ্যেরাও প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেন। কাশীধামে শুষ্ক মরুসম ভক্তহীন প্রকাশানন্দ-ভবনে ভক্তির বন্যা বহিতে লাগিল। যথা ভক্তমালে,—

"প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া।
মায়াবাদপাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া ॥
কল্পিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা।
প্রভুর আশ্চর্য্য তেজঃ দেখিতে পাইলা ॥
শিষ্য-সমিভ্যারে সব বৈষ্ণব হইল।
প্রভুর চরণ তলে শরণ লইল ॥"

শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দের নাম প্রবোধানন্দ রাখিলেন। এবং তাঁহাকে

বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে বলিলেন। প্রকাশানন্দ তৎপর বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। যিনি হরিনামে নৃত্য ও প্রেমাশ্রুপাতকে বাতুলের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, তিনি এখন করতালী দিয়া অশ্রুবারি ফেলিতে ফেলিতে ভগবৎ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন! প্রকাশানন্দ চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্তুতি-সূচক অনেক পদ রচনা করিয়া, প্রভুবরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উত্তর-কালে সজ্ঞান ভক্তির অপূর্ব্ব মিলনে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া তিনি ভক্তি-লভ্য ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃত অধিকারী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ ।

ভক্ত-চরিতমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শঙ্করাচার্য্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাক্ষিণাত্যে কেরল নামক নগরে শিবগুরু নামক এক সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি বাল্যকালে গুরুগৃহে বাস করিয়া, অতি নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা ও বেদাধ্যয়নে রত থাকিতেন। চতুষ্পাঠীর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, শিবগুরুর পিতা বিদ্যাধিরাজ চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়া, যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্তানকে গৃহে আনয়ন করিলেন। সন্তানকে পরিণীত করিয়া, সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করাই তাঁহার ইচ্ছা। পক্ষান্তরে শিবগুরুর শাস্ত্র-জ্ঞানের কথা শ্রবণে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও অর্থসহ তাঁহাকে আপনাদিগের কন্যা-দানের প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে সদ্বংশজাত অমোঘ পণ্ডিতের কন্যার সহিত শিবগুরুর বিবাহের স্থির হইল। শুভলগ্নে বিবাহকার্য্যও সমাধা হইয়া গেল। নব-দম্পতি সুখে সংসারে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদিন চলিয়া গেলেও কোন সন্তানসন্ততি হইল না দেখিয়া, তাঁহাদের মনে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া

উপস্থিত হইল। দেবারাধনায় সকলই সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে-জন্য তাঁহারা সস্ত্রীক গ্রামের নিকটবর্ত্তী বৃষপর্ব্বতে পুত্র কামনায় শিবারাধনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইল। শিবগুরুর পত্নী গর্ভবতী হইলেন। এবং ৬৪৮ শকে ১২ই বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে এক সন্তান প্রসব করিলেন। ইঁহারই নাম হইল শঙ্কর।

শঙ্কর শৈশবাবস্থায় অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আপনার সন্তানদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্যই তৎপর থাকেন। শিবগুরু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সন্তানকে পঞ্চমবর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ করাইয়া উপনয়নান্তে বেদ শিক্ষাদানে রত হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। শঙ্করের বয়স যখন তিন বৎসর মাত্র তখন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্করের জননী, সন্তানকে পঞ্চমবর্ষ বয়সে উপনয়ন দিয়া, তাঁহাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বালক অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাসে রত হইলেন এবং ষোড়শ বৎসর বয়সের মধ্যেই, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, যে, সে সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

চতুষ্পাঠীর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি গুরুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, গৃহে আগমন করিলেন। এই মহাপণ্ডিত শঙ্কর একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে ও মাতৃসেবায় রত হইলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটি গল্প আছে :—

শঙ্কর-জননী প্রতিদিন একটি নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। একদিন তিনি স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইবার সময়, অত্যন্ত ক্লান্তি-প্রযুক্ত, পথিমধ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। শঙ্কর মাতার গৃহে প্রত্যাগত হইবার অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে মাতার উদ্দেশে বাটী হইতে বহির্গত

হইলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, মাতা পথি-পার্শ্বে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর ব্যাকুল হইয়া ত্বরায় মাতার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। সন্তানের মুখ দেখিয়া, মাতার প্রাণে যেন নববলের সঞ্চার হইল। তখনই শঙ্করের মনে হইল,—"মা ত প্রতিদিনই এই দূরবর্ত্তী নদীতে স্নান করিতে আসিবেন এবং দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য, হয়ত অনেক সময়েই তাঁহার এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে, এর কি কোন উপায় করা যায় না, যাহাতে মা বিনাক্লেশে এই নদীতে অবগাহন করিয়া, তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনায় রত হইতে পারেন?"

শঙ্কর বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শনাদিতে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও, কেবল শুষ্ক তর্কে তাঁহার মতি ছিল না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আর্দ্র হইয়া থাকিত। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি ভগবদ্ভক্ত। ভগবানের নিকট একাগ্রমনে প্রার্থনা করিলে, তিনি যে ভক্তের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, শঙ্করের এই বিশ্বাস বড় দৃঢ় ছিল। এইজন্য তিনি সেই সময়ে তাঁহার আরাধ্য-দেবতার নিকট এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে ভগবন! তুমি কৃপা করিয়া এই কর, যেন এই নদীটি আমাদের বাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার মাকে আর কষ্ট করিয়া, স্নানের জন্য এতদূর হাঁটিয়া আসিতে হয় না।" প্রবাদ আছে, শঙ্করের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। তদবধি নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া শঙ্করের বাটীর নিকট দিয়াই প্রবাহিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শঙ্কর শাস্ত্রালোচনায় ও মাতৃসেবায় রত থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনল প্রধূমিত হইতেছিল। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিবেন—এই তাঁহার মনের বাসনা। কিন্তু

মাতৃ-আজ্ঞা ভিন্ন কিরূপে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান, এবং কিরূপেই বা তিনি তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া, নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিবেন—দিন দিন এই চিন্তাই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একটি ঘটনায় তাঁহার ঈপ্সিত বিষয়ের অনুকূলে জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি একদিন একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময়, এক কুম্ভীর তাঁহার পাদদ্বয় গ্রাস করে; শঙ্কর এই অবস্থায় মাতাকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া, বলিতে লাগিলেন, "মা আমাকে কুম্ভীরে ধরিয়াছে।" চীৎকার শুনিবামাত্র জননী তৎক্ষণাৎ ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার সন্তানের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরই জলমগ্ন! হৃদয়ের নিধি—একমাত্র সন্তানের এই শঙ্কট অবস্থা দেখিয়া, মাতা কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হাহাকার-রবে কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর মাতাকে বলিলেন, "আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও, নতুবা আমার প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই।" সন্তানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অনুমতি দিয়া শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, এই সময় কুম্ভীরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

তীরে বহুলোক উপস্থিত ছিল। শঙ্কর জল হইতে তীরে উঠিলে, দেখা গেল, কুম্ভীর তাঁহার পদদ্বয় দংশন করিতে সমর্থ হয় নাই। শঙ্কর দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জননী অচেতন অবস্থায় তীরে পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি মাতার মূর্চ্ছা অপনোদন করাইয়া, তাঁহাকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং নানাপ্রকারে শান্তনা দিয়া, শেষে সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া, শঙ্কর পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৈরিক বসন পরিধান ও দণ্ড ধারণ করিলেন এবং কত বন, নদনদী প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, তথায়

গোবিন্দ যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। অবশেষে নর্ম্মদাতীরস্থ নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া, এক গুহায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীমৎ গোবিন্দযোগী তথায় বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি শঙ্করকে দেখিয়া, এবং ক্ষণকাল তাঁহার সহিত কথোপকথনের পর বুঝিলেন, এ বালক সামান্য নহে। শঙ্কর তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। গোবিন্দপাদও তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এইরূপে কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, গোবিন্দপাদের অমৃতময় উপদেশ লাভে, আত্মাকে বিশেষ উন্নত বোধ করিয়াছিলেন, —ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানের বিশেষ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। একদিন গোবিন্দপাদ শঙ্করকে ডাকিয়া, সস্নেহ-বচনে বলিলেন, "শঙ্কর! তুমি কাশীধামে গমন কর এবং তথায় গিয়া, ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন কর ; তুমিই এ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র।"

শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, কাশীধামে যাত্রা করিলেন। যে মহান্ ব্রত পালনের জন্য তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, —সেই মহাব্রত পালন,—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-প্রণয়নে তিনি রত হইলেন। এখানে পদ্মপাদ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার পথানুসরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট শাস্ত্র-বিচারার্থ আগমন করিতেন, তাঁহারা সকলেই আচার্য্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিতেন। ক্রমে শঙ্করের নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কথিত আছে যে, একদিন ব্যাসদেব ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, শঙ্করের নিকট আগমন করেন, এবং তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন ; অবশেষে আত্ম-পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ দিগ্বিজয়ী করিয়া, বেদান্তমত ঘোষণা করিতে বলেন। শঙ্কর ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভে বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া, তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালনে রত হয়েন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমে প্রয়াগে বৌদ্ধ বিজয়ী কুমারিল ভট্টের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইলেন। ভট্ট একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই শঙ্করের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর তাঁহার নিকট বিচারার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি শঙ্করকে বলিলেন, "তুমি আমার শিষ্য পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আমিও তোমার নিকট পরাজিত হইলাম,—স্বীকার করিব। কিন্তু এই বিচারে তাঁহার পত্নী উভয় ভারতীকে মধ্যস্থা মানিতে আমার অনুরোধ রহিল। মণ্ডন-পত্নী বিদ্যা বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায়।" শঙ্কর কুমারিল ভট্টের কথা শ্রবণ করিয়া মণ্ডন মিশ্রের উদ্দেশ্যে মহিষ্মতী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শঙ্কর উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত মণ্ডনের বিচার আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ দিবস উভয়ের মধ্যে তুমুল শাস্ত্রালাপ চলিয়াছিল। বিদ্যাবতী উভয় ভারতী মধ্যস্থা ছিলেন। বিচারে মণ্ডনেরই পরাজয় হইল। উভয় ভারতী যখন দেখিলেন যে তাঁহার স্বামীর পরাজয় হইল, তখন তিনি শঙ্করের সহিত কামশাস্ত্র বিষয়ে বিচার করিতে চাহিলেন। শঙ্কর সন্ন্যাসী; কামশাস্ত্রে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। তিনি কিরূপে ভারতীর সহিত ঐ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শঙ্কর উভয় ভারতীর নিকট একমাস সময় গ্রহণ করিলেন এবং শিষ্যদিগের নিকট গমন করিয়া সকল কথা জানাইলেন। শঙ্কর স্থির করিলেন যে, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন মৃত ব্যক্তির শরীর মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সে-ব্যক্তি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন তিনি

সেই শরীরের মধ্যে বাস করিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষা করিবেন। সেই সময় অমরুক নামক এক রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শঙ্কর এই সুযোগ দেখিয়া কোন নিভৃত স্থানে শিষ্যদিগের নিকট আপনার দেহ রক্ষা করিতে বলিয়া সেই রাজার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাও পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। রাজ মহিষীরা ইহাতে সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলেন বটে কিন্তু স্বামীর আচরণ দেখিয়া তাঁহাদের কিছু সন্দেহও জন্মিল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, রাজার শরীরে কোন যোগীর আত্মা প্রবেশ করিয়াছে। তখন রাজকর্ম্মচারীরা স্থির করিলেন, রাজার শরীরে যে যোগীর আত্মা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার রক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে—এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা রাজ্য-মধ্যে যত মৃতদেহ আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া, সমস্ত দাহ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। অনুসন্ধানে শঙ্করের মৃত দেহও অনুসন্ধান-কারীদের হস্তগত হয়। কথিত আছে, শঙ্করের দেহ চিতানলে স্থাপন করা হইলে, তিনি যোগবলে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠেন। দাহকারীরা তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে।

শঙ্কর এইরূপে পুনর্জ্জীবিত হইয়া মণ্ডন মিশ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মিশ্র ও তদীয় পত্নী তাঁহাকে অতি যত্ন-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য্য তখন উভয় ভারতীর সহিত বিচারার্থী হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী ভারতী বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াই তাঁহার নিকট আপনার পরাজয় স্বীকার করিলেন। মণ্ডন-পত্নী বুঝিয়াছিলেন যে তিনি পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বিষয়ে এবার নিশ্চয়ই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। উগ্রভৈরব নামে এক কাপালিক আচার্য্যের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করিয়া বলে, "নিজের জীবন দেবোদ্দেশে ত্যাগে বিশেষ ফল আছে। তুমি যদি নিজের দেহ বলি দিতে স্বীকৃত হও তাহা হইলে, তোমার অনেক পুণ্য সঞ্চয় হইবে। তোমার অনুমতি

পাইলে আমিও বলিদানের ব্যবস্থা করি। সাধু-হৃদয় পরোপকারী ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সরলভাবে আপনার জীবন-উৎসর্গের জন্য স্বীকৃত হইলেন। উগ্রভৈরবও তাঁহাকে স্ব-স্থানে লইয়া গেল। বলিদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে আচার্য্য কাপালিককে বলিলেন, "আমি সমাধিস্থ হইলে, তুমি স্বকার্য্য সাধন করিবে।" আচার্য্যের শিষ্যেরা এ বিষয় কিছুই জানিতেন না। ঐ সময় আচার্য্যকে আশ্রমে না দেখিয়া, হঠাৎ তাঁহার প্রিয়শিষ্য পদ্মপাদের মনে যেন স্বপ্নবৎ দুষ্ট কাপালিকের খড়্গের নিম্নে আচার্য্যের বলিদানের ছবি উদিত হইল ও ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নৃসিংহ-দেবকে স্মরণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কাপালিকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং যে ছবি কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন—দেখিলেন, তাহাই ঘটিতেছে। উগ্রভৈরব আচার্য্যের শিরশ্ছেদনার্থ যেমন খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ নৃসিংহাবতার নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কাপালিকের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন! রুধির-ধারায় চারিদিক প্লাবিত হইয়া গেল। পদ্মপাদের পশ্চাতে আচার্য্যের আশ্রমস্থ সকল শিষ্যই ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন সকলেই আনন্দ-সহকারে গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া আপনাদিগের বাসস্থানে প্রত্যাগত হইলেন।

তৎপর আচার্য্য নানা দেশ ভ্রমণানন্তর শৃঙ্গেরীতে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এখানে তাঁহার শিষ্যেরা নানা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। শঙ্কর তথায় বাস করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতার কথা বিশেষরূপ স্মরণ হওয়াতে তিনি মাতৃ-দর্শনের জন্য স্বদেশে যাত্রা করিলেন। গৃহে গিয়া দেখিলেন, জননী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা। মাতার দেহান্তে তিনি যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সমাধা করেন। এই সময় তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই।

ভারতের নানাস্থানে বেদান্তমত ঘোষণাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্ব-মত স্থাপনের জন্য তাঁহাকে বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের

প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্কর অসাধারণ বিদ্যা ও ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সকলকেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিরীশ্বরবাদিগণের তর্কজাল ছেদন করিয়া তিনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে ব্রহ্ম-সাধনার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেদান্ত-মতের উপর তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি সাধারণ লোকের জন্য শিবারাধনা প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করের শিষ্যগণ তাঁহাকে শিবাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠ অতি প্রসিদ্ধ। দ্বারকায় সারদা মঠ, নীলাচলে গোবর্দ্ধন মঠ, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ ও বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ। এইরূপ কথিত আছে যে, শঙ্কর ইহলোক পরিত্যাগ করিবার মানসে কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে গমন করেন এবং তথায় শ্রীমহাদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরদিনের জন্য লোক-চক্ষুর অগোচর হইয়া পড়েন।

রামানুজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ ভারতে—বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক স্থানে, কেশব যাজ্ঞিক নামে এক সদাশয় বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভূতপুরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়। উহার বর্ত্তমান নাম শ্রীপেরেম্বধুর। কেশব যাজ্ঞিক শ্রীশৈলপূর্ণ নামক এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর ভগিনী কান্তিমতীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহান্তে বহুদিন চলিয়া গেল; কিন্তু কেশবের কোন সন্তানাদি হইল না। যজ্ঞানুষ্ঠান ভিন্ন পুত্র-মুখ দর্শন সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া, কেশব এক চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে সস্ত্রীক কৈরবিণী-সাগরসঙ্গমে গমন করেন, এবং সেই পুণ্য-স্রোতে উভয়ে অবগাহন করেন। সাগরসঙ্গম স্থলে, শ্রীপার্থসারথীর মন্দির বিরাজমান। এই রমণীয় স্থলে কেশব যাজ্ঞিক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে—রজনীতে কেশব নিদ্রিত হইলে পার্থেশ্বর তাঁহার সম্মুখে আত্ম-রূপ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমিই তোমার পুত্ররূপে এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিব।"

দৈববাণী শ্রবণে আশ্বস্ত-হৃদয়ে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। কিছুদিন পরে কান্তিমতীর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। গর্ভধারণে তাঁহার রূপলাবণ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। লোকে অনুমান করিল, নিশ্চয়ই কোন দেব-সদৃশ অসাধারণ পুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে, দশমাস পূর্ণ হইয়া আসিল। বসন্তকাল সমাগত। তরুলতাসকল নব পল্লবে বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে,—কত পাখী বৃক্ষশাখে বসিয়া মনের আনন্দে মধুর কাকলি-ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ

করিতেছে। এই মধুর সময়ে ৯৩৮ শকাব্দে চৈত্রমাসে কেশব-পত্নী এক সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত সন্তান প্রসব করিলেন। দৈববাণী পূর্ণ হইল।

কথিত আছে, সদ্যপ্রসূত শিশুর দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সূতিকা-গৃহ আলোকিত হইয়াছিল। জ্যোতির্ব্বিদেরা নবকুমারের ভাগ্য গণনা করিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়াই নির্ণীত করিয়াছিলেন। বহুদিনের পর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া মাতাপিতার আনন্দের সীমা ছিল না। কেশব যাজ্ঞিক আনন্দ-প্রণোদিত হইয়া মুক্তহস্তে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে তিনি ত্বরায় ভূতপুরীতে আগমন করিলেন। ভাগিনেয়কে দেখিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন হইল। মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ শিশুর নাম রাখিলেন, 'লক্ষ্মণ'; কিন্তু উত্তরকালে ইনি 'রামানুজ' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিব।

রামানুজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে, তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। তখন কেশব যাজ্ঞিক নিজেই সন্তানের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। অধ্যয়নকালে এই বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সকলেই মুগ্ধ হইত।

রামানুজ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে কেশব যাজ্ঞিক তাঁহাকে রক্ষম্বা নামে এক ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত পরিণীত করিলেন। কিন্তু পুত্রের বিবাহের পর নব-দম্পতীর গার্হস্থ্য-জীবনের সুখভোগ তিনি আর দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। অল্পকাল মধ্যেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

জ্ঞানরূপ বহ্নিশিখা মানব-হৃদয়ে একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হয় না, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়কে চিরালোকে দীপ্ত রাখে। পিতৃ-বিয়োগের পর রামানুজ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ যেমন সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান

স্থান বলিয়া গণ্য হইত; তেমনি দক্ষিণাপথে তৎকালে কাঞ্চিনগর জ্ঞান বিস্তারের প্রধান ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রামানুজ তথায় গমন করিলেন। যাদবপ্রকাশ নামক একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত তৎকালে কাঞ্চি-নগরীতে পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিনায়করূপে বহুসংখ্যক শিষ্যকে বেদান্তশাস্ত্র শিক্ষা দান করিতেন। রামানুজ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শিষ্যের রূপলাবণ্য, প্রখর বুদ্ধি ও বিনয় দর্শন করিয়া যাদবপ্রকাশ বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। রামানুজও যথারীতি আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক গুরুসেবা ও পাঠানুরাগে রত থাকিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদা একটি দৈব ঘটনায় তাঁহাকে শিক্ষাগুরুর স্নেহে বঞ্চিত হইতে হয়। দৈবক্রমে কাঞ্চীনগরের রাজার কন্যা ব্রহ্মরাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় অনেক সময় অসম্বদ্ধ বাক্য বলিতেন; লজ্জাহীনা হইয়া কখন হাসিতেন কখনও বা নৃত্য করিতেন। রাজা ও রাণী কন্যার এ অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। প্রতিকারের নিমিত্ত তাঁহারা বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কন্যা কিছুতেই আরোগ্যলাভ করিল না। যাদবপ্রকাশ মন্ত্রবিৎ ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। রাজা তাঁহাকে আনাইলেন। যাদবপ্রকাশ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মরাক্ষস ক্রোধ-ভরে বলিল, "ওহে যাদবপ্রকাশ, তুমি মন্ত্র দ্বারা রাজকন্যার দেহ হইতে আমায় তাড়াইতে আসিয়াছ, কিন্তু ইহা তোমার অসাধ্য; তুমি পূর্ব্বজন্মে গোসাপ হইয়া এই সরোবরের তীরে বাস করিতে, এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পাত্রাবশিষ্ট অন্ন সরোবর-তীরে নিক্ষেপ করেন, তুমি ক্ষুধিত হইয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত কর। ভক্ত ব্রাহ্মণের প্রসাদ লাভে পবিত্র হইয়া এ জন্মে তুমি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমিও

পূর্ব্বজন্মে যাহা ছিলাম বলি শুন, "আমি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে অজ্ঞতা-প্রযুক্ত অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলাম, সে-জন্য ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি—এখন তোমার শিষ্য রামানুজ যদি আমার মস্তকে পদার্পণ করেন তাহা হইলে আমি রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই।" রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র রামানুজকে স্ব-ভবনে আনয়ন করিলেন। রামানুজ ব্রহ্ম-রাক্ষসের কথানুসারে কন্যার মস্তক চরণ দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস তৎক্ষণাৎ রাজ-দুহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজা রামানুজের এই অসাধারণ ব্রহ্মতেজঃ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন-হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং বহুসংখ্যক রত্নরাজি প্রদান করিলেন। রামানুজ স্বয়ং তাহার একটিও গ্রহণ করিলেন না; সমস্তই যাদবপ্রকাশকে প্রদান করিয়া, নিঃস্বার্থ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে যাদবপ্রকাশ অধ্যাপনাকালে শ্রুতির "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই দুইটি বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, "এই বিশ্বই ব্রহ্ম; তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই মায়া মাত্র।" রামানুজ দেখিলেন, গুরুর এ ব্যাখ্যা মূলের প্রকৃত অর্থ নহে। এ ব্যাখ্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনই প্রভেদ থাকে না—উপাস্য ও উপাসকের বিলোপ হইয়া যায়। তিনি বলিলেন, "গুরুদেব শ্রুতির এ তাৎপর্য্য নহে। বাক্যদ্বয়ের অর্থ এই,—"সমস্ত জগৎ সেই পরমাত্মার দ্বারাই আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই এই বিশ্বের প্রাণরূপে সকল পদার্থের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, কোন পদার্থই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। পদার্থ সকলই ঈশ্বর নহে।" যাদবপ্রকাশ রামানুজের এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে যৎ-পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। রামানুজ দেখিলেন, নিজমত গোপন না করিলে অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশের নিকট আর শিক্ষা লাভ সম্ভব নহে, এইজন্য

তিনি গৃহে গমন করিয়া মাতাকে সকল কথা বলিলেন, এবং গৃহে বসিয়াই বেদান্ত-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যে দিন রামানুজ রাজকুমারীকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্তে মুক্তি প্রদান করেন সেই দিন হইতেই যাদবপ্রকাশ মনে মনে তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, আবার শ্রুতির শ্লোকদ্বয়ের দ্বৈতমূলক যৌক্তিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সে-ঈর্ষানল আরো প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন রামানুজ অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত-মত প্রতিষ্ঠা করিবেন! এখন কি উপায়ে তাঁহার অস্তিত্ব বিলোপ করিবেন, তিনি সেই চিন্তাতেই রত হইলেন। ইতোমধ্যে একদিন শিষ্যবৃন্দ সমবেত হইলে, যাদবপ্রকাশ রামানুজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "দেখ শিষ্যগণ, রামানুজ আমার ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করে, এ অপমান আমার পক্ষে একান্তই অসহনীয় হইতেছে।" শিষ্যগণ বলিলেন, "দেব, আমরা যে কোন উপায়েই হউক, তাহার প্রভাব খর্ব্ব করিয়া আপনার মত অক্ষুণ্ণ রাখিতেই সচেষ্ট হইব।" যাদব শিষ্যদিগের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, পরে বলিলেন, "দেখ, আমি স্থির করিয়াছি আগামী মাঘ মাসে প্রয়াগ-তীর্থে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান উপলক্ষে তাহাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাত্রা করিব এবং স্নানের সময় কৌশলক্রমে তাহাকে ধরিয়া গভীর জলে নিক্ষেপ করিব, তাহাতে তাহার পরিত্রাণ হইবে এবং আমিও এরূপ শত্রু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।" শিষ্যেরা যাদবপ্রকাশের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং ত্বরায় সংকল্পসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

একদিন যাদবপ্রকাশ রামানুজকে ডাকিয়া প্রয়াগতীর্থ গমনের কথা উল্লেখ করিলেন। সরল-হৃদয় রামানুজ গুরুর স্নেহ দেখিয়া সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। যাদব শিষ্যবৃন্দসহ প্রয়াগে যাত্রা করিলেন। কত বন উপবন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা বিন্ধ্য-

গিরির নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন রামানুজের মাতৃস্বস্রেয় গোবিন্দ এই ষড়যন্ত্রের একটু আভাষ বুঝিয়া সুযোগক্রমে রামানুজকে বলিলেন, "তোমার প্রাণ বিনাশের জন্য গুরুদেব তোমাকে লইয়া যাইতেছেন, তুমি এখনই পলায়ন কর।" রামানুজ এই নিদারুণ ভীতিজনক কথা শ্রবণ করিয়া, বিন্ধ্যগিরির নিবিড় অরণ্যের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। শিষ্যেরা গুরুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সহযাত্রী গোবিন্দ যে রামানুজের নিকট দুষ্টাভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইত্যবসরে রামানুজ পলায়ন করিয়াছে তাঁহারা ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ পরে রামানুজের খোঁজ পড়িল। শিষ্যবৃন্দ ব্যস্ত-ভাবে চারিদিক অন্বেষণ করিয়া তাঁহার তত্ত্ব না পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় হিংস্র জন্তুর হাতে পড়িয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।" যাদবপ্রকাশ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অন্তরের আনন্দ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রকাশ্যে গোবিন্দের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান যাহার সহায় তাহাকে কে হত্যা করিতে পারে? ধ্রুব যেমন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন; যুবক রামানুজও শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া বিপদ-সঙ্কুল বিন্ধ্যারণ্যের ভিতর দিয়া কাঞ্চি নগরের উদ্দেশে ধাবিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে তাঁহাকে কে পথ দেখাইয়া গম্যস্থানে লইয়া যাইবে? এমন সময়ে ঘটনাক্রমে এক ব্যাধ-দম্পতি তথায় উপস্থিত হইয়া রামানুজকে বলিল, "এ ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে তুমি কেন আসিলে, আর কোথায়ই বা যাইবে?" রামানুজ বলিলেন, "ঘটনাক্রমে আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আমি কাঞ্চিপুর যাইব, কিন্তু পথ ঠিক করিতে পারিতেছি না।" ব্যাধ-দম্পতি বলিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে এস, আমরা তোমাকে কাঞ্চিপুরের পথ দেখাইয়া দিব।"

রামানুজ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। নিবিড় জঙ্গল সন্ধ্যা সমাগমেই ঘোরান্ধকারে আবৃত হইল। অগত্যা সেই গহনবনেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া তাহাদিগকে নিশা যাপিতে হইবে। রাত্রি অধিক হইলে ব্যাধ-পত্নী স্বামীকে বলিল, "বড় পিপাসা পাইয়াছে একটু জল আনিতে পার?" ব্যাধ বলিল, "এত রাত্রে পথ দেখিতে পাইব না।" ইহা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, "আমি জল আনিতে যাইতেছি।" ব্যাধ-দম্পতি বলিল, "এত রাত্রে পথ দেখিতে পাইবে না, প্রাতে আনিয়া দিও।" রজনী অবসান সময়ে ব্যাধ রামানুজকে জল আনিবার কথা স্মরণ করিয়া দিল। রামানুজ শালবনের ভিতর দিয়া গমন করিয়া, এক কূপ হইতে জল লইয়া আসিয়া দেখেন ব্যাধ-দম্পতি তথায় নাই। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোন মানবের চিহ্ন তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল না! রামানুজ বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং এবং কিছুক্ষণ বিস্মিত-হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ইহারা কে, কোথা হইতেই বা এখানে আসিল এবং কোথায় বা চলিয়া গেল?"

বিস্মিত-হৃদয়ে ব্যাধ-প্রদর্শিত পথে তিনি কাঞ্চিনগরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই এক সুন্দর জনপদ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। শীঘ্রই তিনি কাঞ্চিনগরে উপনীত হইলেন। জন্মভূমি দর্শনে আনন্দে তাঁহার চিত্ত উথলিয়া উঠিল। তিনি আপন গৃহে গমন করিয়া, জননীকে তাঁহার প্রাণ-বিনাশের ষড়যন্ত্র ও তাহা হইতে আত্ম-রক্ষার সকল কথাই জ্ঞাপন করিলেন। পুত্র যে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে ইহাই ভাবিয়া মাতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আপনার ইষ্টদেবতা বরদারাজকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই কাঞ্চিনগরে কাঞ্চিপূর্ণ নামে এক শূদ্র ভক্ত বৈষ্ণব বাস করিতেন। রামানুজ তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গুরুর ন্যায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে থাকেন। এক দিন তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার জন্য, তাঁহাকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিল, অথচ কাঞ্চিপূর্ণ আসিলেন না দেখিয়া রামানুজ তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া রামানুজ-পত্নীকে শীঘ্র অন্ন প্রদান করিতে বলিলেন এবং কার্য্যানুবোধে শীঘ্রই আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল মধ্যে রামানুজ গৃহে আসিয়া দেখেন, পত্নী কাঞ্চিপূর্ণের ভোজন-পাত্র পরিষ্কার করিয়া স্নান করিতেছেন। কাঞ্চিপূর্ণের প্রসাদান্নে বঞ্চিত হইয়া তিনি যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহার উপর পত্নীর ব্যবহারও ক্রমে তাঁহার বিরক্তির কারণ হইল। তিনি বুঝিলেন কাঞ্চিপূর্ণ শূদ্র বলিয়াই রক্ষস্বা তাঁহার ত্যক্ত ভোজন-পাত্র পরিষ্কারান্তে স্নান করিয়াছেন। এই কারণে ভক্তির খর্ব্বতা অনুভব করিয়া পত্নীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গেল।

রামানুচার্য্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠার কথা যখন দক্ষিণাপথের চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল তখন শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্য নামে এক পরম ভাগবত বাস করিতেন। ইনি তখনকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। শ্রীরঙ্গমে তিনি রামানুজের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন, ও তাঁহার পরিচিত না হইয়াই শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রামানুজের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিষ্ঠাবান্ যুবাপুরুষ যদি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা হইলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধুর ভাব চারিদিকে প্রচারিত হইবে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ তাঁহার দ্বারা সাধারণে বুঝিতে সক্ষম হইবে, ভাবিয়া যামুনাচার্য্য তাঁহাকে স্ব-মতে আনিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্রীরঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্যের অনেক শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে পূর্ণাচার্য্যও

একজন। ইনি যেমন সুপণ্ডিত তেমনি ভগবদ্ভক্ত। যামুনাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমে ভগ্নদশায় উপস্থিত এবং পীড়া-প্রযুক্ত কাতর। রামানুজাচার্য্য ভিন্ন তাঁহার অবর্ত্তমানে বৈষ্ণব-মতের পরিচালক হইবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে আনিবার জন্য একটি স্তোত্র রচনা করিয়া মহাপূর্ণকে ডাকিয়া সেই রচিত শ্লোকটি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "মহাপূর্ণ এই শ্লোকটি লইয়া তুমি কাঞ্চিপুরে রামানুজের নিকট যাও এবং একবার তাঁহাকে এখানে লইয়া এস।" মহাপূর্ণ তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামানুজের উদ্দেশে কাঞ্চিপুরে গমন করিলেন। মহাপূর্ণ, কাঞ্চিপুরে আসিলে কাঞ্চিপূর্ণ রামানুজকে যামুনশিষ্য মহাপূর্ণের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। উভয়ের পরিচয় হইবামাত্র মহাপূর্ণ যামুনাচার্য্যের রচিত সেই স্তোত্রটি পাঠ করিলেন। রামানুজ উহার রচনা ও লালিত্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অপূর্ব্ব শ্লোক কে রচনা করিয়াছেন?" মহাপূর্ণ বলিলেন "শ্রীপাদ যামুনাচার্য্য।" রামানুজ এই বৈষ্ণবাগ্রগণ্যের নাম পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিবারও প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার রচিত স্তোত্র শ্রবণে তাঁহার সে লালসা আরো জাগিয়া উঠিল।

স্তোত্র পাঠান্তে মহাপূর্ণ বলিলেন, "যামুনাচার্য্য পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন এবং আপনাকে দেখিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া, শ্রীরঙ্গমে যাইবার জন্য আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" রামানুজ মহাপূর্ণের বাক্য শ্রবণমাত্র ঐ ভক্তাত্মাকে দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মহাপূর্ণের সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

কয়েকদিন মধ্যে যখন তাঁহারা কাবেরী নদীতটে উপনীত হইলেন, তখন দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোক যামুনাচার্য্যের মৃতদেহ সৎকার করিবার জন্য নদীতটে আনয়ন করিয়াছে। এ-দৃশ্য দর্শন করিয়া রামানুজ ও মহাপূর্ণ

শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। উভয়ের নেত্র হইতে দর-দর-ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। রামানুজ দেখিলেন, মৃত মহাত্মার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি শিষ্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "জীবিতাবস্থায় ইঁহার অঙ্গুলি স্বাভাবিকরূপেই ছিল।" রামানুজ এই মুষ্টিবদ্ধের কোন বিশেষ কারণ আছে স্থির করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তিনটী বাক্যে এইরূপ সত্যবদ্ধ হইলেন ঃ—

(১) আমি [illegible] অবলম্বন করিয়া অজ্ঞান লোকদিগকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া নারায়ণের শরণাগত করিতে চেষ্টা করিব।

(২) আমি লোকশিক্ষার্থ ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য প্রস্তুত করিব।

(৩) মহামুনি পরাশর বৈষ্ণব-মত প্রচারের জন্য যে পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমি সাধারণের হিতের জন্য তাহার একখানি অভিধান প্রস্তুত করিব।

রামানুজ এই তিন প্রতিজ্ঞা করিবামাত্র যামুনাচার্য্যের তিনটি আবদ্ধ অঙ্গুলি খুলিয়া গেল।

অবশেষে রামানুজ কাঞ্চিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কাঞ্চিপুরে আসিয়া ভক্ত কাঞ্চিপূর্ণের নিকট যামুনাচার্য্যের পরলোক গমনের কথা জ্ঞাপন করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ গুরু-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন, এজন্য তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ শূদ্র; রামানুজ উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ। এজন্য তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দানে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "রামানুজ, সামাজিক প্রথানুসারে আমি শূদ্র হইয়া তোমাকে দীক্ষা দান করিতে পারি না। তুমি আমাকে আর এ-অনুরোধ করিও না" রামানুজ অগত্যা এ-সংকল্প হইতে বিরত হইলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ রামানুজের গুরুকরণের ইচ্ছা দেখিয়া তিনি বরদারাজের

নিকট তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথিত আছে, বরদারাজ কাঞ্চিপূর্ণের একান্ত নিষ্ঠা দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেন। কাঞ্চিপূর্ণ যখন বরদারাজের নিকট রামানুজের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কাতর-অন্তরে প্রাথনা করিতে লাগিলেন, তখন বরদারাজ বলিলেন, "রামানুজ আমার বড় ভক্ত, সে যেন শ্রীরঙ্গমে মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে।" কাঞ্চিপূর্ণ রামানুজকে বরদারাজের এই কথা জ্ঞাপন করিলে, রামানুজ আনন্দে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তিনি বরদারাজের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, কৃতজ্ঞতাভরে কাঞ্চিপূর্ণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তৎপর আর গৃহে প্রত্যাগত না হইয়া, মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণোদ্দেশে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ রামানুজের পত্নীর নিকট তাঁহার শ্রীরঙ্গমে যাত্রার সমাচার প্রদান করিলেন।

যামুনাচার্য্যের পরলোক গমনের পর শ্রীরঙ্গমে তাঁহার শিষ্যেরা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পরিচালকের জন্য একজন নেতার বিশেষ অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। সকলেই রামানুজের অসাধারণ বুদ্ধি ও ভগবন্নিষ্ঠার বিষয় অবগত ছিলেন। মহাত্মা যামুনও জীবনের শেষ দশায় তাঁহাকে নেতৃত্ব-পদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য মনন করিয়াছিলেন। সকলেই রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ জানিতেন, রামানুজের দ্বারা যথার্থ ভক্তি-ধর্ম্ম চারিদিকে বিস্তারিত হইবে; বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধুময় ভাবে নরনারীর প্রাণ শীতল হইবে। তিনি সকলের শুভ-ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে সস্ত্রীক কাঞ্চি নগরে গমন করিলেন।

রামানুজ এবার মহাপূর্ণকে গুরুত্বে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীরঙ্গমের দিকে ধাবিত হইতেছেন। পথে দেখিলেন, অদূরে এক সরোবর-তীরে মহাপূর্ণের ন্যায় এক ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার উদ্দেশ্যে তিনি গমন করিতেছেন, ইনিই হয়ত তাঁহার ভাবী দীক্ষাগুরু! নিশ্চিত জানিবার জন্য তিনি আবেগ-ভরে সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন।

দেখিলেন, সত্যই ভগবদ্ভক্ত মহাপূর্ণ বসিয়া রহিয়াছেন। রামানুজ উপস্থিত হইলে উভয়ের হৃদয়ে এক আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। রামানুজ পূর্ণাচার্য্যের প্রতি যথাবিহিত ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তিনিও প্রেমভরে রামানুজকে আলিঙ্গন করিয়া অকপট প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। রামানুজের হৃদয়ে যে বাসনা প্রধূমিত হইতেছিল তাহা তিনি আর মহাপূর্ণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার নিকট দীক্ষালাভ করিবার জন্য, শ্রীরঙ্গমে যাইতেছিলাম, আপনিও হয়ত আমার জন্যই বহির্গত হইয়াছেন। আমি আপনার নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইব, ইহা বরদারাজেরই আদেশ, অতএব আপনি আমাকে দীক্ষাদান করিয়া আমার হৃদয়ে নব-জীবনের সঞ্চার করুন।" মহাপূর্ণ তাঁহাকে সে-জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু রামানুজ বিলম্ব না করিবার জন্য কাতর-প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপূর্ণ রামানুজের ব্যাকুলতা দেখিয়া আর কাল-বিলম্ব বিধেয় নহে মনে করিয়া, তাঁহাকে দীক্ষাদানে উদ্যোগী হইলেন। মহাপূর্ণ তাঁহাকে কমল-সরোবর হইতে স্নান করাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহাকে পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া স্ব-মতে দীক্ষিত করিলেন। তরুণ সূর্য্যের কনক জ্যোতির ন্যায় দীক্ষান্তে রামানুজের হৃদয়ধাম আলোকিত হইয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে রামানুজ, পূর্ণাচার্য্য ও তদীয় পত্নীকে লইয়া কাঞ্চিপুরে নিজ ভবনে গমন করিলেন। মহাপূর্ণ নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রামানুজও তাঁহার নিকট বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মনের অনুরূপ গুরু না পাইলে, জীবন অন্ধকারময় বলিয়াই বোধ হয়। রামানুজ, পূর্ণাচার্য্য ও কাঞ্চিপূর্ণ এই তিন জনে মিলিত হইয়া অধিকাংশ সময় মনের

সুখে হরি-কথা ও নাম-সংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। মহাপূর্ণ রামানুজের ভবনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন রামানুজ গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে দেখিলেন একটী শীর্ণকায় ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন। পরিচয়ে জানিলেন লোকটী বৈষ্ণব। তাঁহাকে দেখিয়া রামানুজের প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, ইঁহাকে খাইতে দাও; ইনি ক্ষুধার্ত্ত। পত্নী বলিলেন, "আর ভাত নাই।" অভ্যাগত ব্যক্তিকে অগত্যা ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু স্ত্রীর এই বাক্যে রামানুজের সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি নিজে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হাঁড়িতে প্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জন রহিয়াছে। পত্নীর এই মিথ্যা ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্রমনা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

একদিন রামানুজ গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে রামানুজ ও মহাপূর্ণ উভয়ের পত্নীদ্বয় কূপ হইতে, রজ্জু দ্বারা জল তুলিতে গমন করিলেন। উভয়েই জল তুলিতেছেন, এমন সময়ে মহাপূর্ণের স্ত্রীর জলপূর্ণ কলস হইতে রামানুজ-পত্নীর জলপূর্ণ পাত্রে দুইএক বিন্দু জল পতিত হয়। রক্ষম্বা তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পূর্ণাচার্য্যের পত্নীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন, "আমরা উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণ, তোমার কলসীর জল আমার কলসীতে পড়াতে আমার পাত্রের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া গেল।" মহাপূর্ণের পত্নী বাটীতে আসিয়া স্বামীকে সমস্ত ঘটনা বিদিত করিলেন। মহাপূর্ণ রামানুজ-পত্নীর ঈদৃশ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গধামে যাত্রা করিলেন। রামানুজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গুরুদেব ও গুরুপত্নীকে দেখিতে না পাইয়া রক্ষম্বাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রক্ষম্বা সকলই বিবৃত করিলেন। রামানুজ তাঁহাদের গৃহ-ত্যাগের ঘটনা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং পত্নীর ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার

গুরু-পত্নীর সঙ্গে তুমি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া তাঁহার মনে ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছ—তাঁহার কলসীর কয়েক ফোঁটা জলবিন্দুতে কি তুমি জাতিভ্রষ্ট হইয়া যাইতে? ছি! তোমায় ধিক! তুমি আমার ধর্ম্ম-পত্নী হইয়া গুরু ও অতিথির পূজায় বিরত হইলে?" পত্নীর এই ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত সংসার হইতে বিচলিত হইতে লাগিল। যেখানে অতিথি সৎকৃত এবং গুরু পূজিত না হয় তাহা যে গৃহই নহে!

পরমেশ্বর মানবজীবনের কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া যে আপনার কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া লন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনেক সময় বুঝিতে অসমর্থ। আর একদিন এক ঘটনা ঘটিল। রামানুজাচার্য্য বরদারাজের মন্দিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রামানুজের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন। রামানুজ বলিলেন, "তুমি আমার বাটীতে আমার পত্নীর নিকট গিয়া বলিবে,—তোমার স্বামী আমাকে তোমার নিকট আহার করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি আমাকে অন্ন দাও।" ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ রামানুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন এবং রক্ষম্বার নিকট তাঁহার স্বামীর কথা উল্লেখ করিয়া অন্ন প্রার্থনা করিলেন। রক্ষম্বা তাহা শুনিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও, আমার ভাত নাই; যদি শীঘ্র না যাও তাহা হইলে তোমাকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দিব।" এই সকল রূঢ়বাক্য বলিয়া তিনি উঁহাকে মারিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। অতিথি রামানুজের নিকট তাঁহার পত্নীর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলেন। রামানুজ ব্রাহ্মণকে আহার করাইয়া বলিলেন, "তুমি এক কার্য্য কর, তাহা হইলে আমার পত্নী তোমাকে খাইতে দিবে; আমি তোমার হাতে একখানি পত্র দিব তুমি সেই পত্রখানি লইয়া আমার বাটীতে গিয়া বলিবে যে, তুমি তাঁহারই পিত্রালয় হইতে পত্র লইয়া আসিয়াছ। আর তুমি সেই পত্রখানি পাঠ করিয়াও তাঁহাকে শুনাইবে। তাহা হইলেই তিনি তোমাকে খাইতে দিবেন।" এই বলিয়া রামানুজ

তাঁহার পত্নীর পিতার জবানিতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে "তোমার ভ্রাতার শুভ-বিবাহ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবে তুমি এই লোকের সঙ্গে চলিয়া আসিবে।" ব্রাহ্মণ পত্র লইয়া রামানুজের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিলেন। রক্ষম্বা ভ্রাতার বিবাহের কথা শুনিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত-হৃদয়ে পত্র-বাহককে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইলেন। কিছুক্ষণ পরে রামানুজ বাটীতে গমন করিলে, রক্ষম্বা আনন্দিত মনে ভ্রাতার বিবাহের সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে পত্রখানি পড়িতে দিলেন। রামানুজ—'কিছুই না জানা-ভাবে' পত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং ত্বরায় বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি লইয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রক্ষম্বাও আনন্দমনে পিত্রালয়ে গমন করিলেন। স্ত্রীকে বিদায় দিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন বরদারাজের পূজার্থ গমন করিলেন, তখন বহু সংখ্যক লোক বাদ্যধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কাঞ্চিপূর্ণ নূতন সন্ন্যাসীকে গাঢ় আলিঙ্গন দানে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন। এখন তাঁহার যতিরাজ নাম হইল। যতিরাজের ভাগিনেয় দাশরথী ও ভূতপুর নিবাসী অনন্ত ভট্টের পুত্র কুরেশ যতিরাজের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। দুই জনেই সকল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন বরদারাজের মন্দিরে যাদবপ্রকাশের বৃদ্ধ জননী গমন করেন এবং যতিরাজের দিব্য-লাবণ্যযুক্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, "ইনি কে?" সে বলিল, "উনি রামানুজ।" যাদবপ্রকাশের মাতা বলিলেন, "ইঁহাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে।" তিনি বাটীতে আসিয়া যাদবপ্রকাশকে বলিলেন, "তুমি রামানুজের প্রতি কোন অসদ্ভাব পোষণ করিও না, তুমি উঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর তাহা হইলে তোমার

সদ্‌গতি হইবে।" যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী ; শৈব রামানুজ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি আপাততঃ জননীর এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি একদিন রামানুজের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভক্তিরত্নের প্রার্থী হইলেন। যতিরাজ তাঁহার শিক্ষাগুরু, ও অসাধারণ বৈদান্তিকের এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনিও নতশিরে যাদবপ্রকাশের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণত হইলেন এবং তৎপর তাঁহাকে যথারীতি পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষান্তে তিনি উঁহার নাম গোবিন্দ রাখিলেন। যিনি দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, প্রসিদ্ধ তার্কিক ও শৈব-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি অবাধে বেদান্তমত প্রচলন ও নিজের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য রামানুজের জীবন নাশেও কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তিনি আজ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন— দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল! মধ্যাহ্ন-তপনের উজ্জ্বল কিরণের ন্যায় যতিরাজের জ্ঞানজ্যোতিঃ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবেরা যতিরাজকে তথায় লইয়া গিয়া যামুনাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কথিত আছে, শ্রীরঙ্গনাথ কাঞ্চিপুরে, বরদারাজের নিকট যতিরাজকে প্রেরণ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বরদারাজ, যতিরাজের ন্যায় তাঁহার অনুগত শিষ্যকে তথায় প্রেরণ করিতে সম্মতি দান করেন নাই। অবশেষে সুগায়ক যামুনাচার্য্যের শিষ্য বররঙ্গ কাঞ্চিপুরে আগমন করিয়া বরদারাজের সম্মুখে সুললিত সঙ্গীত করিয়া, তাঁহার প্রীতি

উৎপাদন করেন। দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। বররঙ্গ বলেন, "প্রভো! যতিরাজকে শ্রীরঙ্গমে যাইবার আদেশ করিতে হইবে,—আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা।" বরদারাজ তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অবশেষে যতিরাজ বরদারাজের চরণে প্রণাম করত তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বররঙ্গের সহিত বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীরঙ্গধামে যাত্রা করিলেন। সুরেশ ও দাশরথী নামে তাঁহার অনুগত শিষ্যদ্বয়ও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন।

যতিরাজের আগমনে শ্রীরঙ্গধাম উৎসবময় হইয়া উঠিল। শত শত লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নিশান্ উড়াইয়া গমন করিতে লাগিল; মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া, যতিরাজের শুভাগমন চারিদিকে ঘোষণা করিতে লাগিল। পূর্ণাচার্য্য যতিরাজের দীক্ষাগুরু হইলেও তাঁহাকে অসামান্য পুরুষ জ্ঞান করিয়া, তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন! আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে যতিরাজ আশ্রমে উপনীত হইলেন।

শ্রীরঙ্গম নূতন আকার ধারণ করিল। তথায় শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভগবদ্-প্রসঙ্গ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবও ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা চিরদিনই আপনাকে শিক্ষার্থী মনে করিয়া জ্ঞানান্বেষণে রত থাকেন। তিনি শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতিকালে পূর্ণাচার্য্যের নিকট কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম হইতে কিছুদূরে গোষ্ঠিপূর্ণ নামে এক বিশিষ্ট সুপণ্ডিত ও ভক্ত বাস করিতেন। মহাপূর্ণ যতিরাজকে তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে বলেন। ধর্ম্মানুরাগী যতিরাজ তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহার ধৈর্য্য-পরীক্ষা করিবার জন্য, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বিফল-মনোরথ করিতে লাগিলেন; এইরূপ অষ্টাদশ বারের পর, তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন, এবং সে-মন্ত্র অতি গোপনে রক্ষা করিতে বলিলেন। যতিরাজ মন্ত্রগ্রহণান্তর যেন অধিকতররূপে নব-বলে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন,

এক নূতন আনন্দধারা তাঁহার হৃদয়ে বহিতে লাগিল। মহাপুরুষেরা চিরদিনই নিঃস্বার্থ—তাঁহারা যে স্বর্গের বিমল আনন্দ লাভ করেন, তাহা কেবল নিজে সম্ভোগ করিয়াই তৃপ্ত হন না; অপরকে সে আনন্দ বিতরণের জন্যও ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যতিবর গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট হইতে যে মন্ত্র-লাভে হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতি প্রাপ্ত হইলেন, সে অপার্থিব আনন্দ সকলকে উপভোগ করাইবার জন্য, তিনি একদিন বহুজনাকীর্ণ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, গুরুদত্ত সেই গুপ্ত মন্ত্র সকলের নিকট বিবৃত করিয়া সকলকে সেই মন্ত্রের অধিকারী হইতে বলিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহার প্রদত্ত গুপ্ত মন্ত্রের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, যতিবরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে মন্ত্র দান করিয়া কি বলিয়াছিলাম না যে তুমি ইহা অতি গোপনে রক্ষা করিবে? জান না নিজের গুপ্তমন্ত্র প্রকাশ করিলে, মানুষ নরকগামী হয়?" যতিবর গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভো! যে মন্ত্র জপে জীবনের কল্যাণ হয়, অপরের জন্য সে-মন্ত্র প্রকাশে যদি নরকে যাইতে হয় আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।" গোষ্ঠিপূর্ণ যতিবরের বাক্য শুনিয়া নিরুত্তর হইলেন, বুঝিলেন, ইনি যথার্থই নরনারীর উদ্ধারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোষ্ঠিপূর্ণ অবশেষে আপনার পুত্রকে মোক্ষলাভের জন্য, যতিবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গরাজের মন্দিরের তত্ত্বাবধায়করূপে কার্য্য করিতেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে শত শত ব্যক্তি নিত্য দেব-প্রসাদের বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিত, কিন্তু যতিরাজ, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। বড় বড় তীর্থস্থানে দেবমন্দিরের পুরোহিতেরা অনেক স্থলে নীতি ও ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ উপায়ে মন্দিরের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। শ্রীরঙ্গমেও যতিরাজ পুরোহিতদিগের ঐরূপ অপকার্য্যের প্রতিবাদ করাতে তিনি তাঁহাদিগের

বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ' একদিন কোন পুরোহিত তাঁহাকে আপন ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে বলেন। যতিরাজ ইহাতে সম্মত হইলেন। পুরোহিত স্বীয় পত্নীকে বিষান্ন প্রস্তুত করিয়া যতিরাজকে দিবার অনুজ্ঞা করিলেন। পুরোহিত-পত্নী এই ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রথমে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষে স্বামীর ভয়ে তাহা করিতে বাধ্য হইলেন। যতিরাজ মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত-পত্নী এ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিবেন, তাহা ভাবিয়াই আকুল হইলেন ; অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল। তখন তিনি এক কৌশল বাহির করিলেন। অন্ন সম্মুখে আনিয়া তিনি নত মস্তকে, যতিবরের পাদবন্দনা করিবার সময় অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার চরণে "বিষ" এই কথা ত্বরায় লিখিয়া দিলেন। যতিরাজ নারীর ইঙ্গিত বুঝিয়া, সে অন্ন আর ভক্ষণ করিলেন না—নিকটস্থ একটি কুক্কুরকে উহা প্রদান করিলেন। সারমেয় ঐ অন্নভক্ষণে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহার অনতিকাল পরে, আর এক ব্যক্তিও, তাঁহাকে খাদ্যের সহিত বিষ প্রদান করে, কিন্তু সেবারও তাঁহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল। অসাধারণ ধৈর্য্য ও অতুলনীয় ক্ষমাগুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নরকুলের অতীত জ্ঞানে সেই ব্যক্তি তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তৎকালে যজ্ঞমূর্ত্তি নামে একজন অদ্বৈতবাদী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, রামানুজের সঙ্গে শাস্ত্রবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন। যতিরাজ রামানুজও তর্কের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অষ্টাদশ দিবস বিচার হইবে এই স্থির হইল। যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজকে বলিলেন, "আমি যদি বিচারে পরাস্ত হই তাহা হইলে, আমি আপনার পাদুকা মস্তকে বহন করিব।" যতিরাজ বলিলেন, "আমি যদি পরাস্ত হই, তবে আমি শাস্ত্রাধ্যয়ন পরিত্যাগ

করিব।” এই অসাধারণ পণ্ডিতদ্বয়ের বিচার দর্শনমানসে বহুদূর হইতে পণ্ডিত সকল সমবেত হইয়াছিলেন। বিচার আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন তুমুলভাবে শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; অবশেষে যতিবর যজ্ঞমূর্ত্তির কোন কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দানে অসমর্থ ভাবিয়া, একান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন। অষ্টাদশ দিন পূর্ণ হইতে আর দুই একদিন অবশিষ্ট আছে তখন যতিরাজের হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের নিকট গমন করিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে বলিলেন, “দেব, আমি বিচারে পরাস্ত হইলে আমাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং অদ্বৈত-মত প্রচারিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবে, তুমিই ইহার বিধান কর।” দেবতার কৃপা হইল। যতিরাজ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইয়া বলিতেছেন, “তুমি কেন চিন্তিত হইতেছ তুমি যামুনাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন নামক পুস্তক পাঠ কর, তাহা হইলেই তুমি যজ্ঞমূর্ত্তিকে পরাস্ত করিতে পারিবে।” যতিরাজ নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নানুসারে যামুনের পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া নবোৎসাহে তর্কস্থলে গমন করিলেন। দূর হইতে দিগ্বিজয়ী যজ্ঞমূর্ত্তি তাঁহার অপূর্ব্ব মুখ-জ্যোতিঃ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি যতিবরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন “কেবল নীরস জ্ঞানালোচনায় আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; এমন কি ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই অহমিকাও আমার হৃদয়কে সময়ে সময়ে অধিকার করিয়া ভক্তি-মার্গকে রুদ্ধ করিয়াছে।” দিগ্বিজয়ী অনুতপ্ত-হৃদয়ে যতিবরের নিকট এই সকল কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। যতিবর তাঁহাকে যথারীতি দীক্ষা দান করিয়া তাঁহার ‘মন্মাথ’ নামকরণ করিলেন। অদ্বৈতবাদীর শুষ্ক-হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোত আরো প্রবলতররূপে চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যতিবর যজ্ঞমূর্ত্তির জন্য স্বতন্ত্র আশ্রম স্থাপন করিয়া দিলেন।

তিনি যতিবরের অভিপ্রায়ানুসারে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কিছুদিন পরে যতিরাজ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া অষ্টসহস্র নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার বরদার্য্য ও যজ্ঞেশ নামে দুই শিষ্য ছিল। বরদার্য্য দরিদ্র ও যজ্ঞেশ ধনী; যতিরাজ শিষ্যসহিত বরদার্য্যের বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণ করিলেন। বরদার্য্য তখন কর্ম্মানুরোধে গৃহের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী পরমরূপবতী লক্ষ্মীদেবী কার্পাসরাম বরদার্য্যের দারিদ্র্যনিবন্ধন স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র রৌদ্রে দিয়া বিবস্ত্রা হইয়া গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিলেন। গুরু শিষ্যগণ লইয়া উপস্থিত হইলে লক্ষ্মী দেবী করতালি প্রদান করিলেন। রামানুজ লক্ষ্মীর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার মস্তকের পাগ্‌ড়ী গৃহের ভিতর ফেলিয়া দিলেন। লক্ষ্মী সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া বহির্গত হইয়া গুরুর চরণে প্রণতা হইলেন। কিন্তু গৃহে কিছুই নাই কিরূপে গুরুর সেবা করিবেন—এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি কোন ধনীর বাড়ীতে গমন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুতের সকল দ্রব্যই লইয়া আসিলেন এবং যতিবর ও তাঁহার শিষ্যদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। কথিত আছে, যে ধনী ব্যক্তির বাড়ী হইতে তিনি আহারের বস্তু ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন তিনি লক্ষ্মীর রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিতেন ও হৃদয়ের কু-অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে এই বাসনায় লক্ষ্মীর প্রার্থিত বস্তু দান করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে লক্ষ্মীর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ অবলোকন করিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়েন, এবং যতিবর রামানুজের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সংযতচিত্তে ভক্তি-পথ অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করিতে চাহিলেন। পরে তিনি বেঙ্কটাচলে উপনীত হইয়া প্রেমাশ্রু-নয়নে বেঙ্কটেশ্বরকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিলেন। এখানে বেঙ্কটগিরি উপত্যকার সন্নিকটে শ্রীশৈলপূর্ণ স্বামীর

বাসভবন। তিনি তথায় একবৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া রামায়ণ অধ্যয়ন করেন।

তৎপরে যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাতৃস্বস্রেয় গোবিন্দ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অনুগামী। গোবিন্দ ঈশ্বর পরায়ণও বটে। যতিবর তাঁহার সংসারে অনাসক্তি দেখিয়া বলিলেন যে—"শ্রুতিতে আছে, যখনই সংসারের প্রতি বীতরাগ উপস্থিত হইবে তখনি উহা পশ্চাতে রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। অতএব তোমার উহাতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।" গোবিন্দ যতিবরের কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

যতিরাজ অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ;—অদ্বৈতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধনির্ণয়ই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি যামুনাচার্য্যের মৃতদেহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, নরনারীর মুক্তির জন্য শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিবেন। এখন সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইয়া শিষ্যদিগকে আহ্বান করিলেন। যতিরাজ বলিলেন, "ভক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, আমি এ-জন্য শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব।" শিষ্যবৃন্দ সকলেই আনন্দমনে এই মহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুমোদন করিলেন। যতিবর তদীয় সুপণ্ডিত শিষ্য কুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কুরেশ, আমি বলিব তুমি লিখিবে।" কুরেশ বলিলেন, "তথাস্তু।" জগতের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ এইরূপে সুচিত হইল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যতিরাজ একদিন শিষ্যদিগকে দিগ্বিজয়ের বাসনা জানাইলেন, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সকলেই তাঁহাকে এ-কার্য্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

যতিরাজ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইয়া কাশ্মীরে গমন করিলেন। সেখানে 'শারদা পীঠ' নামে এক দেবতার মন্দির আছে। এই মন্দিরের চারিদ্বারে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বাস করিতেন। যতিরাজ এই সকল পণ্ডিতের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। শারদা দেবী যতিরাজকে বলিলেন, "তোমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছ সে-জন্য তোমার ভাষ্যকার নাম হইল।" এইরূপ কথিত আছে, শারদা দেবী যতিরাজকে বলিয়াছিলেন,—"শঙ্কর একবার শ্রুতির কোন সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তুমি ভাষ্যে সে-বিষয়ের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

অতঃপর তিনি বেঙ্কটাচল ও পুরুষোত্তম হইয়া শ্রীরঙ্গমে গমন করিলেন।

একবার শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গদেবের উৎসব উপলক্ষ্যে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে, এমন সময় যতিরাজ দেখিলেন, একটি লোক এক পরমা রূপবতী নারীর মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া অনিমিষ-নয়নে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে। যতিরাজ এই লোকটির নির্লজ্জতা দর্শনে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এত লোকের সম্মুখে এই নারীর মস্তকে ছত্র ধরিয়া, উহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছ—ইহাতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না?" লোকটি বলিল, "ইনি আমার পত্নী এ পৃথিবীতে এমন রূপ আমি আর দেখি নাই, লোকে যাহাই বলুক আমি সর্ব্বদাই এই মুখখানি দেখিতে ভালবাসি।" যতিরাজ বলিলেন, "আমি যদি এ-মুখ অপেক্ষা আরো সুন্দর মুখ দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?" লোকটি বলিল, "তখন আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।" সায়ংকালে শ্রীরঙ্গদেবের আরতির সময় ধনুর্দাস ও কনকাঙ্গনাকে লইয়া যতিরাজ মন্দিরে গমন করিলেন এবং শ্রীরঙ্গদেবের মূর্ত্তির দিকে ধনুর্দাসের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "ধনুর্দাস, জগতে এমন সুন্দর মূর্ত্তি কি আর দেখিয়াছ?" ধনুর্দাস তখন দেবতার মূর্ত্তি-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যতিরাজ দেখিলেন, ধনুর্দাসের চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে। ধনুর্দাস যতিরাজের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "সত্যই, আমি এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও দেখি নাই।" সেই দিন হইতে ধনুর্দাস ও তাহার পত্নীর জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। তাহারা যতিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনাসক্ত-হৃদয়ে ভক্তি-পথের পথিক হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ধনুর্দাস শূদ্র হইলেও যতিবর স্নান করিবার সময় তাহার হস্ত ধরিয়া কাবেরীর জলে অবতরণ করিতেন এবং স্নানান্তে তাহারই হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক নদী হইতে তটে আসিতেন। যতিবরের ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। যতিরাজ তাঁহাদিগের জীবনের সহিত ধনুর্দাসের জীবনের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণোচিত গুণ সকল তাঁহাদের অপেক্ষা ধনুর্দ্দাসেতেই অধিকতররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে; এই জন্য সে শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণ তুল্য—সে ভক্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন যতিরাজ ভক্তগ্রামে বাস করেন, তখন শ্বেত মৃত্তিকার অভাব হওয়াতে, নারায়ণ স্বয়ং প্রকট হইয়া তাঁহাকে বলেন, "তুমি যাদবগিরিতে গমন করিলে শ্বেত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হইবে।" যতিরাজ তথায় গমন করিলেন। শ্বেত মৃত্তিকার জন্য ভূমি খনন করিতে করিতে, তিনি যাদবেশ্বরের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই উপলক্ষ্যে চারিদিকে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল; মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি বাজিতে লাগিল। যতিবর যাদবেশ্বর প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিন্তু যাদবেশ্বরের অর্চ্চামূর্ত্তির প্রয়োজন। যতিবর স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন যে, অর্চ্চামূর্ত্তি দিল্লীশ্বরের বাটীতে আছে। যতিবর বহুসংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে

দিল্লী গমন করিয়া সম্রাটকে এ-বিষয় অবগত করিলেন। সম্রাট-কুমারী লক্ষ্মীর গৃহে রামমূর্ত্তি বিরাজ করিতেন। সম্রাটের আদেশে যতিবর সম্রাট-কুমারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া রামমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া বহির্গত হইলেন। কথিত আছে—সম্রাট-কুমারী রামমূর্ত্তিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং অন্তরে তাঁহাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া নিজ শয্যায় স্থান দান করিয়া নিশা যাপন করিতেন। লক্ষ্মীর এই প্রাণবল্লভ রামমূর্ত্তিকে যখন তাঁহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনা হইল, রাজকুমারী তখন শোকে অভিভূত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়েন। সম্রাট কন্যার এই অবস্থা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া সান্ত্বনা প্রকাশ করিতে থাকেন; কিন্তু রাজকুমারী কিছুতেই সান্ত্বনা পাইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি রামমূর্ত্তির সহিত গমন করিতে চাই, নতুবা আমি এ-দেহ রাখিব না।" সম্রাট কন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এক পাল্কীতে যতিবর, রাজকুমারী ও রামপ্রিয় বহু সৈন্য ও বহু লোক পরিবেষ্টিত হইয়া, যাদব-গিরিতে যাত্রা করিলেন। রামপ্রিয় ও লক্ষ্মী এক পাল্কীতে গমন করিতে করিতে, লক্ষ্মী তাঁহার হৃদয়নাথ রামপ্রিয়ের অঙ্গে বিলীন হইয়া যান। অবশেষে যাদবগিরিতে রামপ্রিয় মূর্ত্তির নিকট লক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দিল্লীশ্বর রামমূর্ত্তি ও তদীয় দেবকন্যা লক্ষ্মীমূর্ত্তি দর্শন করিতে তথায় গমন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। রামানুজের প্রভাবে যাদবগিরি অরণ্য সুন্দর গ্রামরূপে পরিণত হইল। যাদবগিরি তীর্থ-স্থান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল।

কোন সময়ে শৈবধর্ম্মাবলম্বী চোলরাজাধিপতি বৈষ্ণবদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তিনি সভা আহ্বান করিয়া সকলকে 'আমি শিবের উপাসক'—বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতে বলেন। শৈবেরা রাজাজ্ঞানুসারে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা এ-সময় অনেকে রাজার শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় গোপনে দেশ

ছাড়িয়া পলায়ন করেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য যতিরাজকে সে-সভায় আনাইয়া শৈব বলিয়া স্বাক্ষর করাইতে পারিলে, সকল বৈষ্ণবেরই মত প্রদান করা হইবে। চোলরাজ এই স্থির করিলে, তাঁহাকে আনিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে লোক প্রেরিত হয়। কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য গোপনে তাঁহাকে শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিতে বলেন। যতিরাজও কতিপয় শিষ্যসহ তাহাই করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জঙ্গলের মধ্যে এক পল্লীতে উপনীত হইলেন। পল্লীবাসীরা ব্যাধ। তাঁহারা এক পরিবারের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে ব্যাধেরা শাক ও তণ্ডুলের দ্বারা বিবিধ প্রকারে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিল। এই ব্যাধেরা বৈষ্ণব এবং যতিবরের শিষ্য। যখন তাহারা সেই অলোক-সামান্য পুরুষের পরিচয় পাইল তখন পল্লীবাসীরা সকলে সমবেত হইয়া ভক্তি-ভরে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া গুরুভক্তির পরিচয় দান করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইলে, বিষ্ণুভক্ত ব্যাধেরা বহুদূর পর্য্যন্ত যতিরাজের সঙ্গে গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। পরে যতিরাজ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের পত্নী বাল্যকালে শ্রীরঙ্গমে গমন করিয়া যতিরাজের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার নাম চৈলাঞ্চলম্বা। ইনি নবযৌবন-সম্পন্না পরম রূপবতী নারী। কথাপ্রসঙ্গে যখন তিনি শুনিলেন যতিরাজ ও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার গৃহে আগমন করিয়াছেন—তখন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তখন যতিবরের শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার গুরু দেখাইয়া দাও?" চৈলাঞ্চলম্বা তখন গুরুর চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ইহাই আমার গুরুর চরণ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ইঁহার গৈরিক বসন, দণ্ড ও কমণ্ডলু দেখিতে পাইতেছি না।" তখন যতিবর বলিলেন, "তোমার গুরু তোমায় কি মন্ত্র দিয়াছিলেন, আমার কাণের নিকট গোপনে বল দেখি?" চৈলাঞ্চলম্বা তাঁহার কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া মন্ত্রটি বলিলেন। তখন আনন্দে যতিবর

তাঁহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "সাধ্বী, আমি কোন কারণে গৈরিক বসন, দণ্ড ও কমণ্ডলু পরিত্যাগ করিয়াছি। তখন চৈলাঞ্চলম্বা কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুপদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যতিবর তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চৈলাঞ্চলম্বার অনুরোধে তাঁহার স্বামী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এদিকে দাশরথী ও পূর্ণাচার্য্যকে ধৃত করিয়া চোলরাজের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। চোলরাজ তাঁহাদিগকে শিবোপাসক বলিয়া আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। ইঁহারা প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-উপাসক ও পণ্ডিত; সেজন্য বীরের ন্যায় শৈবধর্ম্মের উপর বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিলেন। চোলরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উভয়েরই চক্ষু উৎপাটন করিতে বলিলেন। রাজাজ্ঞায় উভয়ের চক্ষু উৎপাটিত হইল! দরদর ধারে উভয়ের চক্ষু হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু অন্তরের জ্যোতিঃ কে নিবারণ করিতে পারে? সে-জ্যোতির আভায় তাঁহারা বাহিরের সকল কষ্ট বিস্মৃত হইয়াছিলেন!

ক্রমে চোলরাজ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার গলায় ঘা হইয়া তাহাতে ক্রমি উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি কিছুদিন পরে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কণ্ঠে ক্রমি উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম 'ক্রমিকণ্ঠ চোল' হইয়াছিল। ক্রমিকণ্ঠ চোলের পরলোক গমনের সংবাদ যতিরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম নিষ্কণ্টকে বিস্তারিত হউক—বলিয়া মৃত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আগমনে চারিদিকে আনন্দের রোল উত্থিত হইল।

ইতঃপূর্ব্বেই পূর্ণাচার্য্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যতিরাজ পূর্ণাচার্য্যের পরলোক গমনের কথা শ্রবণে ও কুরেশের দুই চক্ষু উৎপাটিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্য-দিগকে দীক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ স্বামীর দেহ ক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। ভারতে যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনুপম ভক্তি, অদম্য প্রচারোৎসাহের গুণে ধর্ম্মজগতে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল সে মহাত্মার সেবার জন্য শতাধিক শিষ্য সমবেত হইয়া কেহ তাঁহার পাক-কার্য্যে, কেহ তৈল মর্দ্দনে, কেহ তোরঙ্গ ও পাদুকা বহনে আপনাদের দেহ-মন নিয়োগ করিল!

দয়ার্দ্রহৃদয় রামানুজ কুরেশের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হওয়াতে প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি সে-জন্য একদিন দুঃখ প্রকাশ করিলে, কুরেশ বলিলেন, "প্রভো! সে-জন্য দুঃখ কি? আমার বাহিরের চক্ষু নষ্ট হওয়াতে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা ঘটিবার সম্ভাবনা কম হইয়াছে, অন্তরের মধ্যে হৃদয়নাথকে দেখিবার সুযোগ হইতেছে।" যতিবর তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথের নিকট নষ্ট চক্ষু পুনঃ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ কুরেশ শ্রীরঙ্গদেবের নিকট গমন করিয়া, অন্তশ্চক্ষুর উজ্জ্বলতার জন্য প্রার্থনা করেন। দেবতা প্রসন্নচিত্তে "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। কিন্তু যতিরাজ তাঁহার নষ্ট চক্ষু উদ্ধারের জন্য স্বয়ং শ্রীরঙ্গদেবের নিকট প্রার্থনা করাতে শ্রীরঙ্গদেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। কুরেশ গুরুদেবের প্রার্থনায় চক্ষু লাভ করিলেন।

একদিন যতিরাজ শ্রীরঙ্গধাম হইতে কয়েকটি শিষ্যসহ, কোন পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে যান। তাঁহাদের ভোজনের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটি গোপ-বালিকা দধি বিক্রয় করিতে আসে। জনৈক শিষ্য দধি ক্রয় করিয়া মূল্য প্রদান করিতে আসিলে, গোপ-বালিকা বলিল, "আমি দধির মূল্য চাই না; আমি যতিবরের নিকট হইতে মোক্ষ প্রার্থনা করি।" যতিবর তাহাকে শ্রীরঙ্গদেবের নিকট হইতে মোক্ষপ্রার্থী হইতে বলিলে, বালিকা সে-জন্য তাঁহার নিকট হইতে পত্র প্রার্থনা করিল। যতিরাজ তখন শ্রীরঙ্গ-দেবের নিকট একখানি পত্র প্রদান করিলে, বালিকা তথায় গমন করিয়া দেবমন্দিরের নিকট পত্রখানি রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তথায় শয়ন করিল,

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল—তাহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। সকলে বলিতে লাগিল—গোপবালিকার আত্মা ভগবানে বিলীন হইয়া গিয়াছে!

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ স্বামীর দেহান্ত হইবার সময় আসিতে লাগিল। যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনুপম ভক্তি, অদম্য প্রচারোৎসাহের গুণে ভারতের ধর্ম্ম-ইতিবৃত্তে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। সেই মহাত্মার সেবার জন্য একশত শিষ্য সমবেত হইয়া, কেহ তাঁহার পাককার্য্যে, কেহ তৈলমর্দ্দনে, কেহ তোরঙ্গ ও পাদুকা বহনে, আপনাদিগের দেহ-মন নিয়োগ করিয়াছিল। তিনি শ্রীরঙ্গদেবের নিকট যাইয়া, এ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরঙ্গদেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। যতিবর শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া, দেহত্যাগের বিষয় জ্ঞাত করিলে, তাঁহাদের হৃদয় শোক-দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। শ্রীরঙ্গদেবের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণানন্তর তিনি এ-মর্ত্তলোকে চারিদিবসমাত্র জীবিত ছিলেন এবং এই চারিদিবস শিষ্যদিগকে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দান করেন। ক্রমে শেষ-দিন উপস্থিত হইল। তিনি প্রাতে স্নান করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, “প্রভো! আমার শত্রু-মিত্র যেন সকলেই দেহান্তে বৈকুণ্ঠ-লাভ করে।” তাঁহার আরাধ্যদেব ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শিষ্যেরা তাঁহার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল। এখন অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, তাঁহাকে সকলে ঘেরিয়া বসিল। গোবিন্দের কোলে মস্তক ও আন্ধ্রপূর্ণের কোলে পদদ্বয় রাখিয়া তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—চিরতরে অনন্ত ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। এ-সময় তাঁহার বয়স একশত কুড়ি বৎসর হইয়াছিল।

মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মধ্বাচার্য্য ১১২১ শকে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুলব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধিজী ভট্ট। প্রায় সকল মহাপুরুষদিগের জন্ম বিষয়েই দুই একটী অলৌকিক গল্প আছে। তাঁহার চরিতাখ্যায়কেরাও তাঁহার জন্ম বিষয়ে ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। কথিত আছে, পবনদেব মানবের পরিত্রাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনিই মধ্বাচার্য্যরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। মধ্বাচার্য্য অনন্তেশ্বরের মঠে শিক্ষালাভ করেন এবং অল্প বয়সে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। যখন তাঁহার নয় বৎসর বয়স, তখনই তিনি সংসারের প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করেন এবং জীবনে সকল সুখের আশা পরিত্যাগ করিবার মানসে, এই অল্প বয়সেই অচ্যুত প্রচের নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসীরা সকল সময়েই সংসার-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা জন-কোলাহলশূন্য প্রান্তরে বাস করিয়া, নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন করেন এবং বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া কেহ বা নরনারীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মধ্বাচার্য্যও দীক্ষান্তে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, তিনি গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া বেদব্যাসকে দেখাইবার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন। তিনি ভক্তি-ধর্ম্ম-মূলক সাঁইত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতবাদী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্য উদিপিতে ও অন্যান্য স্থানে বিষ্ণুবিগ্রহ পূজার জন্য আটটি

মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল মন্দিরে দণ্ডীরা পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতি করিয়া, দেবসেবার ভারগ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন যিনি এই ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি মন্দিরের সম্মানরক্ষার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। মঠাধ্যক্ষেরা তিন বৎসরের অনধিককাল এই মন্দিরে বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কাহারও আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার নাই। ইঁহারা নিতান্ত নীচজাতি ভিন্ন সকলকেই দীক্ষা-দান করিতে পারেন।

এই সম্প্রদায়ের দণ্ডীরা মস্তক মুণ্ডন, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ, ও গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন এবং ললাটে ও নাসিকাতে তপ্ত লৌহ-শলাকার দ্বারা চিহ্ন করিয়া থাকেন। মধ্বাচারীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য ইঁহারা দ্বৈতবাদী বলিয়াই পরিচিত। ইঁহারা বিষ্ণুর উপাসক; অন্যান্য বৈষ্ণবেরা যেমন বিষ্ণুকে জগতের মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, ইঁহারাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। কেবল পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তনই ইঁহারা উপাসনার একমাত্র অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। সর্ব্বাগ্রে শারীরিক, বাচনীক ও মানসিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ইঁহারা উপাসনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তৎসাধনে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন। শৈব সম্প্রদায়ের সহিত অনেক বিষয়ে ইঁহাদিগের মতের ঐক্য আছে। এই জন্য অনেকে মনে করেন, মধ্বাচার্য্য প্রথমে শৈব মতাবলম্বী ছিলেন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় মধ্বাচার্য্যের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"মধ্বাচার্য্যের প্রণীত সমুদায় গ্রন্থ এবং বেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও রামায়ণ ইঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। ইঁহারা সকল শাস্ত্রে সবিশেষ শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বোধ হয় মধ্বাচার্য্য প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ ভঞ্জনার্থ যথাশক্তি যত্ন করেন। এ-বিষয়টি অনেক কারণে সম্ভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ তিনি অনন্তেশ্বর নামক শিব-মন্দিরে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত তীর্থ-উপাধি গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্রে শিব-পার্ব্বতী প্রভৃতিরও পূজা হয়। চতুর্থতঃ মাধ্ব ও শাঙ্কর গুরুদিগের শিষ্যেরা পরস্পর উভয় পক্ষীয় গুরুদিগকেই নমস্কার ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন এবং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গগিরিস্থ মঠের মহন্ত উদিপি নগরের কৃষ্ণ-মন্দিরে পূজা করিতে আইসেন। অতএব এই উভয় প্রকার শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীর উপাসকদিগের পরস্পর ঐক্য ও সদ্ভাব আছে বলিতে হইবে। যে সকল শৈব ও বৈষ্ণব এইরূপ সদ্ভাব-সম্পন্ন না হইয়া পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মধ্বেরা তাঁহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।" •

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বল্লভাচার্য্য আম্বলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম আড়াইল। এখানে বল্লভাচার্য্যের এখন আসন রক্ষিত রহিয়াছে। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণ ভট্ট। বল্লভাচার্য্য বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গোকুলে বাস করিতেন, পরে আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভক্তি-ধর্ম্ম বিস্তারে রত হন। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ছিল। তিনি নানা স্থান পর্য্যটন করেন এবং স্বীয় মতের প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি বিজয়নগরে রাজা কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। তৎপর

তিনি উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়া, তথায় অশ্বথবৃক্ষতলে আপন আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। এখনও চুণার প্রভৃতি স্থলে তাঁহার মঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাচার্য্যেরা প্রায়ই কঠোর-বৈরাগ্য অবলম্বনই ধর্ম্ম-সাধনের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য সে-পথাবলম্বী ছিলেন না। তিনি উপবাস ও শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনকে ধর্ম্মের সহায় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার শিষ্যেরা বিষয়-সম্ভোগ করেন, সুখাদ্য ভোজন ও উত্তম পরিধেয় পরিধান করিয়া থাকেন; গোস্বামীদিগকে অনেক উপঢৌকন ও ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বল্লভাচার্য্য প্রথমে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হন। তৎপর তিনি গৃহী হইয়া, সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন,—লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ইঁহারাও হস্তে ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র ও গদা-পদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন; মালা-জপ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম লইয়া প্রেমভরে পরস্পর আলিঙ্গন-দানাদি করিয়া থাকেন। ভট্ট নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তদীয় শিষ্যবৃন্দের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিনি ভাগবতের একখানি টীকা রচনা করেন এবং তাহা লইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট গমন করিয়া বলেন, "আমি শ্রীধর স্বামীর টীকার দোষ খণ্ডনপূর্ব্বক এই টীকা রচনা করিয়াছি।"—এই বলিয়া তিনি তাঁহার রচিত ভাগবতের টীকা শুনাইতে লাগিলেন। সেখানে গদাধর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। বল্লভ ভট্ট তাঁহার টীকা শুনাইয়া ইঁহাদিগের নিকট প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থ বলেন, শ্রীচৈতন্য বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "যে 'স্বামীর' নিন্দা করে, তাহাকে কুলটা বলা যাইতে পারে।" ভট্টের গর্ব্ব এখানে চূর্ণ হইয়া যায়। তিনি তৎপর শ্রীচৈতন্যের

চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করেন। যথা ভক্তমালে,—

"শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকার দোষ দিয়া॥
শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ স্থানে গেলা শুনাইতে।
আপন পৌরুষ মানি লাগিল কহিতে॥
শ্রীধরস্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুঞি পঁহু॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥
এত শুনি আচার্য্য লজ্জিত হইয়া।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিল বসিয়া॥
* * *
সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিল মনে।
ভাগবতটীকা কৈনু দম্ভের কারণে॥
বিশেষত অন্যের উপরে দোষ দিনু।
কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু॥
* * *
এত ভাবি দৈন্যভাবে প্রভুস্থানে গেলা।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি করিলা॥"

বল্লভাচার্য্যের স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে একটি গল্প কথিত আছে। তিনি যখন বারাণসীতে বাস করিতেন, তখন একদিন জাহ্নবী-সলিলে স্নান করিতে গমন করেন। গঙ্গার জলে অবগাহন করিতে করিতে তাঁহার দেহ জলে একেবারে মিশিয়া গেল! লোকে তাঁহার দেহ আর দেখিতে পাইল না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য্য দিব্যদেহ-ধারী হইয়া, সমবেত বহু দর্শকবৃন্দের মধ্যে সলিলবক্ষ হইতে উত্থিত হইলেন এবং শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া আকাশের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সে কান্তিও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল!

অনেক ধনী সুবর্ণ বণিক বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বী। মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতের অনেক স্থানে বল্লভাচারীদিগের মঠ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ সম্প্রদায়ের নাম নিম্বাদিত্য। ভক্ত নিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহার পূর্ব্ব নাম ভাস্করাচার্য্য। বৃন্দাবনধামে ভাস্করাচার্য্যের এক আশ্রম ছিল। একদিন একজন জৈন দণ্ডী তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তথাপি বিচার সমভাবে চলিতে থাকিল। সন্ধ্যা অতীত হইলে ভাস্করাচার্য্য অতিথির আহারের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিলেন। জৈন যতিরা পাছে কোন প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হয় সে-জন্য সন্ধ্যা অতীত হইলে ভোজন করেন না। অতিথি আশ্রমে উপবাসী হইয়া থাকিবেন, এ-জন্য তিনি সূর্য্যের গতি রোধ করিলেন এবং যে পর্য্যন্ত নবাগত সন্ন্যাসীর ভোজন শেষ না হয়, তদবধি তাঁহাকে আশ্রমের নিকটস্থ নিম্ববৃক্ষে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। সূর্য্যদেবও ভাস্করাচার্য্যের আদেশানুসারে যতির ভোজন শেষ না হওয়া অবধি সেই নিম্ববৃক্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি ভাস্করাচার্য্যের নাম 'নিম্বার্ক' হইল।

জৈন যতি নিম্বাদিত্যের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এবং জৈন-মত পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যথা ভক্তমালে :—

"যতি শাস্ত্র বচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজ ভক্তি বলে সাধু সৃজিলা উপায়॥

আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক॥
কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেল লইয়া সম্মতি॥

* * *

কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া॥
সাধুসঙ্গ-মহিমা দেখিয়া অদ্ভূত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি জ্ঞানমত॥"

নিম্বাদিত্যের শিষ্যেরা অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিলক ধারণ করেন, ও গলায় তুলসীর মালা পরেন। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতের অনেক স্থলে, বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে বহুতর 'রামাইত' বাস করিয়া থাকেন। ভাগবতই ইঁহাদিগের প্রধান শাস্ত্র। ইঁহারা বলেন,—নিম্বাদিত্য একখানি বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

তুকারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত পুনা সহরের অনতিদূরে ইন্দ্রায়ণি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীতীরে দেহু নামক পল্লীতে আনুমানিক ১৫১০ শকাব্দে তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। ভগদ্ভক্তেরা অনেক স্থলেই পিতামাতা বা উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তুকারামের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম বিশ্বম্ভর; বিশ্বম্ভর শূদ্র বংশীয়। তিনি ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও তিনি ধর্ম্মানুগত-প্রাণ হইয়া, অতি সততার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতেন। বিশ্বম্ভর বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই সাধুসঙ্গে ও ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন।

দেহু হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে পণ্টরপুর গ্রামে বিঠলদেবের মন্দির ছিল। বিশ্বম্ভর বিঠলদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি তাঁহার অর্চ্চনার জন্য এই সুদূরপথে পদব্রজে গমন করিতেন। এইরূপে ষোড়শবার তথায় গমনাগমন করিলে, বিঠল তাঁহার উপাসকের ধর্ম্মভাব দর্শনে প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "আর তোমাকে কষ্ট করিয়া, আমার পূজার জন্য এখানে আসিতে হইবে না। তুমি নিজগ্রামে বসিয়াই আমার অর্চ্চনা করিবে।" স্বপ্নাদিষ্ট হইবার পর বিশ্বম্ভর নিজগ্রামে ইন্দ্রায়নি নদী-তীরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তথায় বিঠলের এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন।

বিশ্বম্ভরের পরিবারস্থ সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সেই ধর্ম্ম-পরায়ণতা যেন ধারাবাহিকরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার অধস্তন বংশাবলীতেও

সংক্রামিত হইয়াছিল। তুকারামের পিতার নাম বোহ্লোবা ও মাতার নাম কনকাঙ্গী। তুকারামের পিতামাতাও ভগবৎ-ভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তার জন্য সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তুকারাম তাঁহার পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম সাত্তজি। সাত্তজির বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি বীতরাগ জন্মিয়াছিল। সে-জন্য তিনি বিষয়-কার্য্যে বড়ই ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন। জ্যেষ্ঠ সন্তানের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া বোহ্লোবা তুকারামকে বিষয়-কার্য্য পরিচালনের ভার অর্পণ করিলেন। তুকারামের বয়স এখন ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া তত্রত্য ধনী বণিকদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন।

তুকারাম দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম রুক্মাবাই, দ্বিতীয়ার নাম অবলাঙ্গী; তুকারাম তাঁহার 'অভঙ্গের' মধ্যে অবলাঙ্গীকে কর্কশ-স্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তুকারাম উৎসাহের সহিত ব্যবসায়-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কার্য্য-দক্ষতার জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তিনি ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়তি কে এড়াইতে পারে? যখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ, তখন তাঁহার পিতামাতা ক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর তুকারামের মনের অবস্থা কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়া গেল। যে উৎসাহের সহিত তিনি বাণিজ্য চালাইতে ছিলেন, সে-উৎসাহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। সহজেই তাঁহার অর্থাগমের পথও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং বণিকদিগের মধ্যে দেউলিয়া বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহাকে বিষয়কার্য্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য বিশেষরূপে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "বিঠোবার পূজাতেই তোমার এই সর্ব্বনাশ

হইল।" অন্যান্য লোকেরাও বিঠোবার পূজাই তাঁহার কার্য্যের নিষ্ফলতার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তিনি নীরবে সকলের তিরস্কার সহ্য করিতে লাগিলেন। তুকারামের মন আর সংসারে নাই; কে তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিবে? তিনি দেহু হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাণ্ডার নামক একটি রমণীয় পর্ব্বতে গমন করিয়া, তথায় সমস্ত দিবস মনের সাধে সাধন-ভজন করিয়া, সায়ংকালে দেহুতে প্রত্যাগত হইতেন এবং বিঠোবার আরাধনা ও নাম-কীর্ত্তনাদিতে প্রায় সমস্ত রজনী যাপন করিতেন। তুকারাম ভাণ্ডার পর্ব্বতে, কখনও বা ইন্দ্রায়ানী নদীতীরে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। তিনি নদীর যে স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন, তাহার নিকটেই একজন কৃষক বাস করিত। সে একদিন তুকারামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে তাহার শস্যক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে বলিল। তুকারাম তাহার কথায় সম্মত হইলে, কৃষক তাঁহার হস্তে একগাছি যষ্টি প্রদান করিলেন। তুকারাম জীবজন্তুদিগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তথায় যষ্টিহস্তে উপবেশন করিলেন। পক্ষীরদল আসিয়া যখন ক্ষেত্রের উপর বসিয়া শস্য খাইতে লাগিল, তখন তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দিয়া বলিলেন, "তোমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছ আহার করিয়া, তৎপর জলপান করিয়া আপনাপন বাসায় উড়িয়া যাও।" ধ্যানপরায়ণ তুকারাম নির্জ্জন ক্ষেত্রের নিকট বসিয়া অনেক সময় আপনার ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান-নিমগ্ন-চিত্তে থাকিতেন। ক্রমশঃ বিহঙ্গমকুল মনের সাধে শস্য-ক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত শস্যই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। কিছু দিন পরে কৃষক আসিয়া ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া তুকারামকে অত্যন্ত তিরস্কার করিল এবং একটা নির্দ্ধারিত পরিমাণ শস্য ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিতে বলিল। অন্যান্য লোকেরাও মধ্যস্থ হইয়া তুকারামকে এইরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করিল। কথিত আছে, তুকারামকে যে পরিমাণ শস্য প্রদান করিতে বলা হয়, তুকারাম পরক্ষণেই শস্যক্ষেত্রে তদপেক্ষা বহুল পরিমাণ শস্য রাশীকৃত

দেখিতে পান। সকলেই কৃষকের প্রাপ্য শস্য দিয়া অবশিষ্টাংশ তুকারামকে গ্রহণ করিতে বলিল।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দেহুতে বিঠোবার যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সংস্কার অভাবে তাহা ভগ্ন-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তুকারাম সেই জীর্ণ মন্দির সংস্কার করিতে সংকল্প করিয়া, মৃত্তিকা খনন করিয়া, স্বহস্তে তাহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টাতে বিঠোবার মন্দির নূতন আকার ধারণ করিল। বিঠোবার মন্দিরের সম্মুখে কবিরা অভঙ্গ রচনা করিয়া, গান করিতেন। তাঁহাদিগের সুললিত রচনাবলী শ্রবণ করিয়া, তুকারামের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইত। অবশেষে তাঁহাদিগের পথানুসরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। তিনি সে-জন্য, নামদো প্রভৃতি মহারাষ্ট্র দেশীয় বড় বড় কবিদিগের গ্রন্থাবলী রামায়ণ ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পুস্তক রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহার প্রাণে কবিত্বের উৎস ক্রমে উৎসারিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি অবশেষে কবি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মানব-হৃদয়ে প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমই আর্ত্ত নরনারীর প্রতি করুণারূপে উথলিয়া উঠে। তুকারাম সাধ্যানুসারে আর্ত্ত নরনারীর সেবাতে আপনাকে নিয়োগ করিলেন। বিঠোবার উপাসকেরা যখন মন্দিরে আগমন করিতেন, তখন তাঁহাদিগের কোন কষ্ট না হয়, সেজন্য তিনি কঙ্করযুক্ত পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন; রজনীতে বিঠোবার পূজকদিগের পথ-প্রদর্শনের জন্য স্বহস্তে আলোক ধরিয়া থাকিতেন। একবার এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে পথে চলিতে অশক্ত দেখিয়া, তুকারাম তাঁহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যান। তিনি পীড়িতদিগের সেবা করিতেন; পথশ্রান্ত পথিকদিগের চরণ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া দিতেন এবং বিবিধ প্রকারে তাহাদিগের সেবা করিতেন। আবার কেবল নরনারীর সেবা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না,—তাঁহার উদার হৃদয় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের কষ্টমোচনে প্রধাবিত হইত। তিনি পিপীলিকাদিগের আহারের জন্য তাহাদিগের গর্ত্তের সম্মুখে খাদ্য রাখিয়া দিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখা যায়, কোন কার্য্যে বিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সে-জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকেন। নামদেব মহারাষ্ট্র দেশের বিখ্যাত কবি ছিলেন। তুকারাম একদিন কোন স্থানে যাইবার পথে রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন—যেন বিঠোবা নামদেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি অভঙ্গ রচনা কর এবং নামদেব যে সংখ্যক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তুমি তাহার অতিরিক্ত সংখ্যক কবিতা রচনা কর।" এই স্বপ্ন-দর্শনের পর হইতে তাঁহার হৃদয়ে যেন কবিত্বের ফোয়ারা উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া বহুসংখ্যক অভঙ্গ রচনা করিতে লাগিলেন। ভক্তকবি বলিয়া তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

তুকারামের স্বার্থত্যাগ ও ভগবদ্-ভক্তি প্রভৃতি গুণ দর্শনে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে নমস্কার করিতেন। শূদ্রকে ব্রাহ্মণে প্রণিপাত করিতেছে,—ইহা দর্শনে অনেকে বিদ্বেষভাবে পূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। মম্বাজী বাবাজী নামে এক ব্যক্তি বিঠোবার মন্দিরের নিকট আপন উদ্যান কণ্টক-যষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। তাহাতে বিঠোবার মন্দিরে আসিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে দেখিয়া, তুকারাম সেই বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। মম্বাজী তর্দ্দশনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, তুকারামের পৃষ্ঠে অতি নির্দ্দয়-রূপে কণ্টক-যষ্টি প্রহার করিলেন। এইরূপে প্রহৃত হইয়া, তুকারাম নিঃশব্দে সকলই সহ্য করিলেন। মম্বাজী নিত্য সন্ধ্যার সময় তুকারামের কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেন কিন্তু যে দিন তুকারামকে প্রহার করেন সে-দিন আর সন্ধ্যার সময় আগমন করেন নাই। তুকারাম মম্বাজীকে না দেখিয়া,

তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু মম্বাজী লোকদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নয়, গাত্রে বেদনা হইয়াছে। তুকারাম লোকমুখে এই কথা শুনিয়া নিজে তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার বেড়া না ভাঙ্গিলে, আপনি ত আমায় প্রহার করিতেন না ? অতএব আমিই দোষী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" মম্বাজি তুকারামের ধৈর্য্য ও বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তুকারাম নির্দ্দয়রূপে প্রহৃত হইয়া, বিঠোবার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া স্বীয় মনের কথা নিবেদন করিয়া শারীরিক সকল বেদনা ভুলিয়া গেলেন। তিনি সে-সময়ে যে অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল—

"ত্যজিব না তব শ্রীচরণ।
হে বিঠোবা তব শ্রীচরণ॥
আসুক যাতনা ঘোর : দহুক হৃদয় মোর ;
ঘটে যদি ঘটুক মরণ :
ত্যজিব না তব শ্রীচরণ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে এই দেহ শতধা করুক কেহ ;
তবু শঙ্কা নাহি কদাচন।
তুকা বলে ভগবান, হ'য়ে আছি সাবধান,
আদি হ'তে দৃঢ় করি মন॥
বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোবাহে কল্লে ভাল,
শাপে বরদান।
ক্ষমাগুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে
কণ্টকের বাণ।
তুকা বলে কৃপা করি সংহারিয়া ক্রোধ করি
দিলে পরিত্রাণ॥"

দীক্ষাগ্রহণ ধর্ম্মসাধনের বিশেষ সহায়। একথা সকল সময়েই এ-দেশে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মগুরুরা সময়ে সময়ে শিষ্যদিগের অন্তরে

এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন যে, সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারা জীবনে অনেক কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। কথিত আছে, তুকারামও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন মানুষ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। প্রকাশ, তাঁহার ইষ্টদেবতা বিঠোবা স্বয়ং তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তুকারামের অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি ও নিষ্ঠার কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, নানাস্থান হইতে তাঁহার দর্শনার্থ বহুলোক তাঁহার ভবনে আগমন করিত। তুকারামও নিজ ভবনে অতিথিদিগকে আশ্রয় দান করিতেন এবং আহারাদির ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিতেন। কিন্তু তুকারামের পত্নী অবলাঙ্গী তাহা ভাল বাসিতেন না এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত স্বামীকে সে-জন্য ভৎর্সনা করিতেন। স্ত্রীর নিকট হইতে অতিথিসেবার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল দেখিয়া, তিনি "বল্লালের বন" নামক একটি নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিলেন; প্রাতঃকালে স্নান ও বিঠোবার পূজা করিয়া সেই অরণ্যে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া, পুনরায় দেহুতে বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া, নাম-কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে দুইমাস কাল কাটাইয়া তিনি পত্নীর অনুরোধে গৃহে আইসেন।

তুকারাম সংসার হইতে দূরে থাকিলেও একেবারে সংসারের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার তিন কন্যা ও দুই পুত্র ছিল। পত্নীর অনুরোধে জেষ্ঠ্যা কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিতে বহির্গত হইয়া, তিনি পথিমধ্যে ক্রীড়ারত তিনটি বালককে ক্রীড়াস্থল হইতে আপন ভবনে আনয়ন করেন, এবং সেই দিবসেই তিনটি কন্যাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। পুত্রদিগের অভিভাবকেরা তুকারামের ন্যায় পরম ভক্তের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন মনে করিয়া, আনন্দিত হইয়াছিলেন।

তুকারাম সুমধুর কথকতা ও আপনার পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে ক্রমে সকলেরই পূজ্য হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া

তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল সময়েই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা সাধুদিগের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না। *যখন নরোত্তম দাস কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করেন, তখন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুনা সহরের নিকট রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। রামেশ্বর ভট্ট দেখিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যে সম্মান ও ভক্তি লাভ করিতে পারেন না, তুকারাম শূদ্র হইয়া তদপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন; এমন কি ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছে। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের এ প্রভাব আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গ্রামের অধিকারীর নিকট তুকারামের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, তুকারাম ব্রাহ্মণের প্রাপ্য অধিকার গ্রহণ করিতেছে। শাস্ত্রে যে জ্ঞানমার্গের কথা আছে সে তাহার বিরুদ্ধে কি এক নূতন মত ঘোষণা করিতেছে যে,—"ঈশ্বরের নাম-গানে পরিত্রাণ হয়।" তুকারাম দেশের লোককে বিপথগামী করিতেছে। তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করার একান্ত প্রয়োজন। গ্রামের মণ্ডল মহাশয় এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং তুকারামের শাসনের জন্য তিনি তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে দণ্ডাদেশ করিলেন। তুকারাম এই আদেশ শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুল হইলেন, এবং কিরূপে আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনের এ-অবস্থায় তিনি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট একবার যাওয়া স্থির করিয়া, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিলেন। রামেশ্বর তুকারামকে বলিলেন, "তোমার অভঙ্গের দ্বারা দেশের লোকের ক্ষতি হইতেছে; তুমি আর কবিতা রচনা করিতে পারিবে না।" তুকারাম বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি যখন অভঙ্গ রচনা করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন আমি

'বোম্বাই চিত্র' নামক উপাদেয় গ্রন্থে রামেশ্বর ভট্টের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম-ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল—যাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে দেবতারূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হইল যে, "ভগবন্ত জনের কোন জাতি নাই। যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচজাতির দোষ স্পর্শে না। দশগ্রন্থী বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, পুরাণ, ভগবদ্গীতা প্রত্যহ পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহারা সে-সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাত্যভিমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন,—তিনি বিঠোবার চরণদাস, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে কোথাও দেখি নাই।"

শিবাজী নামে একজন কাংশ্যকার তুকারামের শিষ্য ছিলেন। শিবাজীর চিত্ত ঘোর সংসারাসক্ত ছিল এবং তুকারামের কার্য্যাদি তাঁহার ভাল লাগিত না। কিন্তু পরিশেষে তুকারামের জীবনের অপূর্ব্ব প্রভাব দর্শনে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শিবাজী তুকার অনুগত শিষ্য হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে ও কীর্ত্তনাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন—উপার্জ্জনের অর্থ পরিবারে ব্যয় অপেক্ষা সাধুদিগের সেবায় ব্যয় করিতেন। স্বামীর এই সকল কার্য্য স্ত্রীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তুকারামই সকল অনিষ্টের মূল—এই স্থির করিয়া সে তুকারামকে একদিন আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল। তুকারাম আসিলে কাংশ্যকার-পত্নী তাঁহার শরীরের উপর উষ্ণজল ঢালিয়া দিল। তুকারাম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাঁহার ইষ্ট-দেবতা বিঠোবার নিকট গমন করিলেন এবং আপনার যন্ত্রণার কথা নিবেদন করিয়া শান্তি প্রার্থনা করিলেন। শরীরের সহিত

মনের অতি নিকটতর সম্বন্ধ। ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে ধর্ম্মবীরেরা অনেক সময় শারীরিক যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া থাকেন। তুকারাম ধর্ম্মবীর; তিনি ভগবদ্ভক্ত। তিনি যে এ-যন্ত্রণার সময় বিঠোবার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া, হৃদয়ে শান্তিলাভ করতঃ শারীরিক কষ্ট অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিছুদিন পরে তুকারাম সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন।

তুকারাম যে কেবল ধৈর্য্যের অবতার ছিলেন তাহা নহে। তিনি দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। একবার এক সুন্দরী নারী নির্জ্জনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার নীচ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় জানায়। তুকারাম তাহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং এরূপ কামনা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ছত্রপতি শিবাজী ও রামদাস তুকারামের সমসাময়িক লোক। রামদাস শিবাজীর গুরু ছিলেন। শিবাজী তুকারামের সাধুতার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পত্রদ্বারা আপন ভবনে আমন্ত্রণ করেন এবং স্বভবনে আনিবার জন্য অনেক লোক, অশ্ব, ও হস্তী প্রভৃতি প্রেরণ করেন। তুকারাম রাজার আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া কবিতায় যে পত্র লেখেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বোম্বাই-চিত্র' হইতে এ-স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল।
ইথে কেন জড়াইবা আমাকে ভূপাল॥
ধন মান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি।
এ বিপদ হ'তে মোরে রক্ষা কর হরি॥

ভাল যা না বাসি তাই চাও সঁপিবারে।
এ সঙ্কটে কেন বল ফেলিছ আমারে॥
সঙ্গী ও সংসার হ'তে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর রহিব একাকী।
মান দম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এ সব তোমারই থাক, হে পাণ্ডুরিপতি।

* * * *

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার ;
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।
খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা করে,
বস্ত্র চাই ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে পড়ে'।
শয্যা মোর পড়ে' আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ
বাসনা সে জীবনের করে শুধু হ্রাস।
রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায় ?

* * * *

এই একমাত্র যোগ করিও সাধন,
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা করো না কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন
এমন কাজেতে মন দিও না রাজন্।
দুর্জ্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তিদান,
তাহার কথায় কভু দিও নাক কান।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার।
পরীক্ষায় দোষগুণ করিয়া বিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে ?

* * * *

এই এক সার কথা কল্যাণী,
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্য গুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা বলে "ধন্য ধন্য তুমি হে ভূপতি,
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি ভাতি।"

শিবাজী তুকারামের উত্তর পাইয়া সুখী হইলেন। ধন-জনের প্রতি এত যাঁহার নিঃস্পৃহা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন তুকারাম লোহাগ্রামে বাস করিতেছিলেন। শিবাজী বহুজন সমাবৃত হইয়া রাজার ন্যায়ই তথায় গমন করিলেন এবং দরিদ্র ভক্তের নিকট থালায় করিয়া বহুসংখ্যক মাণিক্য প্রদান করিলেন। তুকারাম অতি উপেক্ষার সহিত সে-সকল বস্তু ফেলিয়া দিলেন। তিনি সে-সময় রাজাকে এই মর্ম্মের কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, "রাজন্! আমি হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়াই জীবন অতিবাহিত করি। আমার পার্থিব ঐশ্বর্য্যে কোন প্রয়োজন নাই। বিঠোবাই আমার মা-বাপ; তাঁহারই কৃপায় আমি শক্তিমান, তাহাতেই আমি পরম ঐশ্বর্য্যশালী। রাজন্! তুমি হরিনামের মালা কণ্ঠে ধারণ কর এবং শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া জীবনে সুখ ও আনন্দ লাভ কর।"

শিবাজী তুকারামের বিষয়ের প্রতি এত বিরাগ দর্শন করিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। যে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিলে মানব পার্থিব রত্নরাজিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে তিনি সেই ভক্তি রত্ন লাভের জন্য তুকারামের অনুগত হইলেন। তুকারাম যখন ভক্তিতে গদ গদ হইয়া করতাল হস্তে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন সে-কীর্ত্তন শ্রবণে লোকের পাষাণসম প্রাণও বিগলিত হইয়া পড়িত। শিবাজী তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য কয়েকদিন লোহাগ্রামে অবস্থিতি করেন।

সে-সময় তুকারাম যে একটি নূতন কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত

যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অতি উপাদেয় 'তুকারাম-চরিতে' তাহা যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল—

"হরি! তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে!
সুহৃদ সখা তুমি, মম ধন, জন ;
প্রাণ-রমণ তুমি শান্তি-সদন হে ॥
আপন বলিতে মম তোমা বিনা কেহ নাই,
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে ॥
ত্রিভুবন পূর্ণ করি, রহিয়াছ, তুমি হরি!
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে ॥
তব গুণ যে রসনা, প্রভু না করে ঘোষণা,
বিনাশ মঙ্গল তার, কি ফল রহিয়া হে ॥
যথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থস্থান,
না ভ্রমিল যদি পদ কি ফল তাহার হে ॥
সব সুখ ত্যজ্য করি, তব শ্রীচরণে হরি।
তনু, মম, প্রাণ মম করেছি অর্পণ হে ॥
বিনা তব গুণ গাথা ; অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু : চাহিনা শুনিতে হে ॥
এ বিষম ভবনদী, তরিবারে চাহ যদি,
এস তবে সে চরণে লইগে স্মরণ হে ॥"

তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণে শিবাজীর জীবনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি রাজ্য সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া, তুকারামের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিবার প্রয়াসী হইলেন। মহারাজা শিবাজী দেখিলেন, যে মহা-রত্ন পাইলে, মানুষ সংসারের অসার ধনরত্নকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, তাহা কি পরম পদার্থ! তিনি সেই পরম-নিধি ভক্তি লাভ করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন এবং সমস্ত দিন তথায় নির্জ্জনে অতিবাহিত করিয়া, সায়ংকালে তুকারামের সংকীর্ত্তন শুনিতে আগমন করিতেন। রাজমাতা জিজিবাই পুত্রের জীবনের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া বড় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। শিবাজী রাজ্য-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, এ-চিন্তা তাঁহার নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি

দেখিলেন, তুকারামই তাঁহার সন্তানের এই বৈরাগ্যের মূল কারণ। তিনি বুঝিলেন, ইহার প্রতীকার তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিবে না। জিজিবাই লোহাগ্রামে তুকারামের কুটীরে গিয়া তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া, কাতর-অন্তরে বলিলেন, "আমার পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়াছে,—সে আমার একমাত্র পুত্র, তাহার এখনও পর্য্যন্ত কোন পুত্র কন্যা হয় নাই। আমি ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনি আমার পুত্রকে দান করুণ।" এই বলিয়া শিবাজীর জননী তাঁহার নিকট আপনার অঞ্চল পাতিলেন। তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া, বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই। আপনার পুত্র আসিলেই, আমি তাঁহাকে নিজ কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিব। আপনি বিঠোবার ভজনা করুন, আপনার সকল দুঃখ যাইবে।"

শিবাজী সমস্ত দিন নির্জ্জন অরণ্যে যাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণান্তে তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, "মহারাজ! সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করুন। সম্মুখ-যুদ্ধে শত্রুকে পরাজয় ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। গীতাতে আছে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এই বলিয়া তুকারাম তাঁহার জীবনের কার্য্যের বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে শিবাজীর চৈতন্য হইল। তিনি পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার জননীও সুখী হইলেন এবং কয়েকদিন লোহাগ্রামে বাস করিয়া তুকারামের সংকীর্ত্তনাদি শ্রবনান্তর কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তদীয় চরণে প্রণতিপূর্ব্বক সন্তানকে লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তুকারামের সংকীর্ত্তন শিবাজীর অন্তরে যেন সুধা বর্ষণ করিত। তিনি তাঁহার সংকীর্ত্তনের প্রতি বড়ই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একবার শিবাজী কিছুকাল সিংহগড়ে বাস করেন। স্থানটি পুনা হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কিন্তু তাঁহার সংকীর্ত্তন শ্রবণের স্পৃহা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, তিনি তথা হইতে তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণের জন্য পুনাতে আগমন করিতেন।

একবার পণ্টরপুরে সাধুদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। মহাপণ্ডিত শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সম্মিলনে তুকারামের কথকতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি এ-সময় বহুজনের অনুরোধে আপনার জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরম ভক্ত তুকারাম কিরূপে বাল্যকাল হইতে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই তাহা স্বরচিত কবিতায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশের কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি যে কত সংগ্রামের ভিতর দিয়া দেবত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইল এবং তিনি যে একজন অসাধারণ ভক্ত তাহাও সকলেই বুঝিতে পারিল।

ভক্তেরা অনেক সময় অভিনয়াদি দ্বারা সাধারণের মনে ভগবৎ-লীলার মধুময় ভাব উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যও শ্রীবাস, হরিদাস, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতিকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয় করিতেন। তুকারামও শ্রীকৃষ্ণের লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। তুকারাম এক অভিনয়ে বালগোপাল সাজিয়াছিলেন। অন্যান্য তাঁহার ভক্তেরা কেহ নন্দ, কেহ যশোদা প্রভৃতি সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অভিনয় দর্শনে সকলে বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

শিবাজী পারলীগড় গ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে বহু সাধু ভক্তের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বহু সাধু-ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন। রামদাস স্বামীও এ-মহোৎসবে আগমন করিয়া কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

কিন্তু তুকারামের সংকীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি একমাস কাল কীর্ত্তন করিয়া সকলের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠ-নিঃসৃত পদাবলীর অপূর্ব্ব ভাব-লহরী উৎসবকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। শিবাজী এই উপলক্ষ্যে তুকারামকে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ও কয়েকখানি গ্রাম দান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তুকারাম তাহা জানিতে পারিয়া গোপনে তথা হইতে প্রস্থান করেন। শিবাজী সে-জন্য রামদাসের নিকট দুঃখ প্রকাশ করাতে, তিনি তুকারামের অত্যাশ্চর্য্য ভগবন্নিষ্ঠা ও বিষয়-সম্পদের প্রতি নিঃস্পৃহার বিষয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি চতুর্ব্বিধ মুক্তিই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ক্রমে সকলেরই কণ্ঠ হইতে তাঁহার গুণাবলী উচ্চারিত হইতে লাগিল,—তাঁহার যশঃসৌরভে মহারাষ্ট্র দেশ আমোদিত করিয়া তুলিল। বহুলোকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

দেহুতে দোলযাত্রার সময় অনেক বিভৎস ব্যাপার ঘটিত। তুকারাম নির্ম্মল হরিনামের স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া, সে-সকল জঘন্য অনুষ্ঠান হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। একবার দোলযাত্রার সময় তিনি তাঁহার পত্নী ও অন্যান্য সকলকে বলিলেন, “আমি বৈকুণ্ঠে যাইব।” তাঁহার এই কথায় সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কোন দূরদেশে যাত্রা করিবেন। কিন্তু এই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রা! তিনি একে একে পত্নী, আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্যদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এ-সময় তিনি অনেকগুলি অভঙ্গও রচনা করিয়াছিলেন। বিদায়কালে বন্ধুগণের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ‘তুকারাম চরিত’ হইতে, উদ্ধৃত হইল,—

“এই হল শেষ দেখা সকলের সনে,
ভবের সম্বন্ধ-পাশ ছিন্ন এত দিনে॥
সবার চরণে আমি করি এই নতি,
দীন আমি, কৃপা সবে রেখ মোর প্রতি॥

যাই আমি, বন্ধুগণ ! যাই নিজ ধাম।
বল সবে "রাম, কৃষ্ণ," বিঠলের নাম॥"

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার নব-রচিত অভঙ্গ গান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার অনুগমন করিলেন। সকলেরই বিশ্বাস তিনি কোন দূরদেশে যাত্রা করিতেছেন। তুকা যে আর ক্ষণকাল পরেই লোক-চক্ষুর অগোচর হইয়া অনন্তধামে যাত্রা করিবেন—তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তুকারাম নাম গান করিতে করিতে ইন্দ্রায়ানীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার ইষ্ট দেবতার নিকট অন্তিমকালের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কথিত আছে, সে-সময় এক দিব্য জ্যোতিঃ উদ্গত হইয়া চারিদিক আলোকিত হইয়া পড়িল। সে আলোর তীব্র আভায় সমবেত ব্যক্তিরা ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অবশেষে তাঁহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, তুকারাম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

তুকারামের বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ, ধৈর্য্য, আত্মসংযম ও ভগবৎ-প্রেম চিরদিনই নরনারীকে সৎশিক্ষা দান করিবে। তুকারাম চিরদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভক্তদিগের সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত থাকিবেন।

কবীর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামানন্দের শিষ্যের মধ্যে কবীরই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কবীরের দোঁহাবলী ব্যতীত তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য অধিক ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কবীরের জাতি, কুল ও জন্ম বিষয়ে তাঁহার চরিতাখ্যায়কদিগের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ প্রায় দেখা যায় না।

রামানন্দ যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ মথুরা নামক স্থানে বাস করিতেন, তখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার বিধবা কন্যা সমভিব্যাহারে রামানন্দের নিকট আগমন করেন। রামানন্দ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিধবা না জানিয়া তাহাকে 'পুত্রবতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহার কথা ব্যর্থ হইল না। কথিত আছে, ঐ পতিহীনা বালবিধবা এক সন্তান প্রসব করে। এ-কথা প্রচার হইলে লোকে নিন্দা করিবে এই ভয়ে সে শিশু পুত্রটিকে লতাপাতায় জড়াইয়া এক জঙ্গলের ধারে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। ঐ সময় নুরী নামক এক জোলা জাতীয় লোক তাহার নিমা নাম্নী স্ত্রীর সঙ্গে নিকটবর্ত্তী কোন বাটীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে যাইতেছিল। তাহারা পথে এই অসহায় শিশুকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া দয়ার্দ্র-হৃদয়ে আপনাদের বাটীতে লইয়া গেল এবং তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া তাহার নাম কবীর রাখিল। কবীর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কবীর বাল্যকালে বস্ত্র বয়নাদি কার্য্য শিক্ষা করিয়া ভালরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতামাতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি বিবাহিত হইয়া

এবং বিশিষ্টরূপ অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াও সংসারের প্রতি উদাসীনতাই প্রকাশ করিতেন।

যিনি ভবিষ্যতে ধর্ম্মের উচ্চতর শিখরে অধিরোহণ করিয়া ভারতের ভগবৎ-প্রেমিকদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সূচনা পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি উপার্জ্জিত অর্থে বৈষ্ণব ও অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

কবীর যখন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই তাঁহার প্রাণ ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার মন দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি রামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন—স্থির করিলেন। কিন্তু রামানন্দ ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের লোক ভিন্ন অন্য লোককে শিষ্য করিতেন না। কবীর তাহা জানিতেন, সে-জন্য তিনি এক উপায় স্থির করিলেন। রামানন্দ প্রতিদিন প্রত্যূষে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। কবীর একদিন রাত্রে স্নানের ঘাটে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। রামানন্দ যথা সময়ে স্নানার্থ সিঁড়ির উপর পদবিক্ষেপে নিম্নে নামিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার খড়ম কবীরের মাথায় লাগিল। তিনি উহা শব মনে করিয়া, "রাম কহ" বলিয়া উঠিলেন। কবীর ভাবিলেন, রামানন্দের মুখ হইতে যখন রাম নাম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখনই রামানন্দের নিকট তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করা হইল। আশা পূর্ণ হইল ভাবিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিলক ধারণ করিলেন এবং রাম নাম গান ও রামনাম ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, যথা ভক্তমালে :—

"তটস্থ হইয়া স্বামী রাম কহ বলে।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণমূলে॥
সেই রাম নাম মহামন্ত্র যে জানিঞা।
হৃদয়-সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া॥

গৃহকর্ম্ম জাতি-পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসীমালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবা নিশি করে।
মাতাপিতা বন্ধুগণে করে তিরস্কারে॥
আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দুধর্ম্ম॥
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম।
তেঁহ কহে গুরু মোরে রামানন্দ-স্বামী।
দীক্ষা দিলা তিঁহ মোরে তাঁর দাস আমি॥"

কবীরের পিতামাতা সন্তানের এইরূপ পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপন ধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মে কে তোকে দীক্ষা দান করিল?" কবীর বিনম্রবচনে বলিলেন, "গুরু রামানন্দ আমায় দীক্ষা দান করিয়াছেন, আমি তাঁহার দাস হইয়াছি।" কবীরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা রামানন্দের নিকট যাইয়া অত্যন্ত বিরক্তি-সহকারে বলিল, "আমার ছেলেকে তুমি দীক্ষা দিয়া তাহার জাতিকুল সব নষ্ট করিলে কেন?" রামানন্দ তাহার ছেলের দীক্ষার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কে সে? আমি ত জানি না, আমি কা'কে শিষ্য করিয়াছি।" কবীরের মাতা এই কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কবীরকে রামানন্দের কথা জ্ঞাপন করিল।

মাতার নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া কবীর তাঁহার দীক্ষা গুরু রামানন্দের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, দীক্ষাগ্রহণের সবিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। কবীরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রামানন্দের সে-দিনকার সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। রামানন্দ দেখিলেন, তাঁহার মুখে রামনাম শুনিয়া কবীর তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া রাম-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে! ইহাতে কবীরের প্রতি তাঁহার ভালবাসার সাগর যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কবীরকে প্রেম-ভরে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন—বলিলেন, "তুমি ত যবন নও, রাম নামে যখন তোমার এত নিষ্ঠা তখন তুমি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

"এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হৃদয় ধরিয়া॥
তুমি ত যবন নহ বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ।
যাতে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ।"

এইরূপে রামানন্দ কবীরের নিকট ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া, ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কবীর রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময়েই আপনার অরাধ্য দেবতার নাম গান ও তাঁহার চিন্তনেই সময় অতিবাহিত করিতেন—জীবিকা অর্জ্জনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন না। এজন্য তাঁহার মাতা অত্যন্ত তিরস্কার করিতেন; মাতার অনুরোধে কবীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বস্ত্রবয়ন করিয়া হাটে বিক্রয়ার্থ গমন করিতেন। তিনি একদিন একখানি বস্ত্রবয়ন করিয়া হাটের একটী স্থানে তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় একজন বৈষ্ণব আসিয়া কবীরের নিকট বস্ত্রখানি বিনামূল্যে প্রার্থনা করিল। কবীর তাঁহাকে বস্ত্রখানি দান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সে-দিন সেই বস্ত্রখানি বিক্রয়ের উপরেই পরিবারের আহারাদির আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু কবীর বস্ত্রখানি দান করিয়া শূন্য-হস্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার মাতা, পুত্রকে এই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কবীর মাতার বাক্যের উত্তর না দিয়া একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া ভক্তি-ভরে নীরবে নাম-জপ করিতে লাগিলেন।

"বৈষ্ণব আসিয়া এক বস্ত্রখানি মাগে।
তেঁহ কহে ফাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে॥
বৈষ্ণব কহেন মোর সব-খানি বিনে।
কার্য্য না চলিবে দেহ যদি মনে মানে॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল।
ঘরে অন্ন নাহি তেঁহ লুকাঞা রহিল।
ঘরে গেলে মাতা আদি করিবে ভৎর্সন।
শূণ্যে এক গৃহে বসি গান রাম গুণ।"

এইরূপ কথিত আছে, সেই সময় কবীরের ইষ্টদেবতা, কবীরের রূপ

ধারণ করিয়া বলদের পৃষ্ঠে নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া, গৃহ পূর্ণ করিলেন এবং সাধু ও ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের মনে হিংসা জন্মিল। তাহারা তাঁহাকে গালি দিতে দিতে বলিতে লাগিল, "বেটা জোলা, শুধু তিলকধারী বৈষ্ণবদিগকে দান করিতেছিস আর ব্রাহ্মণদিগকে কিছুই দিলি না; তোকে মেরে ফেল্‌ব।"

কবীর বাটীতে আগমন করিয়া সকলই দেখিলেন এবং শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া এই সকল কাজ করিয়াছেন। কিন্তু লোকের এই বিশ্বাস জন্মিল যে, কবীরেরই অসাধারণ শক্তি-প্রভাবে বিবিধ দ্রব্য তাঁহার গৃহে আনিত হইয়াছে। অতএব তিনি একজন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি—এই জ্ঞানে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আরো বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অসাধারণ সাধু বলিয়া তাঁহার যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতে লাগিল।

সাধুপুরুষদিগের গুণগানে যেমন বহুলোক আপনাদিগের জীবন ধন্য মনে করে, তেমনি তাঁহাদিগের অপযশ কীর্ত্তনেও বহু মন্দলোক আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। সাধুপুরুষ বলিয়া, তাঁহার খ্যাতি যতই চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণদিগের ঈর্ষানল ততই যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হইল। তাঁহারা পাতসার নিকট কবীরের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কবীর মুসলমান হইয়া আপনার ধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দু-দেবতার পূজা ত করেই—পরন্তু এই নির্লজ্জ ব্যক্তি এক বারাঙ্গনার হাত ধরিয়া পথে পথে বিচরণ করে ইত্যাদি।" পাতসাহ এইরূপ নানাপ্রকার অভিযোগের কথা শ্রবণ করিয়া, কবীরকে তাঁহার সম্মুখে আনিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। কবীর পাতসার সম্মুখে নীত হইলেন। কাজি তাঁহাকে, পাতসাহকে সেলাম করিতে বলিলেন, কবীর তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি রাম ভিন্ন এ সংসারে কাহারও নিকট

মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজার প্রতি এরূপ অবমাননা!—ইহা কাজীর আর সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধে অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন এবং বিধিমতে কবীরের প্রতি শাস্তিবিধান করিবার আদেশ করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া হয় এবং দগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে জ্বলন্ত অনল-শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়; কিন্তু এই দুই বিপদসঙ্কুল অবস্থাতেও তিনি আপনার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

"কাজি কহে পাতসারে সেলাম কর রে।
তেঁহ কহে সেলাম যোগ্য নাহিক সংসারে॥
একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ সব সকলি অসৎ॥
তাহা শুনি পাতসা কোপে অগ্নি হেন জ্বলে।
এইক্ষণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে॥
চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল।
সবে কহে নদীজলে ডুবিয়া মরিল॥"

ভক্ত যবন হরিদাস যেমন মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে নিপীড়িত হইয়াও মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, পাতসাহের হাতে কবীরের পরীক্ষাও তদ্রূপ। হরিদাস যেমন জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভক্তির প্রভাবে পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া, নিজের দৃঢ়তা ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, কবীরও সেইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রকাশ করিয়া, সকলকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাতসাহ সেকন্দর সাহ তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা ভক্তমালে,—

"বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল।
ঈশ্বরের কৃপা-পাত্র নিশ্চয় জানিল॥
বহু স্তুতি নতি করি সম্মান করিল।
পদানত হৈয়া অপরাধ ক্ষেমাইল॥"

এই সকল পরীক্ষার অনল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কবীর অধিকতররূপে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। রামানন্দ তাঁহার দীক্ষাগুরু হইলেও, তিনি বিচারশূন্য হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমত অনুমোদন করিতেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনায় কবীর দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতের প্রতিবাদও করিতেন। যে রাম-মন্ত্রে তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবীর সেই রামচন্দ্রকে নরদেহধারী কোন অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না। একবার রামানন্দের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কবীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর, জীবের দেহান্ত হইলে আত্মা কোথায় গমন করে? আর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি?" তদুত্তরে রামানন্দ বলেন, "রামনাম লও, তাহা হইলে সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে।" কবীর রামানন্দের কথা শুনিয়া বলিলেন, "বশিষ্ঠ ঋষি যে রামের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং যিনি বশিষ্ঠকেই গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আপনি কি সেই রামের কথা বলিতেছেন? সেই নরদেহধারী রাম কি মানবের পরিত্রাতা হইতে পারেন?"

ক্রমে তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার তিরোভাবের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। তাঁহার দেহান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি হিন্দু শিষ্যদিগকে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিতে ও মুসলমান শিষ্যদিগকে কবরস্থ করিতে বলিয়া একখানি বস্ত্রে নিজদেহ আবৃত করিয়া শয়ন করিলেন এবং চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার শব-সৎকার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধিয়া গেল। হিন্দুরা তাঁহার দেহ দাহ করিতে ও মুসলমানেরা উহা সমাধিস্থ করিতে উদ্যোগী হইল। কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি সকলের সম্মুখে মৃতদেহের উপরস্থিত বস্ত্রখানি তুলিয়া ফেলিল,— সকলেই দেখিল তথায় মৃতদেহ নাই, তাহার পরিবর্ত্তে একটি পুষ্প রহিয়াছে! সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, এই পুষ্প দৃষ্টে তাঁহাদের মন হইতে

সে-ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন দান করিয়া, সেই পুষ্পটির অর্দ্ধাংশ বিভাগ করিয়া লইলেন। কাশীর রাজা বীরসিংহ নিজ রাজধানীতে ঐ পুষ্পের অর্দ্ধাংশ সৎকার করেন। সেই স্থানটিকে 'কবীর-চৌর' বলে। পুষ্পের অপরার্দ্ধ মুসলমানেরা গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী মগর নামক গ্রামে কবরস্থ করেন। ইহা কবীর-পন্থীদিগের একটি প্রধান তীর্থ-স্থান।

কবীরের ধর্ম্মমত অতি উদার ছিল। তাঁহার দোঁহাবলী পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরেরই উপাসক ছিলেন। অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ, গুরুবাদ ও জাতিভেদ মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে, ইহা তিনি বিশেষরূপে প্রতীতি করিয়া, তদ্বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য উপদেশপূর্ণ দোঁহাবলী পাঠ করিলে, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল বর্ণের লোককেই আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, কবীরের উদার ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ক মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কবীরপন্থীদিগের নীতিশাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অকপটে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে, সংসারের হিত-বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। তাঁহারা কহেন, ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, অতএব সে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্তপাত করা ঘোরতর কুকর্ম্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান ধর্ম্ম-নীতি, কারণ, মূলীভূত মিথ্যা হইতে ঈশ্বর স্বরূপের অজ্ঞান ও সাংসারিক যাবৎ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা সুবিহিত বটে, কারণ, গার্হস্থ্য আশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও শান্তি লাভের ব্যাঘাত জন্মে এবং নর ও ঈশ্বর বিষয়ক আবহমান চিন্তা-প্রবাহের প্রতিবন্ধক ঘটে। অন্য অন্য সমস্ত হিন্দু উপাসকদিগের ন্যায় কায়মনোবাক্যে গুরু-ভক্তি করা ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম।

ইঁহারা তন্ন-তন্ন-রূপে গুরুর মতামত ও গুণাগুণ বিচার না করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন না। শিষ্যের দোষ হইলে, গুরু তাঁহাকে ভর্ৎসনাদি করিতে পারেন, কিন্তু শারীরিক দণ্ড দিবার অধিকার নাই। শিষ্য যদি ইহাতেও কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে গুরু তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাহাতেও প্রতিকার না হইলে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কবীর জপ, পূজা ও জাতিভেদাদির বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন এবং সংসারের দুঃখময় স্বরূপ সবিশেষ বর্ণন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন।"

কবীরের কয়েকটী দোঁহা এখানে উদ্ধৃত হইল,—

রেখ রূপ জেহি হৈ নহীঁ অধর ধরো নহিঁ দেহ।
গগনমঁডলকে মধ্যমেঁ রহতা পুরুষ বিদেহ॥

যাঁহার কোন প্রকার বেশ নাই, এবং যিনি কোন দিন শরীর ধারণ করেন নাই, সেই বিদেহী নিরাকার পুরুষ আমার হৃদয়রূপ গগনমণ্ডলে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।

মসি কাগদ তো ছুয়ো নহিঁ কলম গহী নহিঁ হাথ।
চারিহু যুগন মহাত্ম জেহি করিকে জনায়ো নাথ॥

ঈশ্বর সর্ব্বকালেই কলম, কালী অথবা কাগজ ব্যতিরেকে কেবল নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়া, তাঁহার অদ্ভুত মহিমারাশি ঘোষণা করিতেছেন।

উঁচে গাওঁ পহাড় পর ঔ মোটে কী বাঁহ।
ঐসো ঠাকুর সেইয়ে উবরিয় জাকী ছাঁহ॥

উচ্চ পর্ব্বতের উপরে স্থিত গ্রাম যেরূপ নিরাপদ, বলবান মনুষ্যের আশ্রয় যে প্রকার অভয়প্রদ, সেইরূপ এমন প্রভুকে সেবা কর, যাঁহার আশ্রয়-ছায়ায় চিরজীবন নির্ভয়ে থাকিতে পারিবে।

সাঁচা সৌদা কীজিয়ে অপনে মনমেঁ জানি।
সাঁচে হীরা পাইয়ে ঝুঁঠে মূরৌ হানি॥

হৃদয়ের অনুভূত সত্য লইয়া বাণিজ্যাদি কর, কারণ সত্যতেই রত্ন পাওয়া যায়, কিন্তু মিথ্যাতে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

সাঁচে শাপ ন লাগিয়া সাঁচে কাল ন খায়।
সাঁচে কো সাঁচা মিলে সাঁচে মাহিঁ সমায়॥

যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলে, কিছুতেই তাহার কোন ক্ষতি হয় না, লোকের অভিশাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং মৃত্যুতেও তাহার বিনাশ নাই।

মধুর বচন হৈ ঔষধী কটুক বচন হৈ তীর
শ্রবণ দ্বার হৈ সঞ্চরে সালে সকল শরীর ॥

মধুর বচন ঔষধ-স্বরূপ, কিন্তু কটু বচন তীরের ন্যায়, ইহা শ্রবণদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত শরীর ক্ষত করিয়া ব্যথিত করিতে থাকে।

জ্যহি মারগ গে পণ্ডিতা তেহী গাই অহীর।
ঊঁচী ঘাটী রাম কী ত্যহি চঢ়ি রহে কবীর।

শাস্ত্রকারেরা যে পথে যায়, সেই পথে পৃথিবীর লোকেরাও গিয়া থাকে, কিন্তু কবীর সে পথের পথিক না হইয়া চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর দ্বারা আবেষ্টিত উচ্চ উপত্যকার উপরে চড়িয়া রহিল।

গুরু সীঢ়ীতে উতরে শব্দ বিমূখা হোই।
তাকো কাল ঘসীটিহৈ রাখি সকৈ নহিঁ কোই ॥

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সিঁড়ি হইতে যে ব্যক্তি নামিয়া আসে এবং বিবেকবাণী না মানিয়া চলে, মৃত্যু তাহাকে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবে, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

পাঁচ তত্ত্বকে ভীতরে গুপ্ত বস্তু অস্থান।
বিরল মর্ম্ম কোই পাইহৈ গুরুকে শব্দ প্রমাণ।

পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহের মধ্যেই সেই গুপ্ত বস্তু (আত্মা) অবস্থান করে, কেবল ঈশ্বরের আলোকেই এই অদ্ভুত রহস্য উদঘাটন করা যায় এবং অতি অল্প লোকেই তাহা করিতে সমর্থ হয়।

জৈসী লাগী ঔরকী তৈসী নিবহৈ থোর।
কৌড়ী কৌড়ী জোরিকৈ পূঞ্জো লক্ষ করোর।

প্রথমে হৃদয়ে যেটুকু ধর্ম্মভাবের বিকাশ হয়, সেই টুকুই অল্পে অল্পে চিরজীবন ধরিয়া বর্দ্ধিত কর; কড়ি কড়ি করিয়া সঞ্চয় করিলে, শেষে লক্ষ মুদ্রা হইয়া থাকে।

সাহেব সাহেব সব কহৈঁ মোহিঁ অঁদেশা ঔর,
সাহেব সোঁ পরিচয় নহীঁ বৈঠেগা কেহি ঠৌর।

মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর সকলেই বলিতেছে বটে, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয়, ঈশ্বরের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাহারা আশ্রয় পাইবে কোথায়?

সাঈঁ নূর দিল এক হৈ সোঈ নূর পহিচানি।
জাকে করতে জগ ভয়া সো বেচূঁ ক্যোঁ জানি।

তোমার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ ভিন্ন আর অন্য জ্যোতিঃ নাই, সে জ্যোতিঃ তুমি জানিতে চেষ্টা কর, যাঁহার সৃষ্ট এই অসীম জগৎ তাঁহাকে কেমন করিয়া অজ্ঞেয় বলিতেছ?

পূরা সাহেব সেইয়ে সব বিধি পূরা হোই
ওছে নেহ লগাইয়ে মূলো' আবৈ থোই।

যে ব্যক্তি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে ধরিয়া থাকে, তাহার সকল দিকই পূর্ণ; কিন্তু যে মন অসার বস্তুতে আসক্ত, তাহার মূল পাণ্ডিত্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

মনকা ফেরৎ যুগ গয়া গয়া ন মনকা ফের।
করকা মনকা ছোড় কর মনকা মনকা ফের॥

জপমালার গুটিকা ঘূর্ণন করিতে করিতে জীবন গত হইল, কিন্তু হৃদয়ের ঘোর বিগত হইল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া মনের গুটিকা বিঘূর্ণন কর।

গঙ্গা ফেরা হরদ্বারকা গুদড়ী লিয়া মন চারকা ভটকা ফেরা তো ক্যা হুবা জিন ইস্ক মেঁ সির না দিয়া। কাবা গয়া হাজি হুবা মনকা কপট মেটা নহিঁ মনকা কুফর টুটা নহিঁ কাবা গয়া তো ক্যা হুবা। হাজি হুবা তো ক্যা হুবা জিন ইস্ক মেঁ সির না দিয়া। বোস্তাঁ গোলেস্তাঁ পড় গয়া মৎলব ন সমঝা শেখ কা আলিম হুবা তো ক্যা হুবা ফাজেল হুবা ক্যা হুবা জিন্ ইস্ক মেঁ সির না দিয়া।

যে জন হরিদ্বার-বাহিনী জাহ্নবী-জল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছে, দুই চারি মন কন্থা-ভার বহন করিয়াছে এবং বিভ্রান্ত হইয়া নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পণ করে নাই, তাহাতে তাহার কি হইল? যে জন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই, বা তাহা দূর হয় নাই, তাহার কাবা গমনেই বা কি হইল এবং হাজি-পদে অধিরোহনেই বা কি হইল? যে জন বোস্তাঁ গোলেস্তাঁ সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু সেখ সাদির তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই, ও ভগবৎ-প্রেমে শির সমর্পণ করে নাই, তাহার পাণ্ডিত্য ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি হইল?

পীতম কী বাতেঁ লাগী মোহিঁ নীকী।
কোটি যতন্সে কোই সমঝাবে সব কী লাগি মোহি ফীকী॥
জলকে মীন পলঁগ পর রাখো লে অমৃত রস সিঁচী
তড়প্ তড়প্ তন ত্যজৎ ছনকমেঁ সুধি নরহে ওহি জীকি॥
হীরাকি পরখ জোহরী জানে চোট সহে শির ঘনকী।
স্বাতীকো স্বাদ পপীহা জানে জাকো চোট বিরহন কী।
কহে কবীর যঁহা ভাব বসৎ হ্যায় সুদ্ধ রহে হর জনকী।

প্রিয়তমের কথাই আমার ভাল লাগে। যদি কেহ অশেষরূপে আমাকে প্রবোধ দেয়, কিছুতেই মন বুঝে না। জলের মৎস্যকে যদি পর্য্যঙ্কের উপর রাখিয়া অমৃতরস সেচন করিয়া দাও, তথাচ সে ক্ষণেক মধ্যে ছট্ফট্ করিয়া তনুত্যাগ করে, আর সংজ্ঞা থাকে না। মণি-খনকেরাই হীরকের গুণ জানে এবং এই নিমিত্তই মুদ্গার-প্রহার সহ্য করিয়া থাকে। পাপীয়া পক্ষীই স্বাতী নক্ষত্রের জলের স্বাদগ্রহণ অবগত আছে, সুতরাং তাহাকেই তন্নিবন্ধন বিরহ-যন্ত্রণা সহিতে হয়। কবীর কহেন, যাহার হৃদয়ে ভাবের অবির্ভাব হইয়াছে, সে-জন সকল জনেরই ভাব-গ্রহণ করিয়া থাকে।

একেশ্বরবাদী ভগবদ্ভক্ত কবীরের মত ভারতে বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ও উৎপন্ন হইয়াছে।

নানক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লাহোরের নিকটবর্ত্তী তালবস্তি নামক এক পল্লীতে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষত্রিয়বংশে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালু। কালু শস্য-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। নানক ছয় বৎসরে পদার্পণ করিলে, কালু কোন শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে তত্ত্বজ্ঞানে সমুন্নত হইয়া নরনারীকে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাল্যকালেই অনেক সময় তাহার নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, যখন তাঁহার শিক্ষাগুরু তাঁহাকে বর্ণ-পরিচয় করাইতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে সেই শিক্ষা দিন, যাহাতে আমার মায়ার বন্ধন টুটিয়া যায়।" ছাত্রের এবম্বিধ কথা শুনিয়া গুরু কিছুকাল বিস্মিত-অন্তঃকরণে রহিলেন, পরে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি শিক্ষকতা করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহা শুন,—মনদিয়া লেখা পড়া শেখ ; আমার সঙ্গে আর এরূপ বাচালতা করিও না।" নানক গুরুর এই কথা অবনতমস্তকে শ্রবণ করিলেন। অন্য একদিন ধর্ম্মের অনুরূপ কথা উথাপন করিয়া নানক গুরুকে বলিলেন,—"আপনি ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন, উহা ধর্ম্মের খোসামাত্র ; চিত্তের পবিত্রতা ও ইন্দ্রিয়-সংযমই অগ্রে প্রয়োজন। সরল ও অকপট-হৃদয়ে ভগবানের পূজা করিলেই ভগবান সেই পূজা গ্রহণ করেন। শুধু নৈবেদ্য-দানে তাঁহার পূজা হয় না। ভক্তি-কুসুমে যে তাঁহার পূজা করে, সে-ই তাঁহার প্রকৃত পূজা করিয়া থাকে।" সেদিন নানক গুরুর নিকট হইতে এ-সকল কথার আর কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হন নাই।

বাল্যাবস্থায় নানকের প্রাণে কেমন এক উদাস-ভাব আসিয়াছিল। যে বয়সে ছেলেরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়ায়, তিনি সেই বয়সে অনেক সময় শান্তভাবে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সাধারণ লোকে এ-সকল দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিত। তাঁহার পিতারও এ-সকল ভাব দেখিয়া, মনে আশঙ্কার সঞ্চার হইত। তিনি এ-সকল ভাবকে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে করিতেন।

একদিন মধ্যাহ্নকাল প্রায় অতীত হইয়া আসিল, কিন্তু নানক তখনও বাটীতে আসেন নাই; তাঁহার পিতা তাঁহাকে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, পুত্র এক স্থানে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তিনি পুনঃপুনঃ পুত্রকে আহ্বান করাতে, নানক ধ্যানভঙ্গ করিয়া পিতার সহিত বাটীতে আগমন করিলেন। জননী পুত্রকে বাটীতে আসিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন। নানক যেন তখন কি এক ভাবে বিমুগ্ধ; তিনি খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাতাপিতার মনে ইহাতে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, সন্তানের নিশ্চয় কোন পীড়া হইয়াছে। আরোগ্যের জন্য তাঁহারা বৈদ্য আনয়ন করিলেন। মাতা কাতর-অন্তরে সন্তানের জন্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বৈদ্য আসিয়া নানকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে, নানক তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধ দানে আমাকে সুস্থ করিতে চাহেন বটে, কিন্তু আপনার ভিতর যে কাম-ক্রোধরূপ ব্যাধি বিরাজ করিতেছে, আপনি কি সে-সব দূর করিয়া আত্মার সুস্থতা লাভ করিতে পারিয়াছেন?" কবিরাজ মহাশয় নানকের বাক্যে বিশেষ মন না দিয়া বলিলেন, "তোমার হাতটি একবার দাও দেখি, তোমার নাড়ী দেখিলেই আমি তোমার রোগ বুঝিয়া সেই অনুসারে ঔষধ দিয়া যাহাতে তোমার শরীর সুস্থ হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় করিব।"

নানকের ত আর শারীরিক কোন পীড়া নাই যে, বৈদ্যের ঔষধে তাঁহার ক্ষুধা-মান্দ্য চলিয়া যাইবে ও শরীর সবল হইবে? ভগবানের বিরহেই তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছে! নানক কবিরাজের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি হিতৈষীর ন্যায় কথা বলিতেছেন না। সেই পরমপিতা পরমেশ্বরকে পাইবার জন্যই আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, আপনি আমার কিরূপে শান্তিবিধান করিবেন?"

বালকের মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া বৈদ্য অবাক্ হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি নানকের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার এ পুত্র সামান্য নহেন; ইঁহার কথা শুনিয়া আমার মনের মোহান্ধকার দূর হইয়া গেল—এ বালক শুধু হাসিয়া খেলিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে আসেন নাই। জীবের দুঃখ দেখিয়া ইঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে। ভবিষ্যতে আপনার এই পুত্রই অসংখ্য নরনারীকে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবেন। ইনি আপনার মনে যাহা করিতে চাহেন, করুন,—ইঁহার কার্য্যে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নানক ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত। এখন তাঁহার উপনয়নের সময় উপস্থিত হইল। এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য কালু নির্দ্দিষ্ট দিনে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলেই উৎসব উপলক্ষ্যে আগমন করায় কালুর গৃহাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনুষ্ঠানের সময়, আচার্য্য যখন নানকের গলদেশে যজ্ঞসূত্র দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন নানক গুরুর নিকট যজ্ঞসূত্র ধারণের অনাবশ্যকতা লইয়া নানা বাদানু-বাদ উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "গুরুদেব! যজ্ঞসূত্র ধারণে কোন ফল হয় না। শুধু এই সূত্র ধারণেই কি মানবের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়?

বৃথা মানুষ এই সকল বাহ্যিক ব্যাপার লইয়াই দিন যাপন করে, আর যাহাদের গলে যজ্ঞসূত্র নাই তাহাদের ক্রিয়া-কাণ্ডে অধিকার নাই বলিয়া তাহাদিগকে সমাজ দূরে রাখিয়া দেয়।" নানকের এই সকল কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন "বাপু! এ-সকল কথার আমি কিছু উত্তর দিতে পারিব না, পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে; তুমি এখন বৃথা কথা না বলিয়া উপবীত ধারণ কর।" নানক কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন, "প্রেমের তত্ত্ব-রচনা করিয়া সত্য ও সংযমের গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাই গলায় পর; তাহাতেই মনের মলিনতা ঘুচিয়া যাইবে—স্বর্গের আলোকে মন-প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে—আর সংসারের কোন আঘাতে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইবে না।"

এই সকল কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে সবই ঠিক কথা, তবে অনেক লোক এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছেন, তুমি যদি এখন উপবীত গ্রহণ না কর তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং সকলে বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া যাইবেন—ইহা ভাল নয়।" নানক বুঝিলেন,—কথা সত্য, কিন্তু তবুও তিনি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, "যাহাই হউক, আমি কিছুতেই উপবীত গ্রহণ করিব না।" আচার্য্যের সঙ্গে এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছে, এমনসময়ে নানক-জননী আসিয়া পুত্রকে উপবীত ধারণের জন্য আদেশ করিলেন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন সকল গুরুর মধ্যে মাতাই পরম গুরু। পঞ্জাবের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম-গুরু ইহা যে প্রত্যক্ষ করেন নাই তাহা নহে, তিনি মাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন; সেই জন্য, তিনি মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। উপবীত ধারণ করিলেন। লোকে জানিল যে, উপবীত ধারণের কোন মূল্যই নাই।

এইরূপে প্রায় তিন বৎসর চলিয়া গেল। নানক উদাসীনভাবেই দিন কাটাইতেছেন এবং প্রায়ই স্থির হইয়া বসিয়া, সেই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের

ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেছেন।' পিতা এই সকল দেখিয়া, তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "দেখ নানক! আমার যে জমি আছে, তাহা যদি আবাদ কর, তাহা হইলে ভাল হয়,—ঐ সকলই ত তোমারই উপর নির্ভর। এ-সকল করিলে তুমিও নিষ্কর্ম্মা বলিয়া লোকাপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইবে, এবং আমারও প্রাণে সুখ হইবে। নানক পিতার এ-সকল বাক্য স্থিরভাবে শুনিয়া বলিলেন, "আমার আবাদ অতি বিশাল,—সেখানে আমি ইষ্ট-মন্ত্রের বীজ বপন করিয়াছি,—এর যে ফসল ফলিবে, তাহার ভাণ্ডার অফুরন্ত। আর আমার আবাদে যে রত্ন ফলিবে,—সেই রত্নলাভেই মানুষ অনন্ত শান্তিময় জীবন লাভ করিবে।"

নানকের পিতা এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এখন বুঝিলাম, তোমার কৃষিকার্য্যে মন নাই। যাহা হউক, তুমি বিদেশে কোন দোকান খোল, তাহাতে তোমার অর্থ উপার্জ্জনও হইবে, আর লোকে যে তোমাকে অলস বলিয়া নিন্দা করে, তাহা হইতেও তুমি অব্যাহতি পাইবে এবং ইঁহাতে আমার প্রাণেও সুখ হইবে।" নানক সকল সময়েই এইরূপ অর্থোপার্জ্জনের প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক অর্থেই উত্তরপ্রদান করিতেছিলেন; এবার দোকান খোলার বিষয় উত্থাপিত হইলে, নানক বলিলেন, "এই বিশ্বের চারিদিকেই আমার দোকান—বাজারের দোকানের মত তাহাতে কতকগুলি অসার ভঙ্গুর জিনিস পুরিয়া রাখি নাই—বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের অমূল্য জিনিসে তাহা সাজাইয়া রাখিয়াছি। এ-সকল জিনিস যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা অনায়াসেই এ ভব-সাগর পার হইয়া, শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে পারিবেন।"

নানকের পিতা সন্তানের কথায় একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তবে দেখিতেছি দোকানে বসিয়া থাকা তোমার ভাল লাগিতেছে না—এ-ধৈর্য্যও তোমার নাই!" অতঃপর আরো কিছু লাভজনক কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করায় তাহাতেও নানকের অভিমত না পাইয়া, প্রিয় সন্তানের

প্রতি পিতা একটু রুক্ষবচনে বলিলেন, "যদি তুমি কিছু না করিবে, তবে কি ঘরে বসিয়া সময় কাটাইবে? যে-সকল কাজের কথা বলিলাম, সে-সকল যদি কিছুই ভাল না লাগে, তাহা হইলে, আর একটী কাজ বলি, বোধ হয়, তাহা তোমার ভাল লাগিবে। তুমি আমার নিকট হইতে কিছু টাকা মূলধন লও এবং বিদেশে যাইয়া, ব্যবসা আরম্ভ কর,—এই উপলক্ষ্যে নানা দেশ দেখিয়া, তোমার মনে আনন্দ হইবে ও ভালরূপে ব্যবসা চালাইয়া অর্থও পাইবে।" পিতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অবশেষে সন্তান পিতার কথায় স্বীকৃত হইলেন। কালুও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ব্যবসায়ের জন্য বিংশ মুদ্রা প্রদান করিলেন। নানক পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, বিংশ মুদ্রা মাত্র হস্তে করিয়া, তালবন্তি গ্রাম ত্যাগ করতঃ বিদেশে যাত্রা করিলেন। বালা নামে এক ভৃত্য তাহার সহিত গমন করিল।

তাঁহারা প্রভাতে স্বগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় অদূরে এক ঘনপল্লবাবৃত নিকুঞ্জবন তাঁহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তাঁহারা পথশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সে-জন্য ঐ বনে আশ্রয় লাভের জন্য গমন করিলেন। সেই লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত বন কতকগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর সাধন-ভজনের স্থান। নানক এই সকল সাধুদিগকে দেখিয়া, যেন প্রাণের মানুষ পাইলেন মনে করিয়া, পরম পুলকিত-মনে তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। কেহ বা মৃগ চর্ম্মোপরি বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন, কেহ বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপে সকলেই প্রায় ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কৃচ্ছ্র সাধনে রত! নানক হৃদয়ে হৃদয়ে ভগবৎ-আরাধনেরই বিশেষ পক্ষপাতী; বাহ্য-সাধনের প্রতি বীতরাগই সদা প্রকাশ করিতেন। তিনি উপবীত গ্রহণের সময় আচার্য্যের নিকট সূত্র-গ্রহণের অনাবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, যেমন নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি এই তাপসদিগের বাহ্যানুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিতেও ত্রুটি করিলেন না। নানক ইঁহাদিগের গাত্রে ভস্মমাখা, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হস্তের

স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করা, ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ করিয়া, বলিলেন,—"এ সকলের দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না—ভগবানকে প্রাণের মধ্যে লাভ করিতে, অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ পাইবার জন্য অন্তরে তাঁহার সাধনা করিতে হয়।" তাপসেরা বলিলেন,—"অন্তরের দুর্দ্দমনীয় রিপুদিগকে বশে রাখিতে হইলে, শরীরকেও ক্লেশ দেওয়ার প্রয়োজন।"—এইরূপে নানকের সহিত তাঁহাদের কিছুক্ষণ কথোপকথন হইলে, নানক পিতৃদত্ত অর্থের দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবার অভিলাষ জানাইলেন এবং কিছু আহার্য্য সামগ্রী দিবার জন্য, তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা প্রসন্নবদনে বলিলেন যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ তাঁহাদিগকে কোন খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নানক পিতৃদত্ত টাকায় তাঁহাদিগের জন্য কিরূপ ভক্ষ্যবস্তু ক্রয় করিবেন তাহা তাঁহার সমভিব্যাহারী বালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালা বলিল, "আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই ক্রয় করিতে পারেন; এবং ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয় করিতে পারেন।" তখন নানক বালার নিকট হইতে বিংশতি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া, নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাপসদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। তাঁহারাও নানকের অকৃত্রিম ভগবন্নিষ্ঠা, সরলতা ও হৃদয়ের উদারতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, দাতাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ দান করিলেন।

আর ত হাতে টাকা নাই। এখন ব্যবসা কিরূপে হইবে? অগত্যা নানক বালাকে লইয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন এবং পিতার নিকট তাঁহার প্রদত্ত অর্থ কিরূপে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এবার আর তাঁহার পিতা ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুইটি চক্ষু লালবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধভরে তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। নানকের ভগ্নী, তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া, নানককে টানিয়া লইলেন, এবং পিতাকে এ-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন।

অবশেষে ভ্রাতার মনের এইরূপ বৈরাগ্যের ভাব দর্শন করিয়া, ভগ্নী তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। নানকের ভগ্নীপতি নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি নানককে নবাব পরিবারের ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। সেই ভাণ্ডার নিতান্ত সামান্য নয়; নানা দ্রব্য ও বস্ত্রাদিতে পূর্ণ হইয়া থাকিত। নানক ভগ্নীপতির অনুরোধে সে-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ভাণ্ডারের চাউল, দাইল ও বস্ত্রাদি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই তাঁহার হৃদয়ের উদারতার কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন বহুসংখ্যক দরিদ্র অন্ন-বস্ত্র লাভের আশায় নবাব-বাটীর নিকট উপস্থিত হইত। নানকও মুক্তহস্তে তাহা-দিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য বিতরণ করিয়া, ভগবানের কার্য্য করা হইল,—এই মনে করিয়া, হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিতেন। কিছুদিন পরে, এ-কথা নবাবের কর্ণগোচর হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে তলব করিলেন। নানক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দ তৎক্ষণাৎ হিসাবের খাতা লইয়া নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নানকের হিসাবে প্রায় এক হাজার টাকার অমিল হইয়াছিল। নানকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু নানকের হৃদয়ের উচ্চতা দেখিয়া, নবাব অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু নানক, জীবনের প্রধান কর্ম্ম সমাধা করিবেন বলিয়া, চিরদিনের জন্য, কর্ম্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই পুত্রের মন সংসারের দিকে ফিরাইবার জন্য নানকের পিতা তাঁহাকে পরিণীত করিয়াছিলেন। শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ নামে তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু—নানকের প্রাণ এ-সকল বন্ধনেও বন্দী হইল, না। তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি এখন গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসীর ন্যায় বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নানক সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে শ্রীভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। বালা ও মর্দ্দানা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। বালা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন; আর সুগায়ক মর্দ্দানা, মধুর ভজন গাইয়া গুরুর মন শীতল করিতেন। তাঁহারা চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। বাবা নানকের চিত্ত নরনারীর দুঃখে কাতর; মানুষ শ্রীভগবানকে ভুলিয়া বাস করিতেছে,—এই চিন্তাতেও তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে। এইজন্য তিনি যেখানে যাইতে লাগিলেন, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! সেই নিরাকার প্রভু পরমেশ্বরের পূজা কর—তিনি ভিন্ন কেহই মোক্ষদাতা নাই।" শুনা যায়, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এইজন্য, তিনি হিন্দুদিগের নিকট হিন্দুশাস্ত্র হইতে এবং মুসলমানদিগের নিকট মুসলমান শাস্ত্র হইতে বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া, নিরাকার পরমেশ্বরের অর্চ্চনাই যে পরম পুরুষার্থ এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনেই যে মানব-হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করে, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে ক্ষণজন্মা পুরুষ মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত।

পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা ভর্ত্তরি নামক এক যোগীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। ভর্ত্তরি পূর্ব্বে রাজা ছিলেন, কিন্তু পঞ্জাবদেশস্থ পরম সাধু ও যোগী গোরক্ষনাথের উপদেশে তিনি রাজ্য-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করেন। তাঁহার আশ্রমে ইঁহারা উপস্থিত হইলে, তিনি বাবা নানকের মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলেন। বালা গুরুর পরিচয় দান করিলে, ভর্ত্তরি বলিলেন, "ইহার নাম পূর্ব্বেই আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।"—এই বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ অলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভর্ত্তরি নানককে বলিলেন, "গুরুজী! আমি মনকে বশ করিবার জন্য হট্‌যোগ সাধন করি, কিন্তু তাহাতে এখনও যে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি, এমন বোধ হয় না; হৃদয়ের শুষ্কতাও দূর হইতেছে না,—এখন অপনি আমাকে সদুপদেশ দান করিয়া সেই পরমাত্মাকে লাভ করিবার উপায় বলিয়া দিউন" নানক হট্‌যোগ প্রভৃতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি নিজ সরল বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারা সেই সদানন্দময় পরম সুন্দর পরমেশ্বরকে প্রাণে লাভ করিয়া ঐ দুয়ের সাহায্যেই অন্যেও যাহাতে তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় এরূপ উপদেশ দান করিতেন। যোগী ভর্ত্তরির কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "ভগবান মানবের পরিত্রাণের জন্য ভক্তিযোগ বিধান করিয়াছেন, আপনি ভক্তি-পথাবলম্বী হইয়া ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করুন, প্রাণ সরস হইবে; জীবন মধুময় হইবে।" পুনরপি তিনি বলিলেন, "ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে, সেই নিরঞ্জন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, তোমার জ্ঞানও উজ্জলতর হইয়া উঠিবে; ভক্তিভরে উচ্চারিত শ্রীভগবন্নামের মধুর শব্দ বীণাধ্বনির ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিয়া জীবনকে আনন্দে পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ভগবানের নাম-কীর্ত্তনই প্রকৃত উপাসনা—ভগবদ্ভক্তেরা ইহার সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন।" বাবা নানক এইরূপে ভর্ত্তরির নিকট ভক্তির মাধুর্য্যের বিষয় বর্ণনা করিলে, ভর্ত্তরির প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। তিনি করযোড়ে নানকের, প্রশংশাবাদ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার চরণে সভক্তিক প্রণাম করিলেন। সকল প্রসঙ্গ শেষ হইলে, নানক তাঁহার সমভিব্যাহারীদিগের সহিত অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত হইলে, ভর্ত্তরি অতি বিনয়ের সহিত তাঁহাকে শিষ্যগণসহ আরো কিছুদিন আশ্রমে থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নানক ইহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, "আপনার সহিত আমার আবার

দেখা হইবে; এখন আমরা বিদায় গ্রহণ করি।" এই বলিয়া, তিনি সঙ্গিগণকে লইয়া দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বিশ্বম্ভরপুর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। কথিত আছে, নানক এই স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একখণ্ড হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি ঐ হীরকখণ্ড মর্দ্দানার হস্তে দিয়া উহা বিক্রয়ার্থ ক্রেতার সন্ধানে উহাকে বাজারে প্রেরণ করিলেন। সালস রায় নামে তথায় এক বিখ্যাত বণিক ছিলেন। মর্দ্দানা হীরকখণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সালস রায় এই বহুমূল্য হীরক দর্শন করিয়া তাঁহার হস্তে একশত মুদ্রা অগ্রিম প্রদান করিয়া, উহার প্রকৃত মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্দ্দানা তখন বলিলেন যে, ইহার মূল্যের বিষয় তিনি তখন কিছু বলিতে পারিবেন না, তাঁহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ বলিবেন।—এই বলিয়া মর্দ্দানা একশত টাকা লইয়া নানকের নিকট গিয়া হীরকের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সালস রায়-প্রদত্ত এক শত টাকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। নানক বলিলেন—"এ হীরা অমূল্য; সালস রায় ইহা ক্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি এখনি যাইয়া তাঁহার টাকা ফিরাইয়া দাও।" মর্দ্দানা গুরুর আদেশে সালস রায়ের নিকট যাইয়া প্রভুর কথা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে একশত টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন। সালস রায় বলিলেন, "তোমার প্রভু হীরকখণ্ড বিক্রয় করুন আর নাই করুন, আমি দর্শনী-স্বরূপ এই টাকা প্রদান করিয়াছি—আর উহা গ্রহণ করিব না।" কিন্তু মর্দ্দানা সালসের সেই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া টাকা রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। মর্দ্দানা চলিয়া গেলে সালস রায় ভাবিতে লাগিলেন—যিনি আমার এত অনুরোধেও টাকা গ্রহণ করিলেন না, বোধ হয় তিনি সন্ন্যাসী হইবেন অথবা ইঁহার প্রভুই বা কিরূপ লোক তাহাও একবার দেখা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া তিনি নানাপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য ও ফলমূলাদি লইয়া নানকের সমীপে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—এক সুন্দর পুরুষ চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন

এবং তাঁহার মুখ হইতে যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে! আর যিনি হীরা বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকটে বসিয়া মধুর-স্বরে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। তখন বণিক সালস রায় বুঝিলেন, এই ধ্যান-নিমগ্ন ব্যক্তিই এই হীরকখণ্ড বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছিলেন। ইনি সামান্য লোক নহেন—ইনি এ-সংসারের বণিক নহেন; ইনি ধর্ম্ম-ধনে মহা ধনী। নানকের ধ্যান-ভঙ্গ হইলে, সালস রায়, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। অবশেষে হীরক খণ্ডের কথা উত্থিত হইলে, নানক তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সেই একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর জগতের সকল মাণিক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে যে লাভ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ধনী; সেই পরম সুখী। সালস রায় উত্তরকালে বাবা নানকের উপদেশে ধর্ম্ম-ধনেও ধনী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, তাঁহারই মতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বম্ভরপুর পরিত্যাগ করিয়া, বাবা নানক শিষ্যগণসহ বহু দেশ ও নগরে আপনার মত ঘোষণা করিয়া মুসলমানদিগের তীর্থস্থান মক্কাতে উপনীত হইলেন। মহাত্মা মহম্মদ একেশ্বরবাদ ঘোষণা করিলেও, নানক দেখিলেন যে, তথায় বহুসংখ্যক মুসলমান পৌত্তলিকতা ও নানাপ্রকার কু-সংস্কারের হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। তখন গুরু নানকের সহিত তত্রত্য মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। মক্কা হইতে তিনি মদিনা গমন করেন। এখানে মহাত্মা মহম্মদের সমাধি আছে। নানক রাত্রিতে সমাধির দিকে পদদ্বয় বিস্তার করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কোন গোঁড়া মুসলমান ইহা দেখিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া, ক্রোধভরে তাঁহাকে অত্যন্ত ভৎসনা করিতে লাগিল এবং একান্ত উত্তেজিত হইয়া,—"মারিয়া ফেল;—তাড়াইয়া দাও,"—এই সকল

কথা বলিতে লাগিল। নানক স্থিরভাবে বলিলেন, "তোমরা আমার পা দুখানি সেই দিকে ফিরাইয়া দাও, যে দিকে ভগবান নাই।" তাহারা আগন্তুকের কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। তবুও কয়েকজন বলপূর্ব্বক তাঁহার পা ধরিয়া ফিরাইয়া দিল। কথিত আছে, এইরূপে তাহারা যে-দিকে তাঁহার পদদ্বয় ফিরাইতে লাগিল, সেই দিকেই মহম্মদের সমাধি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে সামান্য মানব মনে না করিয়া, তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া, সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নানক মক্কা ও মদিনা পরিত্যাগান্তে অন্যান্য স্থানে বিভুগুণ-কীর্ত্তন করিয়া, শেষে সৈদপুর নামক কোন পল্লীতে তাঁহার কোন শিষ্যের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কথিত আছে, সেই সময় সম্রাট্ বাবর ভারত জয় করিবার জন্য কাবুল হইয়া বহু লোককে বিনাশ ও কারাগারে বন্দী করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে নানক তাঁহার শিষ্যের বাটীতে আগমন করিবার পরই মোগল সৈনিকপুরুষেরা আসিয়া, নানক, বালা, মর্দ্দানা ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে মর্দ্দানা রবাব বাজাইতে লাগিলেন এবং বাবা নানক প্রেমোন্মত্তের ন্যায় হরিগুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যথাস্থানে পৌঁছিলে, সেনাপতি সকলকেই বন্দী করিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু বাবা নানকের মুখমণ্ডল-মধ্যে ঐশীশক্তির পরিচয় পাইয়া, সম্রাটের কোন সৈনিক-পুরুষ বাবরের নিকট যাইয়া অতি বিনীত-ভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা! যে সকল লোক সম্প্রতি বন্দী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক সন্ন্যাসী আছেন; তিনি সদা প্রফুল্ল,—হরিনাম গান করিতেছেন। আর এক আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, সকলেই গম পেষণ করিতেছে, কিন্তু এ-ব্যক্তির জাঁতা ইঁহার হস্তের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না; জাঁতাখানা নিজেই ঘুরিতেছে এবং গম পেষিত হইতেছে।"

সন্ন্যাসীর এই ভগবদ্ভক্তি ও অলৌকিক কার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া বাবর তাঁহাকে নিকটে আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে নানককে উপস্থিত করা হইল। নানক বাদসার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দীদিগের কষ্টের কথা প্রকাশ করিয়া তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করেন, এবং ক্ষণকাল পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। বাবর নানকের মুখে সে-সময় এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। নানকের সমাধি ভঙ্গ হইলে, তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন।

নানক সৈদপুর হইতে কাশ্মীর ও বাগদাদ হইয়া দরবেলাত নামক সহরে উপনীত হন। এখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুগায়ক মর্দ্দানা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নানক অন্তিমকালে নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তের পর নানক বালাকে বলিলেন, —"পরমেশ্বর ইঁহাকে বিশেষ করুণা করিয়াছিলেন।" অবশেষে মর্দ্দানার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, বাবা নানক বালাকে লইয়া কর্ত্তারপুরে আগমন করিলেন। কথিত আছে, এখানে তিনি ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈরাগ্যের বসন পরিধান করতঃ স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করেন। আঠার বৎসর ভারতের নানা দেশ ভ্রমণান্তর, যদিও তাঁহার পরিচ্ছদের কিছু পরিবর্ত্তন হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরের বৈরাগ্য, ভগবদ্-প্রীতি, দেশ-পর্য্যটন ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রবল বাসনার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তিনি কিছুদিন সংসারে বাস করিয়া, আবার বালাকে লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই পর্য্যটনের সময় তিনি কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পরিদর্শনের পর শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। জগন্নাথ-দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়কেরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ংকালে যখন বাদ্যধ্বনি-সহকারে জগন্নাথদেবের আরতি হইতেছিল; যখন শত শত উপাসক দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক করযোড়ে, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার

দিকে তাকাইয়া ছিল, তখন নানক মন্দিরের বহির্দ্দেশে বসিয়া তাঁহার উপাস্য-দেবতা সেই চিন্ময় পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। একজন পাণ্ডা নানককে এ-সময় এই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "এখন আরতির সময় তুমি এখানে যে বসিয়া রহিয়াছ ?" তখন প্রত্যুত্তরে নানক বলিলেন, "আমি বাহ্যিক আড়ম্বরে অর্পিত আরতিকে প্রকৃত আরতি বলিয়া মনে করি না ; অন্তরের দ্বারা যে আরতি হয়, তাহাই প্রকৃত আরতি ; আর তোমাদের মন্দিরে যে দেবতার আরতি হইতেছে, তিনি জগতের নাথ হইতে পারেন না। সেই নিরাকার বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরই জগতের নাথ। শুধু অন্তরের দ্বারাই তাঁহার আরতি হয়।" বাবা নানকের ধর্ম্ম-ভাব ও এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সেই সময় পরম ভগবদ্ভক্ত নানক, এই মনোহর উচ্চ-ভাবোদ্দীপক সংগীতটি রচনা করিয়াছিলেন,—

"গগন মৈ থাল রবি চন্দ দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতী।
ধূপ মলিয়ানলো, পবন চবরো করৈ,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতী॥
কৈসি আরতি হোই ভব খণ্ডনা তেরি আরতি
অনহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহস তব নৈন ন না নৈন হৈ তোহি কোউ
সহস মূরত ন না এক তোহী।
সহস পদ বিমল ন না এক পদ গন্ধবিন সহস তব
গন্ধ ইব চলত মোহী॥
সভ মহিঁ জ্যোতি জ্যোতি হৈ সোই।
তিস দে চানন সব মাহিঁ চানন হোই।
গুর সাখী জ্যোতি পরগটি হোই
যে তিসু ভাবে সু রতি আ হোই
হরি চরণ কমল মকরন্দ লোভিত মনো, অনদিনো
মোহি আহি পিয়াসা।
কৃপাজল দেহি নানক সারঙ্গ কঁহ হোই জাতে
তয়ে নাই বাসা।"

শ্রীক্ষেত্রে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহারই পথাবলম্বী হইয়াছিল। এইরূপে কিছুকাল ভ্রমণানন্তর তিনি বালাসহ পুনরায় কর্ত্তার-পুরে ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যাঁহার মন নরনারীকে কু-সংস্কারের হস্ত হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের দিকে আনিবার জন্য ব্যাকুল—তিনি কখনও সংসারে স্থির থাকিতে পারেন না। নানক কিছুদিন কর্ত্তারপুরে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বাস করিয়া পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রথমে তিনি বালাসহ দিল্লিতে গমন করিলেন। তখন মোগলসম্রাট্ বাবরের হুকুমে বহু লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; এবারও গুরু নানক বালাসহ বন্দী হইলেন। কারারক্ষক দেখিল, নানক ভিন্ন অপর কয়েদী সকলেই বিমর্ষবদনে দিনযাপন করিতেছে। নানকের ভাব দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া সম্রাটের নিকট গিয়া বলিল, "এক সন্ন্যাসী বন্দী হইয়াছেন, তিনি সদানন্দ পুরুষ; কারাগারের মধ্যে হরিগুণ-কীর্ত্তনে ও শ্রীভগবানের ধ্যানে সময় যাপন করেন।" সম্রাট্ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিতে বলাতে, নানককে বাবরের নিকট উপস্থিত করা হইল। সম্রাট্ বাবর গুরু নানকের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, নানক বলিলেন, "পরমেশ্বরই মানবের একমাত্র উপাস্য, তিনি নিরাকার ও অদ্বিতীয়।" বাবর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "এ সংসারে তোমার গুরু কে, —তুমি কাহার শিষ্য?" নানক বলিলেন, "সেই জগতের একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরই আমার গুরু, আমি তাঁহারই নিকট হইতে সত্য শিক্ষা করিয়া থাকি।" সম্রাট্ তাঁহার নির্ভীকতা ও অকৃত্রিম অধ্যাত্মিক-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দিতে চাহিলেন। নানক বলিলেন, "ভগবান পরম ঐশ্বর্য্যশালী; সমস্ত বিশ্বই তাঁহার ধনরত্নে পূর্ণ

রহিয়াছে, আমার কিসের অভাব? আমি তাঁহার পুত্র হইয়া সেই ধনেরই অধিকারী হইয়াছি।” তখন সম্রাট্ তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া বালাসহ তাঁহাকে মুক্তি দান করেন।

নানক সম্রাটের নিকট কয়েকদিন বাস করিয়া সিন্ধু প্রভৃতি দেশে ভ্রমণপূর্ব্বক কর্ত্তারপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বালাই তাঁহার পথের সাথী। কর্ত্তারপুরে বহুসংখ্যক লোক যখন তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিতেন, নানক তখন সকলকেই নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতে বলিতেন। ভক্তেরা সকল সময় হৃদয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের বাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, নানকও অনেক সময় দৈবাদেশ লাভ করিয়া সেই অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। চিত্ত প্রশান্ত হইলে মানব মাত্রেই জীবনের কর্ত্তব্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং ভক্তেরা সেই কর্ত্তব্য ভগবানেরই প্রত্যাদেশ মনে করিয়া তৎসাধনে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন। মহাত্মা নানক একদিন ব্রহ্মসাধনে নিমগ্ন ছিলেন এমন সময় তিনি যেন শ্রীভগবানের আদেশ পাইলেন, “নানক, আমি তোমার স্তবে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি অবিরাম আমার নাম ঘোষণা করিয়া নরনারীকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছ—যে তোমার ঐ গান শ্রবণ করিবে ও তোমার মত গ্রহণ করিবে সে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।” নানক ভগবানের এই বাণী শ্রবণ করিয়া, জীবন ধন্য মনে করিলেন। সে-সময় তিনি ভগবানের যে স্তব করিয়াছিলেন সে-গুলি তাঁহার শিষ্য অঙ্গদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহা “জপজি” বা “আদি গ্রন্থ” নামেই অভিহিত হয়। ইহা শিখদিগের বিশেষ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ—সদা পূজ্য। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবনের অপূর্ব্ব শক্তিপ্রভাবে সহস্র সহস্র ব্যক্তি, নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনে মানব-জীবন যে মধুময় হয়—মানুষ পাপ-তাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হয়, এই সকল মহাসত্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল। বহু-সংখ্যক লোক নানককে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। গুরু নানকের বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত নরনারীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে ক্রমে ক্রমে নানকের শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। জীবনের গণা দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। আর অধিক দিন জগতে থাকিতে হইবে না—তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া, অঙ্গদকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তদীয় মত ঘোষণা করিতে আদেশ করিলেন। অঙ্গদও গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, দ্বিতীয় গুরুপদ গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিল। হায়! এই মরজগতে গুরু নানকের জীবনের কার্য্য শেষ হইয়া আসিল।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের সপ্তমী তিথিতে তাঁহার দেহান্তরের আর বিলম্ব নাই দেখিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয় জননীসহ নানকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেবকবৃন্দ সকলে সমবেত হইলেন। আজ এই পরলোকগামী পরম ভক্ত গুরু নানককে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান আগমন করিতে লাগিল। তিনি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী পরমেশ্বরের নাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইতে লাগিল। নানক তাঁহার প্রিয়তম আরাধ্য দেবতার নাম শ্রবণ করিতে করিতে চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সকলেই এই মহাপুরুষকে হারাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই গুরুকে ভক্তি করিত। তাঁহার দেহান্তের পর উভয় দলেই স্ব স্ব প্রথানুসারে গুরুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া লইয়া ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিল। নানকের মৃতদেহ একখানি বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল, কথিত আছে যখন বস্ত্র উত্তোলন করা হইল তখন তাঁহার দেহ আর দেখা গেল না। সকলেই মনে করিলেন, তাঁহাদের গুরু সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সকল বিবাদ মিটিয়া গেল। এখন উভয় দলে পরমেশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড বিভাগ করিয়া লইল। হিন্দুরা অর্দ্ধভাগ দাহ করিলেন, মুসলমানেরা অপরার্দ্ধ সমাধিস্থ করিলেন।

তুলসীদাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরম ভক্ত তুলসীদাসের জীবনী বহুল ঘটনাপূর্ণ নহে। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট হাজপুর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পত্নীর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। একান্ত পত্নী-বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি সর্ব্বদাই ভার্য্যার নিকটে থাকিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। পিত্রালয় হইতে পুনঃ পুনঃ তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইবার জন্য, লোক প্রেরিত হইলেও তিনি নানারূপ আপত্তি উথাপন করিয়া, তাঁহার যাওয়ায় অসম্মতি করিতেন—পত্নীর অনুরোধেও কর্ণপাত করিতেন না। একদা তিনি শ্বশুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিনে যখন ডুলি-বাহকেরা তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তুলসীদাসের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে, ডুলির সঙ্গেই গমন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই লজ্জাশীলা; পথিমধ্যে স্বামীর এরূপ অনুরাগের ভাব দর্শনে লোকে কি মনে করিবে,—এই চিন্তাতে তাঁহার পত্নী অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন, এবং মনে একটু ক্রোধেরও সঞ্চার হওয়ায়, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভৎর্সনার ছলে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি নির্লজ্জ,—পথের মধ্যে, স্ত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে কেঁদে কেঁদে আস্তে লজ্জা হইল না। ছি! গলায় দড়ি দিয়ে মরগে। আমার প্রতি তোমার

যেরূপ আসক্তি দেখ্‌ছি, এই আসক্তিটুকু যদি ভগবানে অর্পণ করিতে তা হ'লে, তোমার জীবনের কত কল্যাণ হইত;—তুমি আজ একজন পরম ভক্ত হইয়া তাঁর কৃপা লাভ করতে পার্‌তে।" যথা নাভাজি ভক্তমালে বলিতেছেন,—

"অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিলা।
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিলা॥
কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিতা হইলা॥
ভর্ৎসন করিলা বহু স্বামীর উপর।
ওরে মূঢ় হতভাগা নির্লজ্জ বর্ব্বর॥
স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ লজ্জা তুমি নাহি পাও॥
লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়।
গলায় রস্থড়ি দিয়া মরিতে জুড়ায়॥
এত আর্ত্তি তব যদি ঈশ্বরে হইত॥
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কি না হইত॥"

পত্নীর বাক্যে তাঁহার প্রাণে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল। ভগবানের লীলা মনুষ্যের বোধাতীত! নিমেষের মধ্যে ঘোর আসক্তি অপূর্ব্ব অনাসক্তিতে পরিণত হইল। তাঁহার সকল মোহপাশ ছিন্ন হইয়া গেল,—তিনি এক নূতন জীবন লাভ করিয়া, যেন নূতন মানুষ হইয়া দাঁড়াইলেন! বাহকেরা ডুলি লইয়া চলিয়া গেল। তুলসীদাস, ডুলির সহিত আর গমন করিলেন না, অথবা গৃহের দিকেও আর ফিরিলেন না। তিনি রামনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তুলসীদাস নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, কাশীধামে উপনীত হইলেন। তথায় অনেক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, ভক্তির পথ অনুসরণ করিয়াছিল। চরিতাখ্যায়কেরা অনেক সময় মহাপুরুষদিগের চরিত-রচনার সময় অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভক্তমাল রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ নাভাজিও তুলসীদাস সম্বন্ধে, এইরূপ দুই একটি

ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এই,—তুলসীদাস কোন স্থানে দেখিতে পান, এক রমণী তাঁহার মৃত স্বামীর সহিত চিতানলে, আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দয়ার্দ্রচিত্ত তুলসীদাস, সেই নারীকে উপদেশ দানে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করেন এবং তাঁহার স্বামীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়া, তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেন। পতি ও পত্নী উভয়েই তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও একান্ত ভগবন্নিষ্ঠা দর্শন করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকেই দীক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করেন।

* * *

"এতেক শুনিয়া স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
স্বামি-সহগমনেতে নিবর্ত্ত হইল॥

* * *

তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুষ্মান হৈল॥
শ্রীমান তুলসী দাস নিজ ভক্তিবলে।
শক্তি সঞ্চারণ কৈলা ভাসে প্রেমজলে॥
কৃপা করি স্বামীরেহ বাঁচাইয়া দিলা।
তাহারেও রামচন্দ্র চরণে সঁপিলা॥"

অল্পদিনেই তুলসীদাসের অসাধারণ ভক্তিপ্রবণতা ও অলৌকিক শক্তির কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সম্রাট্ মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারের বিষয় শ্রবণ করিয়া, তুলসীদাসকে দেখিবার মানসে তাঁহাকে নিজ ভবনে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তুলসীদাস উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক বসিতে বলিলেন। তুলসীদাসও সম্রাট্‌কে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন করিয়া, উপবেশন করিলেন। আকবর বলিলেন, "শুনিলাম, তুমি কোন সতীকে সহমৃতা হইতে না দিয়া, তাঁহার স্বামীকে বাঁচাইয়াছ? এখন আমার বিশ্বাসের জন্য আমাকে সেরূপ কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখাও দেখি।" তুলসীদাস বিনম্রবচনে বলিলেন, "আমি সামান্য ফকীর, ভগবানের নাম করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই; জহরা প্রদর্শন

করা আমার কার্য্য নহে।" তথাপি বাদসাহ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের আদেশানুসারে তুলসীদাস বন্দী হইলেন। তাঁহার চরিতাখ্যান-লেখকেরা বলেন, তুলসীদাস কারারুদ্ধ হইলে, তাঁহার উপাস্যদেবতা রামচন্দ্র, নিজ ভক্তের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, হনুমানকে ডাকিয়া, ইহার প্রতিকারের উপায় করিতে বলেন। রামভক্ত হনুমান প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, কপিদিগকে কারাগার ভাঙ্গিয়া তুলসীদাসকে উদ্ধার করিতে বলিলেন। সহস্র সহস্র কপি মিলিত হইয়া, রাজবাটী ও নগবাসীর গৃহদ্বার ভগ্ন করিতে লাগিল। সম্রাটের কর্ণে এই সমাচার উপস্থিত হইলে তিনি তুলসীদাসকে কারামুক্ত করিতে বলিলেন,—

* * *

"সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল।
রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল॥

* * *

বিপদ্ পড়িল রাজা ভাবয়ে অপার।
যুক্তি করি কোনমতে নাহি প্রতিকার॥
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল।
পরস্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল॥
রাজার সভায় এক হিন্দু প্রামাণিক।
শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মভীত বুদ্ধিতে অধিক॥
করযোড়ে করি তেঁহ রাজারে কহেন।
এ যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ॥
তুলসীদাসের যাতে অপমান হৈল।
যেহেতুক এ দুরন্ত বিপদ পড়িল॥
তাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে।
কয়েদ হইতে আনাইয়া স্তুতি করে॥"

তুলসীদাস কারামুক্ত হইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তুলসীদাসকে পরম ঈশ্বর-ভক্ত স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি না

বুঝিয়া, তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, এখন আমি এ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই, তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। তোমার চরণ দুইখানি আমার মস্তকের উপর একবার স্থাপন কর; আমি এ অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করি।"

যথা ভক্তমালে,—

"বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন।
প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেষ্ঠ জন॥
অপরাধ হইতে মোরে বাঁচাইয়া লহ।
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ॥"

প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকেরা সুখে এবং দুঃখে, সকল অবস্থাতেই চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তুলসীদাস, আকবরের অত্যাচারে—তাঁহার কোনই কষ্ট বা ক্ষতি হয় নাই—এই ভাব প্রকাশ করিয়া, প্রসন্ন-চিত্তে ও সহাস্যবদনে সম্রাট্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্ষমাই সাধুদের ধর্ম্ম; তাই নাভাজি যথার্থই লিখিয়াছেন ঃ—

"সাধুর স্বভাব সুখে দুঃখে অপমানে।
সমান কিঞ্চিত নাহি ক্ষোভ গ্লানি মনে॥
প্রসন্ন হইয়া নৃপে আশিষ করিলা।
সকল আপদ সেই ক্ষণে দূর গেলা॥

* * *

শান্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেলা সাধু।
মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধু॥"

তুলসীদাস অবশেষে বৃন্দাবনে গমন করিয়া, ভক্তমাল-রচয়িতা নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সীতারামের উপাসক হইয়া তদ্বিষয়ে লোকদিগকে উপদেশ দান করেন। তাঁহার ভগবদ্-ভক্তি ও জীবনের মধুরতা দর্শন করিয়া বহুলোকই তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিল।

তুলসীদাস বৃন্দাবন হইতে বারাণসীধামে গমন করিয়া ১৬৩১

সংবতে হিন্দি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সুললিত রামায়ণ ভারতে অমর কীর্ত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ-গ্রন্থ ব্যতীত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের গুণবর্ণনে আরো কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তুলসীদাস শেষ-জীবন কাশীধামেই যাপন করেন এবং এখানে রাম-সীতার মন্দির ও একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা এখনও তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তুলসীদাস সাহিত্যানুরাগ ও ভগবদ্‌ভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ১৬৮০ সংবতে ইহলোক হইতে অপসৃত হন।

তাঁহার দোঁহাবলীর কয়েকটি বিষয় এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল :—

গঙ্গা যমুনা সুরস্বতী সাত সিন্ধু ভরিপুর।
তুলসী চাতক্‌কে মতে বিনু স্বাতি সমধুর॥ *

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই সাত সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি তুলসী কহে, পাপিয়া পক্ষীর মতে স্বাতী নক্ষত্রের জল ব্যতিরেকে সমুদায় ধূলি সমান।

উপল বরষি গরজত তরজি ডারত কুলিশ কঠোর।
চিতব কি চাতক জলদ তজি কবহু আনকী ওর॥

মেঘ গর্জ্জন, তর্জ্জন ও শিলা বর্ষণ করিয়া, কঠিন বজ্র নিক্ষেপ করিতেছে, তথাচ চাতক পক্ষী কি মেঘ পরিত্যাগ করিয়া কখন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে?

উঁচী জাতি পাপীহরা পিয়ত ন নীচো নীর।
কৈ যাচৈ ঘনশ্যাম তেঁ কৈ দুখ সহৈ শরীর॥

পাপিয়া পক্ষীই উচ্চজাতীয়, নীচের জল পান করে না। হয়, শ্যাম জলধরের নিকট জল প্রার্থনা করে, না হয় শরীরের দুঃখ সহিয়া থাকে।

তুলসী সন্তনকে সুনে সন্তত ইহৈ বিচার।
তন ধন চঞ্চল জগ অচল যুগ যুগ পর উপকার॥

তুলসী কহে, সাধুগণ সমীপে সতত এই বিচার শুনিতে পাই যে, দেহ ধন সকলই অস্থায়ী; জগতে কেবল পরোপকারই যুগ যুগান্তর স্থায়ী হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

STATE LIBRARY
6 MAR 1936
COOCH BEHAR
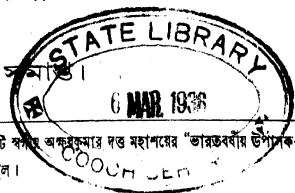
* তুলসীদাসের এই বচন কয়েকটি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।